

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

কমলা দাশগুপ্ত

বসুধারা প্রকাশনী

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি.এ.,
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিজ্ঞানাথ দাস

মুদ্রাকর : শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ,
মনোরম প্রিন্টার্স,
৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

শহীদ দীনেশ মজুমদারের
পুণ্যস্মৃতিকে স্মরণ ক'রে
সেই সব অজ্ঞাত অখ্যাত দেশপ্রেমিককে
অর্পণ করলাম
যাঁরা স্বাধীন ভারত আনতে চেয়ে
'নিষ্কারুণ দুঃখরাতে'
মৃত্যুঘাতে'
নিজ মর্ত সীমা চূর্ণ ক'রে চলেছিলেন ।

পরিচিতি

বামমোহন বাম্বেব ২২ বছর থেকে বা লাফ যে বেনেসাঁস বা বহুস্থানী নবজাগরণ দগা দেও, চিবদিনের ইতিহাসে সে এক অস্বাভাবিক বিষয়। একদিকে সে প্রেরণা বোগাৎ বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of Reason), অপনদিকে সে বিশ্ব ও অংশ গম্বব থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে টেনে নিয়ে আসে প্রাচীন ভাবতত্ত্ব শেষে ৩ম শিক্ষাদীক্ষা,—শিক্ষাব চেয়েও বড় ক'বে ধরে দাফাকে। সে শিক্ষা, সে-দাফা আচাবে অনুষ্ঠানে ২৩ যুগ ধ'বে চাপা পড়ে ছিল। যে জাতিব একদিন দাফামন্ত্র ছিল 'অ্যাক্টেন ভুজীথাঃ', নিবেট আববণের অন্তবালে সেই জাতিব মানুষের জীবন হবে উঠলে একান্ত স্বাথকেন্দ্রিক। জাতি দাগত্ব দুর্গতিব অবোবিন্দুতে (nadir) নামলো। তাবপব, গত ২৩ শতাব্দীর নব-জাগরণের দিনে মুক্তবুদ্ধিব (emancipated reason) আলোতেও দেখা গেল, ই 'অ্যাক্টেন ভুজীথাঃ'-র সত্য আজও সত্য—সে এক শাস্ত সত্য।

জাতির জীবনে এই সত্যের প্রেরণা এল বিগত শতাব্দীর শেষ ও বর্তমান শতাব্দীর উন্মেষণে লেখকের উদ্দীপনা, কবির গানে, নাট্যকাবের ইঙ্গিতে, সন্ন্যাসীবা বাণীতে। সেই প্রেরণা ফুটে উঠলো রাজনীতিব ক্ষেত্রে পব পর তিনটি আন্দোলনে। এই তিনটি আন্দোলনেরই তুলনা ইতিহাসে খুব বেশী নেই—প্রথম, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন; দ্বিতীয়, বিপ্লবান্দোলন; তৃতীয়, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনের কোনোটিই স্বয়ংস্ব নয়—ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এর

প্রত্যেকটাই বাংলার রেনেসাঁসের সম্ভূতি। আবার এরা একে অগ্ৰকে উদ্বোধিত করেছে, একে অগ্ৰের কাছে প্রাণ পেয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে মুক্তবুদ্ধিতে জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ধারা উপলব্ধি করলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান স্বরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র। যৌবনে তাঁরাই ছাত্রসমাজে প্রচার করলেন ম্যাট্রিনি, গ্যারিবন্দির জীবনাদর্শ; পরে একদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হোতা হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরাই। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব-জাগরণের মূর্ত প্রতীক, যুগান্তর আন্দোলনের এঁরাই প্রবর্তক, রেনেসাঁস আর বিপ্লবান্দোলনের মাঝখানে সেতু। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসক বিপ্লবান্দোলনের প্রথম নামকরণ করলো anarchism বা নৈরাজ্যবাদ; পরে আখ্যা দিল terrorism বা সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু বিপ্লবকে চিনে ধারা সেদিন বিপ্লবের দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা বলতেন, আমরা মরব, জাত জাগবে—আমাদের জীবনদানে জাত প্রাণ পাবে। এ নৈরাজ্যবাদীর ভাষাও নয়, সন্ত্রাসবাদীর ভাষাও নয়—‘ত্যান্তেন ভূঞ্জীথাঃ’-র শীর্ষস্থানীয় সাধকের কথা। ফলে, আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর এমন সব চরিত্র ফুটে উঠলো—যার তুলনা জগতের যে-কোনো দেশের ইতিহাসের অনুরূপ অধ্যায়ে খুব বেশি নেই।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেমন বিপ্লবান্দোলনের প্রসারে সহায় হ’ল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর চাঞ্চল্যও তেমনি দেশব্যাপী ক্ষেত্র প্রস্তুত করলো মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের। ঋষির দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁর পথের আদর্শ—অহিংসা, আধুনিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের উপায় হিসাবে অহিংসা—নিলেন এক অনাগত অদূর ভবিষ্যৎ থেকে। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপ্লবান্দোলন : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী মহামতি গোখলের প্রতিষ্ঠিত Servants of India Society-র মতো অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আগ্রহীল ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিপদের দিনে ভারতীয় বিপ্লবীরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে বিপ্লবচেষ্টা করেছে—এ কথা যেদিন প্রকাশ পেল, ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে গেল—আইনের নামে সে রাওলাট আইনের মতো এক ক্রুর অরাজকতা সৃষ্টি করতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর আত্মা শিউরে উঠলো—অগ্নি সমস্ত কাজ, সংকল্প আর আদর্শ ছেড়ে ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু অসাড় ঘুমন্ত জাতকে জাগাবার জন্তে বিপ্লবীরা পথ ধরেছিলেন ন্যূনতম সংখ্যকের চরমতম দৃঃখবরণের ; আর, জাগ্রত জাতকে ধাপে ধাপে তৈরী ক'রে তুললেন মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন পথে—প্রথম, মাত্র সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা ; দ্বিতীয় স্তরে, বিদেশীর আইন অমান্য ; আর শেষ স্তরে, 'ভারত ছাড়ো'—'করব, না হয় মরব' ; বহুসংখ্যকের স্বল্পতম দৃঃখবরণ থেকে শুরু ক'রে মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে গান্ধীজী সমস্ত জাতকেই মস্ত দিলেন—মৃত্যু কিংবা স্বাধীনতা—ঐ 'ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ'-র সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপ । সমগ্র নির্জিত জগৎই আত্মসম্মানবোধ ফিরে পেল, বেঁচে উঠবার রাস্তা চিনলো ।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে । তার মাত্র চল্লিশ বৎসর, এমন কি, বিশ বৎসর আগেই কে ভাবতে পেরেছিল—পরাদীন দেশে জন্মেছে কিন্তু স্বাধীন দেশে মরবে ? আমরা সবাই তো সেদিন ধ'রে নিয়েছিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে কর্মীরা কয়পুরুষ ধ'রে মরবে, জাত জাগবে, জীবনমরণ সংগ্রাম চলবে, তারপর, কোনো এক অজানা ভবিষ্যতে এক অজানা পথে আসবে দেশের স্বাধীনতা । কিন্তু এ অসম্ভব যে সম্ভব হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বর্তমান জগতের গতি, যোগ্য নেতৃত্ব আর দেশের নবজাগরণের সৃষ্ট চরিত্র ।

এমনি কতকগুলি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত—বাঙালী নারী-কর্মীদের চরিত্র । কমলার নিজের জীবন শুরু হয় বিপ্লবদলের কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে । তারপর কয়েকটি বন্ধু ও সহকর্মী মিলে নারীদের ভিতর এমন একটি দল গড়ে তোলেন যার সঙ্গে তুলনীয় দল সে-যুগে অল্পই ছিল । এমন সময় দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল আইন-অমান্য-আন্দোলনের বন্যা । সেই বন্যার মুখে তিনি ভেসে যেতে চাইলেন না, অল্পসংখ্যক সঙ্গীসাথী নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন পরিপূর্ণ আত্মাহুতির স্বযোগের অপেক্ষায় । কিন্তু এমন আত্মাহুতির লোভ ক'জনেরই বা সেদিন সার্থক হয়েছে ? কমলারও হয়নি । বরং দারিদ্র্য এসে পড়েছে, নেতৃত্ব নিতে হয়েছে । নেতৃত্ব নিয়ে এক-হাতে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, অপর হাতে বোমা-পিঙ্কল সংগ্রহ ও বিলি-বর্টন ক'রে বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন । এর কিঞ্চিৎ আভাস আছে তাঁর আগে-লেখা 'রক্তের অন্ধরে' বইতে । কিন্তু তাঁর চরম আত্মাহুতি হ'ল যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এসে অল্প নেতৃত্বানী কর্মীদের সাথে মিলে ১৯৩৮ সালে পৃথক বিপ্লবীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার নিষ্কাশ্য গ্রহণ করলেন । বিপ্লবীদের সেদিনকার প্রধান মুক্তি হ'ল : কংগ্রেসই এখন সর্বভারতের

বিপ্লবীসংঘে পরিণত হয়েছে, তখন পৃথক দল রেখে আন্দোলনকে খণ্ডিত করব কেন? কায়মন দিয়ে এর পর থেকে কমলা কংগ্রেসের কাজ করেছেন এবং প্রভূত দায়িত্ব নিবেছেন।

শ্রীমতী কমলার ব্যক্তিগত জীবনের এতটুকু পরিচয় এখানে অবাস্তব নয়— কারণ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর দানের ভিতর তাঁরও দান সামান্য নয়; নিজে তিনি লিখতে গিয়ে নিজের দানের উল্লেখ সম্বন্ধে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঐক্য পরিচয় দেবাব মুখ্য উদ্দেশ্য সেটি নয়। উদ্দেশ্য, এই কথাটুকু শুধু বলা যে, তিনি যেমন ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে করেছেন বিপ্লবী-দলের কাজ, তেমনি প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গেই ক’রে গেছেন কংগ্রেসের প্রচার-কাজ এবং তেমনি গঠনমূলক কাজ। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেণীব কর্মীর কাজই গভীর শ্রদ্ধা ও দবদ দিয়ে দেখতে পেরেছেন। তিনি ছোট ছোট আলেখ্যগুলি তুলে ধরেছেন যেন এক এক জন নেতা ও কর্মীকে ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দিচ্ছেন। সকলের জীবনের সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নানা কারণে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সে-হিসাবে এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ হ’তে বাধ্য।

কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা এবং বিষয়ের কথা—এত সংখ্যায় বাঙালী নারী যে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে আত্মত্যাগের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, একখানি বইতে সেই পবিচয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবন ধারা দেখেছেন তাঁরা চিন্তা করতে গেলে অবাক হয়ে যাবেন। বাঙালী পুরুষদের পক্ষে তাঁরা যা করেছেন, তার অনেকখানি পরিস্ত তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়,—অনেকখানি অবশ্য আছে, যা চিরদিন ইতিহাসের বিষয়ের বস্তু হয়ে থাকবে; আর, বাদবাকী অনেকখানি সম্পর্কে এমন প্রশ্নও অস্বাভাবিক হবে না যে, আরও আগে তাঁরা সেটুকু পর্যন্ত করেন নাই কেন? কিন্তু সেকালে আমাদের নারীদের জীবন কি ছিল? শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। আর, শিক্ষিত হ’লেই বুদ্ধির মুক্তি হয় না; বুদ্ধির মুক্তি হ’লেই সেবার প্রেরণা, আত্মত্যাগের সংকল্প জাগে না। যুগ যুগ ধ’রে অবরোধের অন্তরালে আমাদের দেশে নারীদের জীবন আর ধর্ম ছিল একান্তভাবে বিশ্বাস, আচার আর অহুষ্ঠান। এর বাইরে আর কিছু মনে আনাও তাঁদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, বুদ্ধিতে ছিল পাপ। দাসত্ব?—সে তো ভগবৎদত্ত, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই একটি অনিবার্য বস্তু। কি পরিবারে,

কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে শুধু মেনে-চলাব বাইরে আব যে কোনো বিধিব্যবস্থা হ'তে পাবে, আমাদের বাপ-দাদাবাই কি তা ভেবেছেন, না, সে কল্পনায় আমাদের উদবুদ্ধ কবেছেন? এই পাবিপাশ্বিকের ভিতর গ'ড়ে উঠেও যে বাঙালী নাবীবা এত অল্প সময়ে এত সংখ্যায় নানাভাবে দেশসেবার, স্বাধীনতার সাধনাব কাজে লেগেছেন, কমলার লেখায় সেই পবিচয় পেয়ে অনেককিছু ভাববাব উপাদান পাওয়া যায়, অনেক আশাব ভিৎ গ'ড়ে তুলবাব মালমশলা পাওয়া যায়।

নাবীবাও আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিবেছেন, কথাটা শুনলে— নবলা দৈবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, প্রীতিলতা ওষাদ্দেদাব, হুচেতা রূপালানী, এমনি ছ'পাঁচজনাব কথাই আমাদের মনে আসে। কিন্তু এমনি ছ'পাঁচজনাব নাবীদেব দান সমাবদ্ধ থাকলে তেমন বিশ্ববেবও কিছু থাকতো না, খুব একটা আশাব ভিৎ গ'ড়ে উঠতো না। কমলা অনেকবই জীবন কাহিনাব কিছু পবিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে আবও দিয়েছেন কয়েকটি জেলাব মহিলা কর্মীদের এক একটি তালিকা। এ তালিকা যে সম্পূর্ণ এমন মনে কবা চলে না। তাছাড়া, শুধু যে কয়েকটি জেলাব তিনি সংগ্রহ কবতে পেবেছেন, সেই কয়েকটি জেলারই এইসব নাম তিনি দিয়েছেন। এই তালিকাগুলিকে মাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখা সম্ভব। এতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, বাংলাব প্রত্যেক জেলাবই বহু নাবীকর্মী স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। তাব অর্থ, আজ আমাদের সমগ্র নাবীসমাজেই কত জ্ঞাত শুধু বুদ্ধিব মুক্তিই শুক হয় নাই, আত্মত্যাগেব আনন্দেব আভাসও ছড়িবে পডছে।

বুদ্ধিব মুক্তিতে আত্মত্যাগেব দিকে না গিয়ে ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনেব দিকেও মানুষ বেতে পাবে। আমাদের পুরুষসমাজে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি তা ই হযেছিল। আবাব, সাব জন অ্যাণ্ডারসনের সম্ভাববাদবিশ্বাস সংগ্রামের দিন থেকে শুরু ক'রে গত লড়াইয়েব এবং পরবর্তী যুগে আমাদের সমগ্র সমাজে শতাব্দীর প্রথম ভাগেব সেই বিবাত্তেব সাধনার, মহত্তর জীবনাদর্শের এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সেই আদর্শনিষ্ঠা, সেই সাধনা, সেই ধৈর্য, সেই স্বপ্নে-ভবা জীবন, সাগ্রহে কঠোরতাকে, ত্যাগকে বরণ ক'রে নেবার সেই প্রতিযোগিতা আজ যেন আমাদের সমগ্র জীবন থেকেই লোপ পেতে বসেছে। কিন্তু এতে নিরাশ হবার কিছু নেই। এ একান্ত স্বাভাবিক। প্রগতি এক সরলরেখাবাহী স্রোত নয়। বাদের প্রতিবাদ হযেই। যা ছিল একদিন

গভীরে, তা-ই ছড়িয়ে যাচ্ছে আজ ব্যাপকে । সেদিনের গভীরের সেই সম্পদ
যে একদিন আমাদের সমগ্র জীবনের একান্ত নিজস্ব বস্তু হয়ে উঠবে এক নতুন
বিশ্বসৃষ্টির প্রেরণায়, তারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে গ'ড়ে উঠছেন আজকের আমাদের
মা-বোনেরা ; আর, সেই মা-বোনেরা, এই বইয়ে যাদের পরিচয় গাঁথা হয়েছে,
তাদেরই সন্ততি ।

ঢাকা

৩০।১২।৫৭

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

ভূমিকা

পবাধীন মাতৃভূমির দাসত্বলেখা ঘোচাতে গিয়ে ভারতের কত নবনের মণি, কত অন্ধের ষষ্টি নিজেদের সোনার সংসাব, স্বথের নীড স্বহস্তে ভেঙে ফেলে আপনাকে বিক্ত ক'বে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তাব অবধি নেই। ইচ্ছা করে, তাঁদের বেঁধে বাধি জাতিব অস্তুরেব অস্তঃপুবে। আরো মনে হয়, ভবিষ্যতে ষাৰা ইতিহাস লিখবেন তাঁরা উপাদান সংগ্রহ করবেন এবং সেজন্ত তাঁদের হাত দিতে হবে গবেষণামূলক কাজেও। কিন্তু আজ যদি কেউ কেউ প্রামাণিক বিবরণ কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রে যান—হোক তা সংক্ষিপ্ত, হোক তা অসম্পূর্ণ—তবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসিকদের পক্ষে কর্মীদের নিজেদের দেওয়া এই তথ্য পেলে হয়তো কিছু সুবিধা হ'তে পারে।

তাই আমাব মতো ক্ষুদ্র শক্তির এই অপরিদীম ধুটতা। ১২০৫ সাল থেকে ১২৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারীর অবদান যতটুকু আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল, তাই ক্ষুদ্র আকারে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং আমার এই লেখা,—যা জীবনচরিতও নয়, ইতিহাসও নয়,—ইতিহাসেব কিছু উপাদান মাত্র, উপাদান হিসাবেও অসম্পূর্ণ এবং সেটা কিছু পরিমাণে অনিবার্ধ। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতো ষাঁদের কথা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি, তাঁদের সব কথা সংগ্রহ করতে পারিনি বা সংগ্রহ করেও শুছিয়ে লিখতে পারিনি।—অসম্পূর্ণতা শুধু এটুকুর মধ্যেই নয়। এর আরো একটা দিক আছে, সেটা আরো গুরুতর।

কার্লাইল তাঁর কোনো একটি লেখায় এমনি একটা কথা বলেছেন : ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের অন্তর জুড়ে রয়েছে বড় বড় ঘটনা, বড় বড় মানুষের জীবন-কাহিনী । এই ইতিহাসের ধারাপথে পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের মতো আমাদের চোখের সমুখ দিয়ে চলেছে কত বিরাট ব্যক্তিত্ব, কত যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়, কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত ভাঙা কত গড়া । কিন্তু যে মানুষ প্রথম কোদালখানা তৈরী করেছিল—হামরা জানি না সে কে ছিল, কবে ছিল, কোথায় ছিল । ইতিহাসের পটে তাঁর নাম নেই, আমাদের মনের পটে তাঁর ছবি নেই । কিন্তু সভ্যতা-বিকাশের ক্ষেত্রে সেই মানুষের দান কোনো সাম্রাজ্যের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় ।.....নদীর উপবের উর্মিমালাই আমাদের চোখে পড়ে । কিন্তু এই লীলাচঞ্চল উর্মিমালার নীচে যে বেগবান প্রবাহ তা অলক্ষ্য ব'লেই সচরাচর আমাদের অজ্ঞাত । সমাজের জীবনপ্রবাহে এই অলক্ষ্য বেগ সঞ্চার ক'রে চলেছেন যারা, তাঁদের ছবি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরবার কোনো পথ নেই । তাঁরা অখ্যাত, অজ্ঞাত, অনামী ।

একথা সমগ্রভাবে মানব-সভ্যতার অগ্রগতিব ইতিহাসের পক্ষে যেমন সত্য, তাঁর অংশবিশেষ সম্বন্ধেও তেমনই সত্য । আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর দানের কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাটা বার বার মনে হচ্ছে যে, সেদিনের বিজয়-অভিযানে আমরা দেখেছি শুধু তাঁদের, যারা ছিলেন আমাদের কাছাকাছি, পাশাপাশি বা অন্ততঃ দৃষ্টির সীমার মধ্যে । আমাদের দৃষ্টির নেপথ্যে যারা ছিলেন তাবা ওই অনামী । তাঁদের অলেখ স্বতন্ত্রভাবে আমার এই ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে গঁথে দিতে পারলাম না ব'লে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই । এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় সেই অপরিচিত অনামীদের উদ্দেশে আমার সমস্ত অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই ।

‘রক্তের অক্ষরে’ বই লিখবার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি এই বই লিখতে গিয়েও আমার আত্মবিশ্বাস একেবারেই দানা বাঁধছিল না । কিন্তু আগের বারের মতোই সাহিত্যিকা বাণী রায় আমায় উৎসাহ দিয়েছেন, খুঁটি গেড়ে রেখেছেন যেন আমায় এই বই শেষ ক'রে ঐ খুঁটি পর্যন্ত পৌছতেই হবে । স্নেহভাজন হেমন্ত তরফদার পশ্চাতে থেকে কেবলি বলেছেন—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন, কিছু ভয় নেই । শ্রদ্ধেয় ভূপেনদা (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) এবারেও আগাগোড়া পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমার মনে সাহস সঞ্চার করেছেন । শ্রদ্ধেয় যাদুদা (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম

দুটো অধ্যায় শুধু দিয়ে আমায় শিক্ষা দিয়েছেন ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য রেখে যাবার বিজ্ঞান ।

আমি প্রামাণিক বিবরণ রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঠাঁদের কথা লিখেছি সেইসব কর্মীর কাছ থেকেই সোজা সৃষ্টি তাঁদের কথা জানতে চেয়েছি সংক্ষিপ্ত আকারে । কেউ মুখে ব'লে গেছেন, আমি লিখে নিবেছি ; কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন, আমি সেসব আমার ভাষায় সাজিয়ে নিয়েছি এবং প্রয়োজনমতো আবো সংক্ষেপ করেছি ।

স্থান সংক্ষেপ করবার প্রয়োজনে 'শ্রী', 'শ্রীযুক্তা', 'স্বর্গীয়' প্রভৃতি শ্রদ্ধাবাচক শব্দগুলি বাদ দিয়েছি মনে-মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা বেখেই ।

বর্তমানে আমাদের দেশে সালের ব্যবহার চলছে তিন প্রকাব—খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ । আমি খ্রীষ্টাব্দকে গ্রহণ করেছি সুবিধাব জ্ঞাত ।

এই বই লিখবার বসদ সংগ্রহ করতে অনেকে অনেকভাবে সাহায্য ক'রে আমায় অশেষ ধন্য ক'বে বেখেছেন । তথ্যাত্মকভাবে আমাকে অমূল্য সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছেন ডঃ কালিদাস নাগ, শ্রীসাতারামজী সন্কেরিয়া, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীলীলা রায়, শ্রীআশালতা দেন (এ'রই সাহায্যে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাকিস্তানে অবস্থিত মহিলা-কর্মীদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে), শ্রীপূববী মুখোপাধ্যায়, ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি ।

'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী' বই আমি তাঁদের মনে করেই লিখেছি যেসব নারী বাংলাদেশে কাজ করেছেন । তিনি বাঙালী বা অবাঙালী দুই-ই হ'তে পারেন । আবার যেসব বাঙালী নারীর কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ বাংলার বাইরে ছিল, তাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে পারিনি, বইয়ের আকার বেশি বড় করা চলবে না ব'লে । তাই স্বর্গত সরোজিনী নাইডু, শ্রীঅরুণা আসফ আলি প্রভৃতিকে বইতে স্থান দিতে না পেয়ে আমার রচনা সেদিক থেকেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল । আমার লেখায় যা কিছু ত্রুটি, যা কিছু অসম্পূর্ণতা—সবকিছুর জ্ঞাত আমি মার্জনা ভিক্ষা করি ।

সূচীপত্র

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা	...	-
স্বাধীনতা সংগ্রাম বিংশ শতাব্দী	...	১
[১৯০০ - ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ]	...	২৯
সবলা দেবী চৌধুরাণী	...	৩৩
ননীবালা দেবী	...	৩৩
দুব ডিবালা দেবী	...	৮০
ক্ষোবোদাসুন্দরী চৌধুরী	...	৮৪
বাসন্তী দেবী	...	৮৭
নেলী সেনগুপ্তা	...	৫০
উর্মিলা দেবী	...	৫২
হেমপ্রভা মজুমদার	...	৫৪
মোহিনী দেবী	...	৫৫
লোতির্ময়ী গাঙ্গুলী	...	৫৯
লাবণ্যপ্রভা দত্ত	...	৬২
চাক্ষালা দেবী	...	৬৭
শান্তি দাস (কবীবা)	...	৭১
বিমলপ্রতিভা দেবী	...	৭৩
ইন্দুমতী গোয়েন্দা	...	৭৬
কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি	...	৭৯
লীলা নাগ (বায়)	...	৮২
কলাগী দাস (ভট্টাচার্য)	...	৮৯
আশালতা সেন	...	৯৫
শশীবালা দেবী	...	১০৩
লাবণালতা চন্দ	...	১০৫
সরলাবালা দেব	...	১১০
• শান্তি ঘোষ (দাস)	...	১১৩
ও সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)	...	১১৩
• বীণা দাস (ভৌমিক)	...	১১৯

• পীর্ণ শ্রুতি ওয়াদাদাব	• •	১২৫
• কখনা দত্ত (যোশী)	•	১৩১
ডঙ্কা বা মজুমদাব (বক্ষিত বায়)	•	১৩৬
জ্যোতিৰ্ণা দত্ত (বেরা)	• •	১৪১
পাকল মগাঠী		
ও উবা মগাঠী	•	১৪৩
সাবিত্রী দেবী		১৪৬
ইন্দুমতী সিংহ	•	১৪৯
সুহাসিনী গাঙ্গুলী	• •	১৫১
প্রফুল্লবিনী ব্রহ্ম	• •	১৫৪
প্রাত্তভা ভদ্র (রায়)	• •	১৫৬
শোভাবালী দত্ত	•	১৫৯
বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)	• •	১৬৩
বেণু সেন (বশ)	• • •	১৬৬
হেলেনা দত্ত	• • •	১৬৯
লাবণ্য দাশগুপ্ত	•	১৭২
প্রমীলা গুপ্ত		
ও সুশীলা দাশগুপ্ত	•	১৭৪
ইন্দুমতী ঘোষ	•	১৭৬
আভা দে	• • •	১৭৮
শান্তিমতী ঘোষ	• •	১৮১
স্বলতা মিত্র (কব)	•	১৮৫
সবোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ)	•	১৮৮
ইলা সেন	•	১৯০
প্রভা চট্টোপাধ্যায়	• •	১৯৩
চাকপ্রভা সেনগুপ্ত	• •	১৯৬
সরস্বালা সেন [ভোলা শহরের]	• • •	১৯৯
ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা	• • •	২০২
সুপ্রেমবালা রায়	• • •	২০৫
সুশীলা মিত্র	• • •	২০৭

দৌল ওয়েছা খাতুন	..	২১০
শ্বেতশালা চৌধুরী	..	২১২
সবমা মুখোপাধ্যায়	.	২১৪
নবেশনন্দিনী দত্ত	..	২১৬
যমুনা ঘোষ	..	২১৭
প্রভানলিনী ভাণ্ডারী	..	২১৯
বিস্ময়প্রিয়া দেবী	..	২২১
সবমা গুপ্তা	...	২২৩
সবয় গুপ্তা	..	২২৫
সবয়বালা সেন [ঢাকাব]	...	২২৭
নিবগবালা বন্দ্য	..	২২৯
উমা গুহ	...	২৩১
প্রফুল্লমুখী বসু	..	২৩৩
শতদল সবকাব	...	২৩৫
মাতঙ্গিনী হাফিজা	..	২৩৭
সুচত্রা কুপলানী	..	২৪৪
বেদা মিত্র	...	২৪৭
মায়া ঘোষ	..	২৫১
সন্ধ্যাবাগী সিংহ	.	২৫৫
রাণী চন্দ	...	২৫৭
বনলতা সেন (চক্রবর্তী)	...	২৬০
কিরণ চক্রবর্তী	..	২৬৩
নির্মলা রায় (সাম্রাট)		
ও সুসমা রায় (চক্রবর্তী)	...	২৬৫
ছায়া গুহ	...	২৬৭
মেধা ঘোষ	...	২৬৯
মীরা দত্তগুপ্ত	...	২৭০
অনিতা বহু	...	২৭২
উমা সেন (দাশগুপ্ত)	...	২৭৪
বীদেব কথ্য অজ্ঞই জানা গেছে	...	২৭৬

ସ୍ୱାଧୀନତା-ସଂଗ୍ରାମେ
ବାଂଲାର ନାରୀ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা

মর্গভেদী এক নিষ্ঠুর দৃশ্য মহর্ষি বাল্মীকিকে অব্যক্ত বেদনায় অস্থির ক'রে তুলেছিল। তাঁব অমৃত লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল মহাকাব্য—দুঃখসাগরের করুণ ধাবাব। স্বতঃস্ফূর্ত সেই ধাবা প্রবাহিত হয়ে যাবাব মূলে জেগেছিল এক কাতব স্পন্দন মহাকবিব হৃদয়ে। সে হৃদয়স্পন্দন মহাকাব্যের গতিপথে ক্রমে উত্তাল হয়ে, ফেনিল নীল তবঙ্গরাশি নিয়ে এগিয়ে চলল দুঃখসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওপাবের আশায়, যেখানে আছে দুঃখহুখের উর্ধ্ব এক মহাযাত্রা।

তেমনি পবাধীন ভাবতের মুক্তিসাধনাব মহাযাত্রায়ও বাংলাব নারী ছুটে চলেছিলেন বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু তাব পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জীবনে যে দুঃযোগময় তামসী রাত্রি ছিল, তাঁদেব সেই অবর্ণনীয় দুর্দশা কথেকজন মহামানবের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিল এক অসহ্য যাতনা। তাঁবা স্থির হয়ে সে-দৃশ্য সহ করতে পারেননি। তাঁদেব হৃদয় মগুন ক'রে জেগে উঠেছিল একটা গতির স্পন্দন। তাঁরা মহাকবি বাল্মীকিব মতোই মহাকাব্যের গতি নিয়ে এলেন এদেশের মাহুঘের পীড়িত লাহিত অর্ধাংশেব জীবনে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপে। সেই গতি তিলে তিলে ক্রমে ক্রমে বেগ থেকে মহাবেগে প্রবাহিত হয়ে আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে অনেকখানি গৌরবের রূপ ধারণ করেছে।

কাজেই বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রাপথে এগিয়ে আসতে বাংলার নারী সহজে বা হঠাৎ পারেননি। অতি ধীর ও কঠিন তাঁদের যাত্রাপথ। তাঁরা ঘন তমিষার মধ্য দিয়ে পল গুণে গুণে চলেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বিক্ষুব্ধ আলোড়নের কাহিনী অতি সংক্ষেপে একটু চোখ বুলিয়ে না গেলে, বাংলার নারীর পক্ষে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রায় যোগদান করা কত যে কঠিন ছিল, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ষোড়শ শতাব্দীর ‘স্মৃতি’র ব্যবস্থার উপর ছিল তখনকার দিনে বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই অপ্রতিহত গতিতে চলে এসেছিল। এই স্মৃতির ব্যবস্থার মধ্যে আছে—সতীদাহ বিধি, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নারীর মানবিক অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই অধিকার অর্জনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩ খ্রীঃ) সেইসময়কার স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক বিষয়ে যা লিখেছেন, তারই একটা অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দিলাম :

কুলীন ব্রাহ্মণরা তখন বহু বিবাহ করতেন। সারাজীবনের মধ্যে হয়তো স্ত্রীদের এক এক জনের সঙ্গে দু’চারবার মাত্র সাক্ষাৎ হ’ত। স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন হয়ে, নানা দুঃখে সারাটা জীবন অতিবাহিত করতেন। যারা কুলীন ব্রাহ্মণ নন অথবা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন সেখানেও বহু স্ত্রীলোকের দুর্গতির অন্ত ছিল না। রান্না ও শুধুই ঘরের কাজে দাসীর পর্যায়ে তাঁদের রাখা হ’ত এবং সকলের সকল অল্পযোগ ও গল্পনা তারা সহ্য করতে বাধ্য হ’তেন। অনেক সময়ে সকলের আহ্বারের পর কিছু কিঞ্চিৎ যা পড়ে থাকতো, তাই দিয়েই তাঁদের ক্ষুদ্রিত্ব করিতে হ’ত। দরিদ্র সংসারে তো তাঁদের দুঃখক্লেশের অন্তই ছিল না। আবার ধনীর সংসার হ’লে, স্ত্রীর জাতসারে বা দৃষ্টিগোচরে স্বামী বহুক্ষেত্রেই ব্যভিচারে মত্ত থাকতেন। স্ত্রীর মানসিক ক্লেশের অন্ত থাকত না।

রাজা রামমোহনের এই বিবরণ থেকে তখনকার সমাজের একটা দিকের ছবি আমরা পেলাম। সমাজের অল্প দিকটাও কম দুর্বহ ছিল না।

মুসলমান আমল থেকে চলে এসেছিল পর্দাপ্রথা। নারী ঘরের বাইরে বের হ’তে পারবেন না। তাঁরা অসুখসুস্থ। গল্পান্বন করতে হলেও মেয়েদের পাল্কি-সুন্ধ চুবিয়ে আনা হ’ত।

তখন বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল সর্বব্যাপী। শিশুবয়সে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে, তাদের পরিবারকে একঘরে ক’রে রাখা হ’ত। ঐ শিশুবিবাহকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ক’রে বলা হ’ত গোঁরীদান।

পর্দাপ্রথা ও গোঁরীদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আসে অশিক্ষা। বলা হ’ত স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। তাদের লেখাপড়া শেখা পাপ।

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা

অতএব মেয়েরা বইলেন নিরক্ষর, কুসংস্কাবাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও মূর্খ। বলিব পশুর মতো তাদের জীবন। স্বৃতিকার ব'লে দিলেন, তাঁদের কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নেই, পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই, সম্পত্তিতে অধিকার নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আবস্ত ক'বে সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী এই শোচনীয় সমাজ ব্যবস্থার বিকল্পে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। এই সমাজ বিপ্লবের কাহিনীই অতিসংক্ষেপে একটু আভাস দিয়ে যাই।

সেই কোন প্রাচীনকালে কী কারণে যেন ভাবতে সতীদাহ নাম দিয়ে নারীবলি শুরু হয়েছিল। অবশ্য সকল নারীই সতীদাহ হ'তেন এমন নয়। কিন্তু ধর্মের নামে এই নারীবলি প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি মাদকদ্রব্য সেবন কবিষে, মৃত স্বামীর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেধে জীবন্ত অবস্থায় নষ্ট করা হ'ত।

শোনা যায়, রাজা রামমোহনের আত্মবল্লীকে সতীদাহ করা হয়েছিল। রুদ্ধ আবেগে ছুটে এসেছিলেন তিনি নারীর জীবনে বেচে থাকবার অধিকার দান করতে।

পুস্তিকা লিখলেন তিনি 'সহমরণ ও অন্তিমরণ। বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'বে তিনি সমাজে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বেঙ্টিঙ্কের আমলে এই সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ হয়।

রাজা রামমোহনের পরে আবির্ভূত হন আব-এক মহান সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্য, পৌরুষ ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বাংলাদেশ কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, বিধবার বিবাহ দিতে হবে। শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। হিন্দুসমাজ ভয় পেয়ে চীৎকার করতে লাগল। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন প্রধানতঃ তিনজন মানবদরদী মহাত্মা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু। তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই 'বিধবা-বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ হয়।

১৮২৯ সালের 'সতীদাহ নিবারণ আইন' এবং ১৮৫৬ সালের 'বিধবা-বিবাহ আইন' যুগ-প্রবর্তনের দুই সন্ধিক্ষণ। রাজা রামমোহন নারীকে দিয়েছিলেন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

জীবনে বেঁচে থাকবার অধিকার। বিত্তাসাগর নারীকে দিলেন আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

নারীকে আপন মৰ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন ও বিত্তাসাগরবই শুধু নন, আমরা পেয়েছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক প্রধান সমাজ-সংস্কারক রূপে। এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তারপর মানবতার পূজাবী স্বামী বিবেকানন্দ শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই জড়নিত্রা থেকে, হীনমত্ততা থেকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪ খ্রিঃ) বিধবা-বিবাহ দিতে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, তাঁদের কেউ বিবাহ কবতে চান না। জাতিভেদ প্রথা অতি প্রবল। নিজের জাতির গণ্ডীর বাইরে যেতে কেউ রাজী নন। কেশবচন্দ্র বললেন, আমি অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করব। বিবাহ বিবাহই। গণ্ডীর ভিতরে না হ'লে গণ্ডী পার হ'য়ে গিয়ে পরিধি বিস্তীর্ণ কবতে হবে। আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের দান এখানে অবিস্মরণীয়। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ সালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অথবা 'তিন আইন'-এর বিবাহ বিধিবদ্ধ করালেন। জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি সেদিন হিন্দুসমাজকে টেনে নিয়ে চললো সামনের আলোকরশ্মির দিকে। তাঁরা সকল জাতির মধ্যে বিবাহের সুফল সমাজকে দেখাতে লাগলেন। এই তিন-আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, বাল্যবিবাহও প্রায় নাই, বহুবিবাহ তো একেবারেই নাই।

সেই অগ্রগতিই পূর্ণ রূপ পেল ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' ও 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন'-এ। এতদিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দেশের নারী বিবাহ ও সম্পত্তিতে অনেকখানি স্বাধিকার পেলেন।

আবার ফিরে যাই সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিত্তাসাগরের যুগে। বিত্তাসাগর দেখলেন, কেবলমাত্র সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হ'লেই চলবে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একান্ত প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি জনমনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার ক্ষমতা প্রচারকার্কে ব্রতী হলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিত্তাসাগর দুই যুগ-সম্পাদক আনতে চাইলেন সমাজে প্রচণ্ড মানসিক বিপ্লব। জ্ঞান-শিক্ষা, জ্ঞান-স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ লেখা দিয়ে তাঁরা সমাজকে নাড়া দিতে চাইলেন, সাড়া জাগাতে চাইলেন।

নারী-আন্দোলনের প্রবর্তক এইসব মনীষী উপলব্ধি করেন যে, নারীরা অগ্রণী হয়ে তাঁদের অধিকার বুঝে নেবার প্রচেষ্টায় নিজেরা আত্মনিয়োগ না করলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তার প্রধান অন্তবায় সাধারণভাবে নারীজাতির শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাবের জন্ত নারীর মন কুসংস্কারমুক্ত নয়। তাই এইসব যুগপ্রবর্তক মনীষিগণ দ্বীপশিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিলেন।

১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন ‘বেথুন স্কুল’ রামগোপাল ঘোষ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহযোগিতায়। বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারি। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা গ’ড়ে উঠবে এই আশঙ্কায় বিরুদ্ধবাদীরা চীৎকার করতে লাগলেন—মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে, জাতি যাবে। কুসংস্কারেব এই কঠিন পরিবেশের মধ্যেও কয়েকজন মহাপুরুষ ছিলেন আপন সংকল্পে অটল।

সর্বপ্রথম ষাঁরা বেথুন স্কুলে নিজের মেয়েদের স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ‘সংস্কৃত কলেজ’-এর পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর দুটি মেয়ে ভুবনমালা ও কন্দমালা দেবীকে তিনি ‘বেথুন স্কুল’ প্রতিষ্ঠা হবার প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১৮৪৯)। একবছরের মধ্যেই মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়। উইল ক’রে তিনি ত্রিশহাজার টাকা ও নিজের গাড়ীঘোড়া এই স্কুলকে দান ক’রে যান।

১৮৬২ সালে দেখা যায়, ১৫টি স্কুল বেথুন স্কুলের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ছাত্রীসংখ্যা—৫৩০।

দ্বীপশিক্ষা-বিস্তার আন্দোলনে এসে যোগ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরম্ভ হয় ‘অন্তঃপুর শিক্ষা’র (১৮৬২—৬৩ খ্রিঃ)। অন্তঃপুরে গিয়ে বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র বেথুন স্কুল ও ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত আরো কতগুলি প্রতিষ্ঠান দ্বীপশিক্ষা প্রচার এবং সমাজ-সংস্কার করবার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের বন্ধমুষ্টির উপর ক্রমাগত চাপ ও আঘাত পড়তে থাকে, ফলে বন্ধমুষ্টির কাঠিন্য ক্রমেই শিথিল হয়ে এল। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করছি : (১) সমাজোন্নয়ন বিধায়িনী স্বেচ্ছা সমিতি (১৮৫৪), (২) সর্বশুদ্ধকরী সভা (১৮৫০), (৩) ব্রাহ্মবন্ধু সভা (১৮৬২),

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

(৪) বামাবোধিনী সভা ও পত্রিকা (১৮৬৩, ১৮৬৪), (৫) উত্তরপাড়া হিতকরী সভা (১৮৬৪), বরিশাল মহিলা উন্নয়ন সমিতি (১৮৭১), (৭) বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭২), (৮) ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ (১৮৮০ অথবা ১৮৮১), (৯) ত্রিপুরা জেনানা শিক্ষা সমিতি, (১০) বাথরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা, (১১) মৈমনসিংহ সম্মেলন, (১২) ভিক্টোরিয়া স্কুল (১৮৮২), (১৩) ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (১৮৯০), (১৪) নিবেদিতা বিদ্যালয় (১৯০৩), ইত্যাদি।

এই সময়ে খ্রীশিক্ষা-প্রচারে খ্রীস্টান মিশনারীদের দানও কম নয়।

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় এক একটি ক'রে সমিতি গড়ে ওঠে এবং খ্রীশিক্ষা ও খ্রীজাতির উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে কাজ ক'বে যায়।

সাধারণ ঘরের হিন্দুবা ব্রাহ্মদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াতে ও উচ্চশিক্ষা দিতে সাহস করতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সর্বোববে আপন শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন।

১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল ইউনিভার্সিটির সেনেট এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, ছাত্রীরাও ইউনিভার্সিটি-পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পাবার এক বিরাট বাধা দূর হয়ে যায়। বেথুন স্কুল সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হয়। বেথুন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিভাগের নম্বর থেকে মাত্র একনম্বর কম পান তিনি। তার আরো বেশী অধ্যয়ন করবার স্পৃহা জাগে। গভর্ণমেন্ট বেথুন স্কুলে কলেজ-রাস খুললেন। ১৮৮০ সালে অবলা দাস (লেডি বসু) এন্ট্রান্স পাস ক'রে স্কলারশিপ পান। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে চেয়ে দরখাস্ত করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ অস্বীকার দিলেন না, তীব্র আপত্তি জানালেন ও প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি একটা উদার দৃষ্টির পরিচয় দেন। তাঁরা অবলা দাসকে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়তে অস্বীকার দিলেন।

বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বি.এ. পাস করেন। ঐ সালেই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারিক গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাদম্বিনী বসুর বিবাহ হয়। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে অস্বীকার চাইলেন। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ এবার এক প্রস্তাব পাস ক'রে তাঁকে অস্বীকার প্রদান করেন। তিনিই এখানকার

প্রথম ছাত্রী। তাঁর পরে আসেন বিধুমতী বসু ও ভার্জিনিয়া মিত্র। শ্রীমতী মিত্র ১৮৮৮ সালে মেডিকেল কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। নারী ধীরে ধীরে আপন স্বেচ্ছাশ্রিত প্রকাশ করবার পথ খুঁজে পেলেন।

১৮৯০ সালে তিনটি মেয়ে ইংরাজি বিষয়ে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। তাঁদের মধ্যে সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরানী) ছিলেন অগ্রতম। রাজনীতির বাজ তখন স্থপ্ত ছিল এই মহীয়সী নারীর মধ্যে। পরবর্তী জীবনে এই নারী সমগ্র জাতিকে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিবে উদ্ভুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

জীশিক্ষার প্রসার যেমন একদিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি অগ্রদিকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫ খ্রীঃ) এবং সমগ্র ঠাকুর পরিবারেব দান বাংলাদেশে নারী-সমাজকে অনেকখানি অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল।

ঠাকুর পরিবার পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মার্জিতরূচি। তাঁরা নাবীকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে স্থখী ছিলেন না। তাইদেব শিক্ষা ও সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের সমান স্তরে উঠিয়ে এনে, আনন্দের সমান অংশ দিতে, জীবনে মানুষের যোগ্য হয়ে বেঁচে থাকবার ও বিকাশ লাভ করবার প্রেরণা দিতে চাইল। মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্রকন্যা ও বধূগণ এই আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন।

যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও বধূদের গঙ্গান্নান করতে হলেও পাল্কি-সুন্ধ গঙ্গায় চুবিয়ে আনা হ'ত, সেই ঠাকুর পরিবারের বোঁ হয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বহু বিঘ্ন পাব হয়ে বিলাত যান। পাল্কিতে ক'রেই তাঁকে জাহাজ পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল।

বাঙালী মেয়েদের তখনকার দিনের পোশাক ছিল কেবল একটিমাত্র শাড়ী। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন ঐ পোশাকে ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না। স্বামীর অহুরোধে ও আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গুজরাটী মহিলাদের অহুররণে সভ্য ও সুন্দর পরিচ্ছদ প'রে দেশে ফিরলেন। “দেশীয়তা, শোভনতা ও শালীনতা” এল বাঙালী নারীর পোশাকে।

এই পরিবারের সব মেয়ে ও বধূরা লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। অবরোধ-প্রথা অতি ধীরে ধীরে অপহৃত হ'তে আরম্ভ করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লখন “শত শত ইংরেজ মহিলার মধ্যে গিয়ে প্রাকান্ত স্থলে বসতেন” তখন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ঐ পরিবারেরই গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তির রাগে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তেন।

জ্যোতিবিন্দুনাথ ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যখন ছুটি আরবী ঘোড়ায় চ'ড়ে গডের-মাঠে বেড়াতে যেতেন তখন পথের দু'ধারে লোকে কোঁতুহলে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো।

ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে নারী-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই তরঙ্গমালা এই পরিবারেব সীমা অতিক্রম ক'রে দুই কূল ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

এইভাবে কঠিন প্রয়াসে স্ত্রীশিক্ষার ও নারী-জাগরণের ধারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, যদিও সে-গতি তখনও সতর্ক, ধীর, বিলম্বিত। ওদিকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জাতীয়তাবোধ, একতা এবং জাতীয় উত্থানেব আকাঙ্ক্ষা নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মনে জেগে উঠতে থাকে।

আব একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় পাশ্চাত্য সমাজে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে ফিবে এলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদের মাধ্যমে সমাজসংস্কার, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক প্রেরণা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নতুন প্রাণ, নতুন চেতনার সঞ্চার করে। তিনি বলেন—“হে ভারত, পরাহুকরণে ও দাসস্থলভ দুর্বলতা সস্থল ক'বে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে? মূর্খ, অহুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না।” বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন পৃথিবীর অগ্রাগ্র জীবন্ত জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষ যেন সমান গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তাঁর সন্ন্যাসের আদর্শে “ব্যষ্টিমুক্তি ছেড়ে সমষ্টিমুক্তির আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে লাগল”। দুর্বল জাতিটাকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—“তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বৈচে আছ? ... তোমরা শূদ্রে বিলীন হও। আর নতুন ভারত বের হোক। বের হোক লাজল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালো, মুচিমেথরের রুপড়ির মধ্য হ'তে। বের হোক মুদীর দোকান থেকে, ভূনাওয়ালায় উত্থনের পাশ থেকে। বের হোক কারখানা থেকে, হাটবাজার থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে। ... এরা একমুঠো ছাড়ু

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা

থেয়ে দুনিয়া উন্টে দিতে পারবে। ... এই সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।”

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটি সামান্যতম মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। এই প্রচণ্ড আত্মত্যাগের প্রেরণা, তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও যুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জ্ঞাত আকুল আহ্বান দেশটাকে সেদিন প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ নারীও সেই জগৎবণে সাড়া দেবার জ্ঞাত উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী তখন শেষপাদে এসেছে। কিন্তু পদার প্রচণ্ড বাধা তখনো তাকে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে, তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

উচ্চশিক্ষার প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলার নারী ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রচেষ্টায় কঠিন লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলে দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার বিজয়-অভিযানে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

[১৯০৫—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ভাবতবর্ষ আজ স্বাধীন। এ কথাটা শুনে এখনি আব তেমন নতুন, তেমন উত্তেজনাময় লাগে না। কিন্তু এমন একটা সময় গেছে যখন শুধু ঐ স্বাধীন ভাবত আনবাব জন্য জাতির মর্মে মর্মে জেগেছিল আত্মাহুতি দেবাব নীবব সাধনাব দৃঢ় সংকল্প। তাদেব কাছে স্বগেব থেকেও অধিক প্রিয় স্বাধীন জন্মভূমি। এঁদেব মধ্যে আবাব এমন একদল ছিলেন যাদেব লোকে বলত পাগল, ক্যাপা। তাবা লোকচন্দ্রব অন্তবালে থেকে নিজেদেব নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'বে দিযে 'স্বাধীন ভাবত' আনবাব পথ স্বগম কবতে চেযেছিলেন।

কত ফাঁসী, কত দ্বীপাস্তব, কত ছেল, কত তিলে তিলে নির্যাতন সহ কবা, কত বেত আব বেটনেব প্রহাব, ঘোড়াব পাযেব নীচে কত পিষ্ট দলিত হওয়া, বুলেট ও বিভলভাবেব সামনে গিযে নিজেব বুক পেতে দেওয়া, এবোপ্নেন থেকে গুলী-বর্ষণেব সামনে অবতোভয়ে এগিযে বাওয়া—এসবই বংছে স্বাধীন ভারতবর্ষেব ভিত্তি নীচে গাঁথা। সেই ভিত্তি গ'ড়ে তুলেছেন বং অজ্ঞাত, অখ্যাত সৈনিক।

ঐ সমস্ত বীবদেব মধ্যে নবজাগ্রত নাবীদেবও একটা গোববময় অংশ ছিল। বিংশ শতাব্দীে প্রথমদিকে জ্বীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কাব ধীবে ধীবে অপসৃত হচ্ছিল। শত বাধা-বিঘ্নেব মধ্য দিযে নাবী-প্রগতি যতই বিস্তৃতি লাভ করে ততই নারী-সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তাঁদেব মধ্য থেকে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশিত হয় বাজনৈতিক গগনেও। ক্রমে পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা দেশমাতৃকার ললাট থেকে মুছে ফেলতে তাঁবাও কৃচ্ছসাধনায় যোগদান করেন অধিকতব সংখ্যায়। দেশেব লোক সবিস্ময়ে দেখল, নারী যেমন আপন শক্তিতে সমাজে নিজেদেব আসন ক'বে নিচ্ছেন, অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে নিচ্ছেন, তেমনি তাঁরা দায়িত্বও গ্রহণ করছেন। দেখতে দেখতে তাঁরা সমাজে চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালেন। ভারতের স্বাধীনতা-

সংগ্রামের ভিতর দিয়েও নারী নিজেদের কেমন ক'রে বিকশিত ক'রে তুলেছিলেন, সে কাহিনী স্মরণীয়।

মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের স্বযোগ পেয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে বেরিয়ে এলেন প্রথম নারী, প্রতিভাশালিনী সরলা দেবী চৌধুরানী। কেবলমাত্র নারী-মহলে নন, সমগ্র জাতিরই তিনি সেদিন একজন অগ্নিবাহিকা নেত্রী।

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও দেশপ্রেমের প্রেরণায় অমৃতপ্রাণিত ভগিনী নিবেদিতা এসে যোগদান করলেন অরবিন্দের বিপ্লবী দলে ১৯০৩ সালেব গোড়াতেই। ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অমূল্য দান চিরস্মরণীয়। প্রতিভা ও হৃদয়ের সমন্বয়ে অপূর্ব তেজোময়ী এই নারী। শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বামী বিবেকানন্দ একসময় নিজেই নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভাবতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে এই দেশ চিনিতে দিয়েছিলেন এবং নিবেদিতা আইরিশ মেয়ে ব'লেই এত সহজে ভারতবর্ষকে আপন দেশের মতোই সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালবাসতে শিখেছিলেন। কারণ আইরিশরা ছিল ইংরেজ-বিরোধী এবং নিবেদিতা ছিলেন নিজের দেশে বিদ্রোহী দলের মেয়ে। কাজেই তাঁর স্বদেশপ্রেম পরিণত হ'ল ভাবতবর্ষের দেশপ্রেমরূপে।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন “সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ” ছিলেন তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রচার করতে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিটা জাগ্রত হোক, এ জাতির লোক মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে উঠুক। নিবেদিতা গুরু আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এই পবাদীন যুগ্ম জাতিকে জাগ্রত করার প্রয়াসের ভিতর অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন।

নিবেদিতার পরিচয় হয় ঠাকুর-বাজী, সরলা দেবী ও বালিগঞ্জের কয়েকজন ইংরেজ শাসনে অসহিষ্ণু তেজস্বী লোকের সঙ্গে। এর মধ্য থেকে একটা গুপ্ত-সমিতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তাতে ব্যারিস্টার পি. মিত্র এবং নিবেদিতা সংযুক্ত ছিলেন।

সরলা দেবীর শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর শক্তি, সাহস ও বীর্য সংগঠনের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন বোম্বাইয়ে তাঁর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (I.C.S.) কাছে যান তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

অন্যদিকে ১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) বরোদায় যান। তিনি বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনবার স্বপ্ন দেখতেন। অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে তিনি বরোদার সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদায় অধ্যাপক ছিলেন এবং সেখানে ভাবুকের মতো অবসর সময় অতিবাহিত করতেন। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়লেন তিনি বিদ্বান, দেশপ্রেমিক ও গুপ্ত-সমিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এক চিন্তাশীল যুবকরূপে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে বাংলাদেশে গিয়ে কর্মক্ষেত্র তৈরী করতে প্ররোচনা 'ও উৎসাহ দিতে লাগলেন। তারপর অরবিন্দ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে রাজী হন। অরবিন্দ ঘোষ তার আগে ঠাকুরসাহেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

ওদিকে বিবেকানন্দের তিরোধানের পর, নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে নিবেদিতা গাইকোয়াডের আমন্ত্রণে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় যান। এখানে পরিচিত হন তিনি অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। নিবেদিতা অরবিন্দকে উপহার দিলেন বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'। তিনি বালিগঞ্জের গুপ্ত-সমিতির খবরও তাঁকে দিলেন। এই সাক্ষাতেই অরবিন্দ ও নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য একত্রে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিবেদিতা কথা দেন যে, অরবিন্দের পাশেই তিনি দাঁড়াবেন।

বরোদা থেকে চলে আসবার পর নিবেদিতা সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষ পৰ্যটন করতে করতে যেন আগুন ছড়িয়ে চললেন। তাঁর মাত্রাজে বক্তৃতার ফলে ১৯০৩ সালে নিবেদিতাকে বেলুড-মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়। কারণ তিনি বেলুড-মঠ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করলে মঠকে রাজরোষে পড়তে হ'ত।

১৯০২ সালের শেষদিকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেন সরলা দেবীর কাছে, যাতে সরলা দেবী তাঁকে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে সহায়তা করেন। সরলা দেবী তা করেছিলেন। কলিকাতায় এসে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আলাপ ও যোগাযোগ হয়।

১৯০৩ সালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে নিয়ে উঠলেন আমপুত্রে

বিপ্লবের অগ্নিহোত্রী যোগেন বিত্ভাভূষণের বাড়ীতে। সেখানে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) পরিচয় ঘটে।

এরপর বাংলায় যখন বিপ্লবীকেন্দ্র সূদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় তখন তাতে এসে যোগদান করেন বারীন ঘোষ, দেবব্রত বোস, নলিন মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর (মারাঠী যুবক), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভাই) প্রভৃতি। নিবেদিতা তাঁদের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। সখারাম শিক্ষা দিতেন অর্থনীতি। সখারাম লিখেছিলেন ‘ঝাঁসীর রাণী’, ‘বাজীরাও’ এবং ‘দেশের কথা’। ‘দেশের কথা’ বইয়ের মধ্যে এদেশের অর্থ নৈতিক দুর্গতির ইতিহাস,প’ড়ে যুবকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন।

বহু পত্রিকা ও কাগজে নিবেদিতা অলস্তু ভাষায় প্রবন্ধ লিখে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই জানা যায় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অল্পমোদন করেছে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে যায়। হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ সুরেন্দ্রনাথের আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনের আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত বাংলাদেশ ক্ষেপে ওঠে। নেতাগণ বিদেশী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করতে জাতিকে আহ্বান করেন। স্বদেশী আন্দোলন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে বিস্তার-লাভ করে।

অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি কাজ ক’বে চলেছে। নিবেদিতার বাগবাজারের বাসা তখন গুপ্ত-সমিতির একটি কেন্দ্র। ছেলেদের শোনাচ্ছেন তিনি বিবেকানন্দের বক্তৃনির্ঘোষ আহ্বান : “তোমার দেবতা চায় আজ তোমার জীবন-বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্ত দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।”

এই বিপ্লবের আহ্বানে তরুণদল উৎসাহে সাড়া দিয়ে উঠলেন।

ওদিকে স্বদেশী-পণ্য-উৎপাদনে জোয়ার এসেছে। দেশলাই, সাবান, কাগজ, কালি, চরকার সূতো প্রভৃতি প্রচলিত হ’তে থাকে।

১৯০৫ সালে বিশিণি পালের চরমপন্থী প্রতিষ্ঠান ‘স্বদেশী মণ্ডলী’ স্থাপিত হয়েছে। ঐ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রিন্স-অব-ওয়েল্স (পরে রাজা পঞ্চম জর্জ) কলকাতায় আসেন, তার পূর্বেই ‘স্বদেশী মণ্ডলী’ তাঁর অভিনন্দন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে কলিকাতায় চলে এসে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চললো।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় বিপ্লবীদের মুখপত্র ‘যুগান্তর’ পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল-সম্মেলনে অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন ছোটলাট ফুলার-এর দমননীতির প্রচণ্ড রূপ। ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি করবার জন্ত চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে পুলিশ নিদয়ভাবে প্রহার করে এবং পুলিশের অত্যাচারে সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হতে যায়।

বরিশাল থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ নিবেদিতার কাছে নিজের সংকল্প ব্যক্ত কবলেন। “ফুলার হত্যার আয়োজন চললো যুগান্তরের আড্ডায়”। অরবিন্দ প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন সক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে ‘বন্দে মাতরম্’ কাগজে।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে ‘যুগান্তর’-এর একটি প্রবন্ধের জন্ত ভূপেন্দ্রনাথের একবৎসর শ্রম কারাদণ্ড হয়। ‘বন্দে মাতরম্’ কাগজে অরবিন্দ লিখলেন “আবো অত্যাচার চাই”। নিবেদিতার উপর পুলিশের কড়া নজর লক্ষ্য ক’রে তাঁর হিতৈষিণ তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে গেলে দেশের কাজ কিছু করতে পারবেন না। বরং কিছুদিনের জন্ত ভারতবর্ষের বাইরে গেলে, সেখান থেকেও এদেশের জন্ত অনেক কাজ তিনি করতে পারেন।

সেই কথা অমুসারে, নিজের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই বছরের জন্ত নিবেদিতা ১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯০৭ সালে ‘বন্দে মাতরম্’ কাগজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে রাজদ্রোহের। অরবিন্দ বিচারে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করাতে বিপিন পালের হয় ছয়মাসের কারাদণ্ড।

কিংসফোর্ড-এর ঐ আদালতে বিপিন পালের দণ্ডাজ্ঞার দিনে যে ভীড় হয় তাকে দমন করবার জন্ত সার্জেন্টরা বেটন চার্জ করে। চৌদ্দবছরের বালক সুশীল সেন মার খেয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্টকে প্রহার করে। তাঁর ফলে

স্বাধীনত'-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

মামলা রুজু হয় এবং বালক শ্রীল সেনকে বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। বাজ্রোহের অভিযোগে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন এবং বিচারাবধীন অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন “পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও তজ্জয় সাহসের জীবন্ত বিগ্রহ”। উল্কাব গ্রায় তাঁর আবির্ভাব ও মৃত্যু।

ওদিকে মানিকতলায় মুবাবীপুকুর বাগানে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন চলেছে। ১২০৬ সালের জুন মাসে ছোটলাট ফলাবকে হত্যার জন্য আক্রমণ করা হয়। ১২০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ছোটলাট ফ্রেজার এবং ট্রেন ধ্বংস কববার দল লাইব্রেরি উপর বোমা ফাটে। “পশ্চাতে নায়ক অববিন্দ”। তিনি নিজে কিন্তু তখন যথাক্রমে কলিকাতায় শিবাজী উৎসবে ও মেদিনীপুর বাজনৈতিক কনফারেন্সে জনসভায় উপস্থিত। গাঢ়াকা দেবার অতিসুন্দর পোশাক।

গোবালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলী করা হয় ১২০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। চন্দননগরে মেয়রের উপর বোমা পড়ল। ১২০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড এবং উপর বোমা ছুঁড়তে গিয়ে কিশোর দুই বালক ক্ষুদিবাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ভুল করে দুজন ইংবেজ মহিলা—মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যাকে নিহত করে ফেলেন। শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয়—এই আদর্শ নিয়ে প্রফুল্ল চাকী নিজেও গুলীতে আত্মবলি দিলেন। অরবিন্দ প্রভৃতি ৪৭ জন গ্রেপ্তার হন আলিপুর বোমার মামলায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবার ফলে তিলকেব ছয়বৎসর কঠোর কাবাবও হয়। ক্ষুদিবামের ফাঁসী হয় ১২০৮ সালের ১১ই অগাস্ট। ১২০৮ সালের ৩১শে অগাস্ট আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে বাজসাক্ষী নবেন গোসাঁইকে হত্যা করেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু। কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসী হয় যথাক্রমে ১২০৮ সালের ১০ই এবং ২১শে নভেম্বর। কলিকাতা ওভারটুন হল-এ ১২০৮ সালের ৭ই নভেম্বর ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হয়। ১২০৮ সালের ২ই নভেম্বর পুলিশ-অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হয়।

অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় একবছর বিচারাবধীন অবস্থায় কারাবাসে থাকার পর মুক্তি পান ১২০৯ সালের ৬ই-মে তারিখে। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেক বিপ্লবীর

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

কঠিন সাজা হয়। ১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর তাঁদের আপিলের রায় প্রকাশিত হয়।

নিবেদিতা আর বাইরে থাকতে পারলেন না। তিনি ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। তাঁর কলিকাতা আসার কিছুদিন আগেই অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতার পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন—“জেলে একবছর কি ক'রে কাটালেন?” অরবিন্দ জবাব দিলেন—“যোগের অহুশীলন করেছিলাম। গীতার সাহায্যে যোগ আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম।”

অরবিন্দ কাগজ প্রকাশ করেছেন ‘কর্মযোগিন্’ ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন। ‘কর্মযোগিন্’ ও ‘ধর্ম’ এই দুইটি পত্রিকা অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করত।

বীবেন দত্তগুপ্ত হাইকোর্টে ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলমকে হত্যা করার পর নিবেদিতা খবর পেলেন অরবিন্দকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নির্বাসনে পাঠাবে। লিজেল রেম (Lizel Reymond) লিখিত নিবেদিতার জীবনীতে আছে যে, নিবেদিতা অরবিন্দকে ইংরেজ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দেন।

অরবিন্দ ‘কর্মযোগিন্’-এর সমস্ত ভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে চলে যান চন্দননগরে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পণ্ডিচেরি পৌঁচেছিলেন তিনি ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল। তারপরই ‘কর্মযোগিন্’-এর শেষ সংখ্যায় নিবেদিতা তীব্র বিদ্রোহের সঙ্গে পলাতক অরবিন্দের আসল ঠিকানা প্রকাশ ক'রে দিলেন।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা দার্জিলিঙে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বহু নারী নীরবে সকলের অলক্ষ্যে আন্দোলনকে সাহায্য করে গেছেন। একেবারে সামনে এসে প্রত্যক্ষ কাজ তাঁরা না করলেও এই নীরব দানের মূল্য সেদিন কম নয়।

তারই পর এল ১৯১৪ সালের অগ্নিযুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু হয়।

বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধের স্বযোগ নিয়ে

ভাবতবর্ষে অভ্যুত্থান ঘটানো। সে কথা পবে বলছি। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্বে কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড যা সেসময়ে সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনাব কথা প্রথমে ব'লে নিই।

১৯১৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি পাথুবিয়াঘাটা স্ট্রীটে বিপ্লবীদের একটি গোপন আশ্রয়স্থলের সন্ধানে গিয়ে গোয়েন্দা-পুলিস নীরোদ হালদাব নিহত হয়। এই গোপন আশ্রয়স্থলে তখন নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় বায়, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোবজ্রন সেন ও নবেন ভট্টাচার্য (বিপ্লবী এম এন. বায়) ছিলেন।

১৯১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে হেডুয়াব কাছে গোয়েন্দা-পুলিস ইন্সপেক্টর স্ববেশ মুখার্জীকে নিহত করা হয়। তাঁর সঙ্গী ইন্সপেক্টর বনবিহাবী মুখার্জী একটা চায়েব দোকানে টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ে যাব।

ঐ সালের ২১শে অক্টোবর মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের একটি ঘটনায় সাব-ইন্সপেক্টর গরীম ব্যানার্জী নিহত এবং উপেন চ্যাটার্জী আহত হয়।

৩০শে নভেম্বর সার্পেন্টাইন লেনে এক স্পাই এবং এক কনস্টেবলকে নিহত করা হয়। ১৯১৬ সালের ৪ঠা অগাস্ট সালকিয়ায় দুজন বিপ্লবীর সঙ্গে পুলিশের গুলী-বিনিময় হয়। সতীশ চক্রবর্তী ও যুগল দত্ত গুলী চালাতে চালাতে আশ্রয়স্থল থেকে বেবিয়ে পড়েন। যুগল দত্ত গ্রেপ্তার হন।

১৯১৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য মেডিকেল কলেজের সামনে নিহত হয়।

অর্থের প্রয়োজনে বিপ্লবীরা তখন কয়েকটি ডাকাতি করতে বাধ্য হইছিলেন। তাব মধ্যে দুই-একটি ঘটনা উল্লেখনীয়। ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. বায়) প্রভৃতি দিনে-দুপুরে খিদিরপুরে গার্ডেনরীচ-মোটর-ডাকাতি ক'রে বার্ড কোম্পানির ১৮ হাজার টাকা হস্তগত করেন। এখানে বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজের নিকট থেকে ডাকাতি-করা এই প্রথম এবং মোটর ব্যবহারও এব আগে কখনো হয়নি।

আব একটি ডাকাতির ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বিপ্লবীরা সেই টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ ক'রে টাকার মালিককে চিঠি দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং দেশ-স্বাধীন-ব্রত সফল হ'লে সেই টাকা সুদসমেত পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে ১৯১৬ সালের ২৬শে জুন গোপীনাথ রায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

লেনে। ডাকাতির পর ঐ বাড়ির মালিক বাংলায় লেখা একটি চিঠি পান।
চিঠিটা নিম্নরূপ :

“নং ২০৫০

বন্দে মা গবম

স্বাধীন যুক্ত প্রান্তরাজ্য বাংলা শাখা।

সম্মানে বিনীত নিবেদন,

মহাশয়গণ, আমাদের চ’জন স্বয়ংস্বক কর্মচাষী আপনাদের কাছ থেকে ২৮৯১ টাকা
কড় নিয়ে আসেন এবং ঐ অর্থ উপবাক্ত আদিনে দয়া দেখা হয়েছে আপনাদের নামে।
শতকরা ৫ টাকা হিসাবে বাৎসরিক সুদ দেখা হবে। প্রথমেই আমবা কৃতকার্য হ’লে
(দেশ-স্বাধীন হতে) আপনাদের সুদ সমে ৫ সমস্ত স্বর্ণ পরিশোধ করা হবে।

(স্বাক্ষর) বনমণ্ড

Finance Secretary to the Bengal Branch of
Independent Kingdom of United India”

এবারে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার কথা আসা যাক। বিশ্বযুদ্ধ
চলেছিল ১৯১৪ সালে ইংবেজ ও জার্মানির মধ্যে। জার্মানদের নিকট থেকে
অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরেজকে এদেশে আঘাত হেনে স্বাধীনতার
রাস্তা প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। জার্মানির সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার শর্ত ছিল
যে, বিপ্লবীরা জাতীয় ঋণ হিসাবে জার্মানির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন।
এবং বিপ্লব সফল হ’লে, স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট সেই অর্থ পরিশোধ করবেন।
জার্মানি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং তাঁদের বিদেশীয় রাষ্ট্রদূতগণ
বিপ্লবীদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন। জার্মান সামরিক অফিসারগণ
শ্রামদেশে এসে ভারতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষা
সমাপ্ত হ’লে তাঁরা বর্মার ভিতর দিয়ে ভারতে অভিযান করবেন। কিন্তু কোনো
জার্মান সৈন্য ভারতভূমিতে পদার্পণ করবেন না। বিদেশের সঙ্গে এইসমস্ত
ব্যবস্থা এবং আয়োজনের ভার ছিল যাদুগোপাল মুখার্জীর উপর।

ব্যবস্থা হয়েছিল যে, ‘অ্যানি লার্সেন’ নামে একথানা জাহাজ ত্রিশহাজার
রাইফেল, সেই অল্পপাতে গুলী এবং অর্থ নিয়ে আমেরিকা থেকে স্কেডো দ্বীপে
যাবে। এবং সেখানে গিয়ে ‘মাভেরিক’ নামে এক জাহাজে ওগুলি তুলে
দেবে। ‘মাভেরিক’ জাহাজ ঘুরে ব্যাটাভিয়াতে যাবে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র
ভারতবর্ষে আসবে।

বিপ্লবের আয়োজনে উত্তর ভারতবর্ষের সৈনিক-বিদ্রোহ ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার নেতৃত্ব ছিল রাসবিহারী বসুর উপর। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিরাট বিপ্লবের ও কলিকাতার ফোর্ট দখল করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। নেতৃত্ব গ্রস্ত ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর উপর। বাংলার কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবীরা নির্ভর করেছিলেন প্রধানতঃ জার্মানির অস্ত্রশস্ত্রের উপর।

বিদেশীদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'মাভেরিক' আব অস্ত্র নিয়ে পৌঁছাতে পারল না। ঘটনাটা পবিস্কার ক'রে বলি। ভারতীয় বিপ্লবীরা যেমন জার্মানির সাহায্যে ইংবেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তেমনি চেকোস্লোভাকিয়াও আমেরিকায় গিয়েছিলেন ইংবেজ এবং ফরাসী সাহায্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন। এমনিভাবে পৃথিবীর বহু দেশে বহু বিপ্লবী তখন গেছেন আমেরিকাতে আপন আপন দেশ স্বাধীন করার প্রচেষ্টায়। আমেরিকাতে ভারতীয় এবং চেকোস্লোভাকীয় বিপ্লবীদের আদর্শ এক ছিল ব'লে তাঁরা একে অগেব কাষাবলী জানতেন। চেকোস্লোভাকরা ইংরেজ এবং ফরাসীকে খুশী করতেন গিয়ে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর ফরাসীদের জানিয়ে দেন। ফরাসীরা ইংবেজকে জানান। এইভাবে চেকোস্লোভাকদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সমস্ত খবর ইংরেজ জেনে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গেই 'অ্যানি লার্নেন'-এর সকল অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকাতেই ধরা প'ড়ে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যায়। অগ্নিদিকে ভাবতে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলির উপর ইংরেজ নির্মমভাবে আঘাত হানতে শুরু করে। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে নিহত হলেন ১৯১৫ সালের ২ই সেপ্টেম্বর। দেশময় ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অত্যাচার আরম্ভ হ'ল। ওই খণ্ডযুদ্ধের মামলায় সময় বিহার-উডিন্গার পুলিশের ডি.আই.জি. রাইল্যাণ্ড যতীন মুখার্জীর লেখা একখানি খাতা দেখে বলেছিলেন—“এই মামলাটি বেঁচে থাকলে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় হ'তে পারতেন।”

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মৃত্যুর পরেও দেশে বিপ্লব আনবার একটা বিপুল চেষ্টা চলেছিল। তার নেতৃত্ব ছিল যাজুগোপাল মুখার্জীর উপর। সেই যুগের সেই ভয়ঙ্কর কঠিন প্রয়াস বাইরে থেকে দেখতে ব্যর্থ মনে হ'লেও, বারে বারে ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জাতি এগিয়ে চলেছিল। মহা গৌরবময় ছিল সে ব্যর্থতা। কত যে বীরের ফাঁসী, যাবজ্জীবন জীপাস্ত্র, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হাসিমুখে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া—তার অস্ত ছিল না। প্রভাব ছিল এর বহুদূরব্যাপী। যতীন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মুখার্জী বলতেন, “আমরা মবব, জাতি জাগবে।” দেশ অসীম শ্রদ্ধায় বিপ্লবীদের এই সাধনাকে নির্বাক সমর্থন জানিয়েছিল।

বাংলার মেয়েরা তখনো সামনে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করেননি। নেপথ্যে থেকে ভাইদের, স্বামী-পুত্রদের দুঃসাহসিক যাত্রার অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে দুই-একজন দুঃসাহসিক নারী বিদেশী শাসকদের রক্তচক্ষুকে নিঃশব্দচিহ্নে উপেক্ষা করে প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দিয়েছিলেন। হাসিমুখেই সকল দুঃখ নিযাতন বরণ করে নিয়ে তাঁরা ভবিষ্যতের মেয়েদের জন্য পথের নিশানা তৈরী করে গেছেন। এমনি নারী ছিলেন ননীবালা দেবী ও ঢুকডিবালা দেবী। ননীবালা দেবী ছিলেন বাংলার একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ননীবালা দেবীর যুগ এবং মাতঙ্গিনী হাজারার যুগ এক নয়। ননীবালা দেবীর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই সময় যখন সমাজের লৌহশৃঙ্খল ছিল কঠিনভাবে বাঁধা নারীর হাতে ও পায়ে। তাকে নিজ শক্তিতে ভেঙে নিজের অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন তিনি দুদম তেজে। এই যাত্রা উদ্‌যাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে গিয়ে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে মাতঙ্গিনী দেবীর চরম আত্মদানের মধ্য দিয়ে। ভারতের নরনারী উভয়েই তখন জাগ্রত, উদ্বেলিত। এঁদের একজন এই দীর্ঘ ও ভয়ংকর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রারম্ভের ও আরেকজন পরিণতির প্রতীক।

অগ্নিবুগের এই অধ্যায়ের পর ১৯২১ সালে দেখা দেয় অসহযোগ আন্দোলন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর যোগসূত্র ক্রমেই দৃঢ় হ’তে থাকে। ১৮৮৫ সালে ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৯ সালের বোম্বাই অধিবেশনে সর্বপ্রথম ভারতীয় নারী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে যান ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও মহিষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থী কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৯০ সালের কলিকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিত্বে একটি বক্তৃতা দিয়ে ধর্মবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিষীদের মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। বহুদিন তিনি ‘ভারতী’ এবং ‘ভারতী ও বালক’ কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন। এই কাগজের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর ‘সখি সমিতি’র সহায়তায় তিনি দেশান্ত্রবোধের প্রেরণা দিতেন।

অনেক ভাঙাগড়ার পর মহাত্মা গান্ধী এসে কংগ্রেসে যোগদান করলেন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

১৯১৯ সালে। তারপর ১৯২০ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হয়ে তাকে পুনর্গঠন করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। তাঁর আন্দোলনে গোপনতার স্থান ছিল না; আবার চরম আত্মত্যাগেরও তেমন প্রয়োজন ছিল না প্রথম দিকে। এই সরল পথের সন্ধান পেয়ে দলে দলে বহু লোকই দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ কবতে পেরেছিলেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মূল কথা ছিল সরকারের সঙ্গে সর্বকম অসহযোগিতা করা, বিলিতি জিনিস বর্জন করা, এবং খদর ও অন্ত্র স্বদেশী জিনিসের মধ্য দিয়ে নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। অতীত ছিল অহিংসনীতিকে আশ্রয় করে ইংরেজের হৃদয়-পরিবর্তন দ্বারা স্বরাজ অর্জন করা। গান্ধীজীর নীতি ছিল অহিংসা ও প্রেম দিয়ে শত্রুর হৃদয় জয় কববেন। তিনি মনে কবতেন যে, মানুষের চরিত্রে আছে অন্তর্নিহিত সাধুতা ও সংনৃতি, তাকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই আন্দোলন আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সহজ। ধর্ম ও করণা, প্রেম ও অহিংসা আমাদের দেশের লোককে সহজে নাড়া দেয়, সাড়া জাগায়। তাই গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনে ধাপে ধাপে ক্রমশঃই বেশী গণ-সংযোগ করতে পেরেছিলেন।

বিপ্লবীরা দেখলেন যে, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধ-শক্তি জাগবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য অবিকাংশ বিপ্লবী দলই ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন অপরপক্ষে ভারতীয় নারী-জাগৃতিও ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর করেছিলেন নারীর শুল্কমোচনের স্বচনা। গান্ধীজীর দীক্ষায় নারী এবার জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করলেন।

১৯২১ সালের এই অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর আহ্বানে যে-সমস্ত নারী প্রথম অগ্রণী হয়ে দেশসেবার কাজে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসে কারাবরণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী উর্মিলা দেবী প্রভৃতি। নারীদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। শুধু তাই

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

নয়, কাতারে কাতারে ছেলেরা অর্থাৎ তরুণ কর্মীর দল অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেলখানা ভরে ফেললেন।

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন। গান্ধীজী ও কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কট করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই কারণে যে, এর মধ্যে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না। আবিস্ত হয় ‘সাইমন ফিরে যাও’ আন্দোলন। মেয়েদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভ জেগে ওঠে।

১৯২৮ সালেই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন। অরবিন্দের দাদা—কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ এবং অরুণ সেন প্রভৃতি এগিয়ে এসে মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজ করতে থাকেন।

লতিকা ঘোষ যে কেবল সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজের হরতালে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, সংগঠনের একটা বিরাট দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে-বছরের কংগ্রেসে নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত। তাঁর অধীনে বহু ছাত্রী ও নারী এসে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগদান করেন। একটা অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয় মেয়েদের মধ্যে। সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর অধীনে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সমান পদক্ষেপে সেদিন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস মণ্ডপ পর্যন্ত মার্চ করে চলেছিল। প্রকাশ্যে রাস্তায় এসে জনসাধারণের সামনে দিয়ে এমনভাবে মার্চ করে চলে যাওয়া তখনকার দিনে ছিল নারীর পক্ষে একটা অসীম দুঃসাহসের কাজ। নারী-জাগরণের ফলস্বরূপ এবার আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধা নিয়ে বাইরে এসে সর্বসমক্ষে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যদিও গতি তার তখনো ততো দ্রুত নয়। মেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসতে লাগলেন জনসেবার কাজে। তারা ঘরের কাজও করতেন, অনেকে লেখাপড়াও শিখতেন, আবার ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতেন। কংগ্রেসের ঐ স্বেচ্ছাসেবিকা দল নিজেদের পশ্চাতে দলে দলে কর্মী মেয়েদের তেমনি করে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে এল, ঠিক যেমন করে ভগীরথ একদিন আহ্বান করে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন গন্ধাকে সমগ্র দেশ প্রাণিত করে দিয়ে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 'ছাত্রীসংঘ' প্রতিষ্ঠা ক'রে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলার প্রয়াস পান। ঢাকাতে লীলা নাগ তার আগে থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন-কাজের মধ্য দিয়ে মেয়েদের সচেতন ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অত্যাচার জেলাতেও তখন একপ নারী-সংগঠনের কাজ কিছু কিছু শুরু হয়েছিল।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাতে বাংলার বিপ্লবীরা খুবই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হন। তারা প্রবল বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। অত্যাচার প্রদেশের প্রতিনিধিদের তাঁরা প্রস্থর সমর্থন লাভ কর'বেন এই সম্ভাবনা প্রকাশ্যে অধিবেশনে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, আগামী একবছরে যদি আমরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পাই, তবে একবছর পরে পূ' স্বাধীনতাই হবে কংগ্রেসের আদর্শ। এবং পূ' স্বাধীনতা আনবার জন্য আবশ্য করা হবে আইন অমান্য আন্দোলন।

সেই অনুসারে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূ' স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং পূ' স্বাধীনতা অর্জন কববার উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করবার সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয় গান্ধীজীর উপর।

এখানে এসে আবাব বিপ্লবীদের প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁরা মনে করলেন পূ' স্বাধীনতার প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীদের একভাগ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। আরেক ভাগ সশস্ত্র বিপ্লবের সংগঠনে নিযুক্ত রইলেন।

১৯৩০ সালে আরম্ভ হয় লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। স্বয়ং গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান করেন। মেয়েদের মধ্যে কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি', ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' প্রভৃতি সংগঠিত হয়। মেয়েরা বাঁধ-ভাঙা স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং আইন অমান্য ক'রে দলে দলে কারারুদ্ধ হলেন।

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয় এবং গান্ধীজী লওনে রাউণ্ড টেব'ল কনফারেন্সে বোগদান করতে যান।

রাউণ্ড টেব'ল কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। তাঁকে ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয়। আবার আইন অমান্ত আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৩২ সালে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান বহু মহিলাকে দলে দলে আইন অমান্ত করতে এগিয়ে দেয়। কাতারে কাতারে মহিলা-কর্মী মহা উৎসাহে কারাবরণ করেন। বস্ত্রার বেগে গিয়ে তাঁরা জেলখানা ভর্তি ক'রে ফেললেন। দেশবাসী বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে এই দৃশ্য দেখলেন।

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের অহিংস আন্দোলনে যেমন সত্যাগ্রহী নারীরা বহুসংখ্যায় যোগদান করেছিলেন, তেমনি অনেক বিপ্লবী মেয়েরাও ১৯৩০ সাল থেকে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালেব এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার পর বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘটিত হয় সম্মুখ-সংগ্রাম জালালাবাদ পাহাড়ে। সমস্ত চট্টগ্রাম তখন বিপ্লবীদের একটা বিরাট ঘাঁটি। ১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট কলিকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্ট-এর উপর বোমা পড়ে। বিপ্লবী মেয়েদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হয়। একে একে ঢাকা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মূল ঘাঁটির উপর বিপ্লবী আক্রমণ ও সংগ্রাম শুরু হয়। মেয়েরা অসীম সাহসে দুর্ধর্ষ স্পর্ধা নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। কুমিল্লায় কিশোরী দুটি মেয়ে—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসকে গুলী ক'রে নিহত করেন। কলিকাতায় বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলী করেন। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইংরেজদের ক্লাব আক্রান্ত হয়। প্রীতিলতা আব্বুলদান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

, অধিকাংশ মেয়েরাই নিজেদের প্রেরণায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা, মা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি অনেকেই পেতেন না; বিপ্লবী কাজে অনুমতি পাওয়া তো প্রায় অসম্ভবই ছিল। অভিভাবকদের অনেকেরই ভয় ছিল সমাজের নিন্দার, ভয় ছিল কলার বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরী যাবার, ভয় ছিল কলার উপর রাজবোম্বের। এই ভয়ের সীমা পরিসীমা ছিল না।

অসহযোগ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানকারী মহিলাগণ কিন্তু চতুর্দিকের ঐ আতঙ্ক ও শঙ্কা-সমূহ পাড়ি দিয়ে চলেছিলেন। সাড়া না দিয়ে

তঁারা থাকতেই পারলেন না। সর্ববাধা ঠেলে তঁারা বেরিয়ে এসেছিলেন। এক অসাধারণ শক্তি ও সাহস যেন তাঁদের পেয়ে বসেছিল।

১৯৩৮ সালে সমস্ত বন্দী মুক্তি পাবার পর সহিংস বিপ্লবীরা অনেকেই মনে করলেন যে, তাঁদের আর তখন গুপ্ত আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। তাঁরা অনেকেই ১৯৩৮ সালে তাঁদের গুপ্ত সমিতি ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে এসে যোগ দিলেন। তাঁরা মনে করলেন, এমন একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আসছে যাতে কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে। সেসময় কংগ্রেস ও বিপ্লবী এই দুটো কেন্দ্র থেকে দুই রকমের আদেশ আসা সমীচীন নয়। সেইজন্য যুগান্তর দল স্বৈচ্ছায় আত্মবিলোপ বরণ করলেন ডাঃ বাভুগোপাল মুখার্জীর নামে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে।

ওদিকে কৃষক ও শ্রমিকদের সচেতন ক'রে তোলাব প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হয়। মেঘেদের দিক থেকে সন্তোষকুমারী গুপ্তা সবপ্রথম শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেন ১৯২৩ সালে। তিনি তাঁদের কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তারপর শ্রমিক-আন্দোলনে নেতৃত্ব কবেন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত মেথর-ধর্মঘট পরিচালনা ক'রে তাঁদের সজাগ করেছিলেন। আবো পরে বীণা দাস, সুধা রায়, মৈত্রেয়ী বসু প্রভৃতি এদিকে অগসর হন।

১৯৪২ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে এসে সহিংস ও অহিংস বিপ্লবীরা মিলেছিলেন এক স্রোতোধারায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে যোগ দিয়েছিলেন কৃষকশ্রেণী, নেমে এসেছিলেন ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ নরনারী। শ্রমিকদেরও একটা অংশ এসে যোগ দিয়েছিল। সকলেরই লক্ষ্য, ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। সমগ্র দেশ সেদিন বিদ্রোহী।

১৯৪২ সালের ৮ই অগাস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ঘোষণা করে। গান্ধীজী বললেন—“করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে”। ৯ই অগাস্ট প্রভুবেই গভর্নমেন্ট গ্রেপ্তার করে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের। আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য নেতারা কেউ বাইরে রইলেন না। গণ-নেতৃত্ব দেখা দিল। গান্ধীজীও তাই চেয়েছিলেন। এই শেষ সংগ্রামে অতীতের সমস্ত আন্দোলনের ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এটা ছিল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার শেষ সংগ্রাম। থানা থেকে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

আরম্ভ ক'রে ব্রিটিশ শক্তির উচ্চতম ঘাঁটিগুলি পর্যন্ত দখল ক'রে নেবার চরম প্রচেষ্টা। জাতির চিত্তে ছিল সেদিন স্বাধীনতা-অর্জনের জুঁজু সংকল্প এবং তা সফল করবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্ষেপে ওঠে। তারা কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে দংবাদপত্রেরও গলা টিপে ধরে। সভা-সমিতি হয় নিষিদ্ধ। জনতার উপর বর্ষিত হয় নির্গম লাঠির আঘাত। মিলিটারী করতে থাকে গুলী-বৃষ্টি। হাওয়াই-জাহাজ থেকে এবং মেশিনগান থেকে তার। গুলীর ঝড় বইয়ে দেয়। শক্তির দস্তে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চরম নিষীতনের অভিযান শুরু করে সমগ্র দেশব্যাপী।

আমাদেব জাতীয় সংগ্রামের সৈনিকেরা দলে দলে রেল-লাইন নষ্ট ক'রে দিলেন, স্টেশন পোস্টাফিস জ্বালিয়ে দিলেন, সরকারী শস্ত্রের ঘাঁটি লুণ্ঠ করলেন, টেলিগ্রাফ ও ট্রামের তার কেটে দিলেন, যুদ্ধের রসদবাহী বথ যানবাহন ধ্বংস করলেন। কৃষকেরা কত জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দিলেন। আমেদাবাদের মিল বন্ধ হয়ে গেল। টাটা ইস্পাতের কারখানায় কুড়িহাজার শ্রমিকসহ কর্মীরা ধর্মঘট করলেন। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বন্ধ করবার জ্ঞাত পিকেটিং করলেন। এবারে চলেছে ক্ষমতা দখল করবার শেষ সংগ্রাম।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বালিয়া, সাতারা ও মেদিনীপুর দেখিয়েছে ত্যাগ ও শক্তির পরাকাষ্ঠা। সেখানে চলেছিল পাশাপাশি স্বাধীন গভর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠার লড়াই। মেদিনীপুর জাতীয় সরকার স্থাপন ক'রে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল দুই বছর অবধি। মেদিনীপুরের মেধেদের আত্মত্যাগের কাহিনী লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে। তারা সেদিন স্বামীপুত্রদের আঁচলে টেকে রাখতে চাননি। তাদের সঙ্গেই নেমে পড়েছেন মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। তারা অস্ত্র ধরেছেন পুত্র হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। শত শত নারী অকম্পিত পদে এগিয়ে গিয়েছেন পুলিশের গুলীর সামনে। তাঁরা ধান দখল করতে গেছেন, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছেলেরা ঘরে না থাকলে গ্রাম পাহারা দিয়েছেন। ১৯৪২ সালের অগাস্ট থেকে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দুই বছর ধরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে যে অত্যাচার তাঁরা সহ করেছেন তার আদি অন্ত নেই, বুঝি সব কথা আজও প্রকাশ পায়নি।

ননীবালা দেবী ও ছুকাড়িবালা দেবীকে দিয়ে ১৯১৪ সালে প্রত্যক্ষভাবে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এদেশে নাবী শুরু কবেছিলেন তাব প্রথম পর্যায় সান্ন হ'ল বাহাদুর-বর্ষাখা মাতঙ্গিনী দেবীর পুত্র দেহাস্থি দিয়ে ১২৪২ সালে। থানা দখল কবতে গিয়ে এই মহীয়সী শহীদেব বন্ধে ধন্য হ'ল ভাবতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

ওদিকে ১২৪৭ সালে ভাবতের পূর্বসীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে এসে নেতাজী স্বভাষচন্দ্র উড়িয়েছিলেন বিজয়পতাকা কোহিমা-ডিমাপুরে। নেতাজী গড়ে তুলেছিলেন 'বাঁসীব বানী বাহিনী' নামে নাবী-বাহিনী। লক্ষ্মী স্বামীনাথন তাব নেত্রী। ১২৪৫ সালে এই আজাদ হিন্দ বাহিনীব যে বিচার ইংবেজেব আদালতে শুরু হয়েছিল, তাতে সমস্ত ভাবতবর্ষে জেগেছিল অদ্ভুত উত্তেজনা ও শিক্ষোভ। ছাত্র বামেগর বন্দ্যোপাধ্যায় বুক পেতে গুলী নিয়ে শহীদ হয়ে আছেন। বোম্বাই ও কবাচীতে নৌবিদ্রোহ এবং এবোপ্লেন বাহিনীব ধর্ষণত দেগা দেয়।

ইংবেজ দেগতে পের ভাবতবর্ষের সাধাবর্গ নবনাবী, বিষাগ, মজুর, ছাত্র, সৈন্তবাহিনী এবং নৌ সেনা সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছে ইংবেজেব বিরুদ্ধে, তাদেব বক্তৃচ্ছ ও দৃঢ়মুষ্টি আজ অশঙ্ক, নিঃশল। ওদিকে আন্তর্জাতিক পবিস্থিতিও ইংবেজেব প্রতিবল। স্মতবাং ভাবতবর্ষে তাবা জয়ের আশা পবিত্যাগ কবল।

উডল ভাবতবর্ষে স্বাধীনতাব বিজয়পতাকা ১২৪৭ সালেব ১৫ই অগাস্ট।

ভাবতবর্ষে বিংশ শতাব্দীব স্বাধীনতা-সংগ্রামে নাবী নিজেকে এমে বিকশিত ক'বে আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। তবজ্জিব পব তবধ ছুটে এসেছে তাদেব পশ্চাতে। তাব প্রবল চাপে আলোড়িত আন্দোলিত সমাজ সশ্রদ্ধ-ভাবে গ্রহণ কবল নাবীব প্রস্তুটিও অন্তর্শক্তিকে। গোঁববে মহীয়ান হয়ে আছে ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবীব অবদান।

সরলা দেবী চৌধুরানী



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭২ সালের ২ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ও পিতা জানকীনাথ ঘোষালের কনিষ্ঠা কন্যা তিনি।

পিতা জানকীনাথ ছিলেন নদীয়ার জয়রামপুরের বিখ্যাত ঘোষাল-বংশের সন্তান। অসাধারণ বলবীর্ষের জ্ঞাত এই ঘোষাল-বংশ বিখ্যাত ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জানকীনাথকে এক সুপুরুষ বীর্ষবান সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে, তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ দেন ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে ১৮৬৭ সালে। কিন্তু বিবাহকালে জানকীনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের দুটি আচরিত রীতি গ্রহণ করেন নাই—প্রথমটি, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ; দ্বিতীয়টি, ঘরজামাই থাকা।

জানকীনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কার্ষক্ষেত্র ছিল 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কংগ্রেস'। কংগ্রেসের জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে তার শৈশবের অনেকগুলি বৎসরই কেটে গেছে জানকীনাথের কর্মদক্ষ সেবায়। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্ত যখন বিলাত যান তখন তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ঠাকুর-বাড়ীতে রেখে যাত্রা করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

স্বর্ণকুমারী দেবী তখনকার যুগেও সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় বিদুষী ছিলেন। তিনি 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন ১২৯১—১৩০১ বঙ্গাব্দ এবং ১৩১৫—১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। উপাভাষ, কবিতা, গল্প, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। স্বামীব সঙ্গে তিনিও একসময় খি়সফিতে বিশ্বাসী হন। বাংলাদেশের খি়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা-শাখার সভানেত্রী ছিলেন তিনি। এই সোসাইটির মহিলা-শাখা যখন উঠে যায় তখন ঐসব মহিলা-সভ্যদের নিয়ে তিনি 'সখি সমিতি' সংগঠন করেন ১৮৮৬ সালে। 'সখি সমিতি' মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে এবং স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দিত, বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ ক'বে মেলাব অনুষ্ঠান কব'ত।

জানকীনাথ ছিলেন কংগ্রেসসেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীও কংগ্রেসেব রাজনৈতিক চর্চায় আগ্রহনিয়োগ কবেছিলেন।

১৮৮৯ সালে কংগ্রেসেব বোম্বাই অধিবেশনে প্রথম নারী প্রতিনিধিরূপে এবং ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বিনা গাঙ্গুলী যোগদান করেন।

এমন মনসী ও দেশপ্রেমিক পিতামাতাব সন্তান ছিলেন সবলা দেবী। শিশুবয়স থেকেই তাঁব অন্তরেব মধ্যে সহজাত স্বাবলম্বনেব একটা দৃঢ়তা ছিল। ছয়বছরের বালিকা সরলা দেবী যখন পিতার পিলাত-বাস-কালে মাতুলালয়ে ছিলেন তখন একদিন তাঁর এক সমবয়সী মেয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, পাপ করলে তাঁকে একেবারে একা বেঁচে থাকতে হবে—এই হবে শাস্তি। ছয়-বছরের সরলা দেবী সেদিন ছাতে উঠে দিগন্তবেথার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে লাগলেন যেন কোথাও কেউ নেই—আকাশে পাখী নেই, বাড়িতে লোক নেই, মামা-মামী দাদা-দিদিরা নেই, দাস-দাসীরা নেই, অন্ধকার ঘরেও কেউ লুকিয়ে বেঁচে নেই, ইঁদুর-পিঁপড়েও নেই—ব্রহ্মাও একেবারে শূন্য, শুধু তিনি একা আছেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই শিশুমন সেদিন নিঃসঙ্গ বোধ করেনি। আকাশের আলো যেন তার সঙ্গী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও যেন কোথাও আছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগালেই তাঁকে পাওয়া যাবে। শুধু একটি বালিকার সত্তা এবং ঈশ্বরের সত্তা সেদিন ব্রহ্মাণ্ডে আছে, আর কিছুই নেই। স্রষ্টার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মবোধের অতুভূতি একমুহূর্তের জন্য তাঁর মনে উদয় হ'ল। নিঃসঙ্গতার ভয় তাঁর চেতনার দিগন্তরেখায় বিলীন হয়ে গেল—হাসিমুখখানি,

নির্ভীক সতেজ হয়ে উঠল। তিনি নিজেই লিখেছেন—“সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধহয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।”

এই সহজাত স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতা সমস্ত জীবন তাকে পবিচালিত কবেছে।

যেসময়ে আমাদের সমাজের মেয়েবা লেখাপড়া শিখতেন না, বাড়ীতে পঢ়াব আড়ালে গুরু ঘবকন্না কবেছেন—সমাজের সেই অন্ধকারের মধ্যে ১৮৮৬ সালে তেবোবছর বয়সে সরলা দেবী এনট্রান্স পাস ও ১৮৯০ সালে সতেবোবছর বয়সে ইংবাজিতে অনার্স সহ বিএ পাস কবেন।

এনট্রান্স পরীক্ষার সময় ইতিহাসের প্রশ্নের মধ্যে মেকলে লিখিত ‘লর্ড ক্লাইভ’ নামক পাঠ্যগুস্তকো উপর ভিত্তি ক’বে ক্লাইভ এর বহুবিক্রয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল। সরলা দেবী মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালী চবিত্ত্বের হেয়তাব প্রতিবাদ ক’বে নিজেব বিপবীত মন্তব্যপূ। উত্তর এমন যুক্তি, তেজ ও আস্তবিকতার সঙ্গে সামনে তুলে পবেছিলেন যে, পরীক্ষক এন ঘোষ এই ছাত্রীকে সর্বাধিক নম্বব দিযেছিলেন এবং খোঁজ কবেছিলেন এই মেবেটি কে? ইতিহাসের পরীক্ষায় সরলা দেবী ই সেবাব প্রথম হয়েছিলেন। এ বিবয়ে লিগতে গিয়ে ‘জীবনের ধবাপাতা’ নামক আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—“বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আমার আগ্রাভিমান তখনই মাথা খাড়া কবেছিল। এবই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে বহুব দশ বাবে পবে কিপলিং-এব একথানা ছোটগল্পেব বইয়ের একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অবমানিত পেযে তাব প্রতিবিধান-কল্পে আমি যে দেশ ও জাতি ব্যাপী প্রচেষ্টা আবস্ত কব’ুম তাতে।”

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তিনি বাঙালীজাতিব মধ্যে শবীষচর্চাব উৎসাহ দেবাব জন্ত, শৌর্ষে বৌর্ষে মেকদণ্ড সোজা ক’রে দাঁড করাবার জন্ত ব্যাযামচর্চাব ব্যবস্থা কবেছিলেন কুস্তিগীর পালোয়ানদের কাছে।

দেশাত্মবোধ জাগাবাব জন্ত মাবাঠীদের ‘শিবাজী উৎসব’-এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলিকাতায় ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ অনুষ্ঠিত কবেন। তাঁব ‘বীরাষ্ট্রমী ব্রত’ব (১৯০৪) উদ্দেশ্য ছিল বাংলার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে জাগ্রত করা।

‘ভারতী’তে লিখলেন তিনি ‘বিলিভী ঘুমি বনায় দেশী কিং’। তিনি লিখেছেন—“ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম, রেলে, স্ট্রীমারে, পথে বাটে যেখানে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে জী, ভগ্নী, কণ্ঠ বা নিজের অপমানে মুহমান হ'বে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত 'ভারতী'তে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকানো আগুন ধুকিয়ে ধুকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে।" দলে দলে ছাত্র এবং বয়স্করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলেন। "আমি তাদের থেকে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ কবাতুম তহু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি বাগি নৈধে দিতুম তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা ব্যাজ। ... সেটি ছিল মাতৃভূমির জ্ঞাত বিপদ বরণের স্বীকৃতি। ... বছর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল স্মৃতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল।"

১৯০২ সালের শেষের দিকে বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) এলেন সরলা দেবীর কাছে বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। "আমি তাকে (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে) সবতোভাবে সাহায্য করতে লাগলুম। সেও আমার খুব অল্পগত হ'ল। বারীন ঘোষের নেতৃত্বে ... ভারত উদ্ধার দল স্থাপিত হ'ল। যতীন বাঁজুঘোষ তার একজন প্রধান কর্মকর্তা—সেখানেই খায় দায় থাকে আর যারা দলে আসে তাদের কসরৎ ও ড্রিল করায় এবং ঘোড়ায় চড়া শেখায়। ... খালি আমার মতভেদ হ'ল যখন শুনলুম তাদের দল থেকে ডাকাতি চালানোর কিছুম বেরিয়েছে।"

মণিলাল গাঙ্গুলী একদিন তাঁর সাহিত্য-সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবে সরলা দেবীকে সভানেত্রী হ'তে আমন্ত্রণ জানালেন। সরলা দেবী একটি শর্ত দিলেন যে, সেই তারিখটি এলা বৈশাখে ফেলতে হবে এবং সেখানে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত করতে হবে। সভায় থাকবেনা কোনো বক্তৃতা। কেবল একটিমাত্র প্রবন্ধপাঠ হবে—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। খুঁজে বার করতে হবে বাঙালী ছেলে—কে আছে কুস্তিগীর, তলোয়ারধারী, বক্সিং ও লাঠি-বীর। সেই উৎসবে হবে তাঁদেরি খেলার প্রদর্শনী।

এই 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' যখন অনুষ্ঠিত হয় সেদিন বাংলাদেশের মর্মদেশে গিয়ে তাকে তা প্রবলভাবে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। বিপিন পাল তাঁর

Young Indra-তে লিখলেন—“As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal !”

সরলা দেবী প্রকাশ কবতে আরম্ভ করলেন ‘বদ্বৈব বীব’ সিরিজের ছোট ছোট পুস্তক। তারপর আয়োজন করেন তিনি প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসব। স্টেজের উপরে একখানি তববারি রেখে সভাসীনেরা বীব উদয়াদিত্যকে স্মরণ ক’রে তাতে দেবে পুষ্পাঞ্জলি। যুবমনে উৎসাহের একটা প্রবল জোয়াব এসে ধাক্কা দিল। কাগজে লিখল, “সরলা দেবীর সঙ্গে আমবা দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ছি। বোজ ভোরে উঠে মনে হয়—‘অতঃ কিম্’?”

সেসময় যে-সমস্ত জাপানীরা স্ববেন্দনাথ ঠাকুরদের বাড়ীতে এসে থাকতেন তাঁরা নিজেদের দেশ থেকে বয়ে সব-কিছু জিনিস নিয়ে এসেছিলেন, এমনকি চিঠি-লেখার কাগজ পর্যন্ত। সরলা দেবী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত কাগজ সঙ্গে এনেছেন কেন? তাঁরা বললেন, তাঁরা জানেন যে, ভারতবর্ষে কিছুই পাওয়া যায় না, কাগজও নয়, তাই চিঠি-লেখা বন্ধ না হবার জন্য তাঁদের বাড়ীর মেয়েবা কাগজ ঠেসে দিয়ে দিয়েছেন। সরলা দেবী ভাবতে লাগলেন, জাপান জানে পরাধীন অসভ্য ভাবতবর্ষ,—ভারতবর্ষের লোক কিছুই করতে জানে না, করতে পারে না। গোবিন্দচন্দ্র বাঘের গান সরলা দেবীর মন তোলাপাড় ক’রে তুলল—

“নিজবাসভূমে পরবাসী হলে
পবদাসথতে সমুদায় দিলে।
পরহাতে দিয়ে, ধনরত্ন স্থখে,
বহ লৌহবিনিমিত হার বৃকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে,
পরপণ্যে ভরা তহু আপন রে।
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলো,
তবু ঠাই নাহি মিলে দাস ব’লে।
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
অশনে-বসনে গমনের তরে।
পর দীপ-মালা নগরে নগরে—
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।”

তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তারপর থেকে ‘ভারতী’র মলাট

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

দিলেন দেশী হলদে-বঙের তুলট-কাগজে, ভিতবেব কাগজ বদলানো গেল না, তাহলে ‘ভাবতী’ই বন্ধ করতে হ’ত।

‘লক্ষ্মীব ভাণ্ডার’ খুলেছিলেন তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার প্রচার করবার জন্ত। এটি বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ কবা, শুধু মেয়েদেব জন্ত, একটি স্বদেশী বস্ত্র ও জিনিসেব দোকান। সবলা দেবী এবং যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি ক’বে বোঁবাজাবে ‘স্বদেশী স্টোর্স’ নামে আবেকটি স্বদেশী জিনিসেব দোকান খোলেন যোগেশবাবুব পবিচালনার। সবলা দেবী লিখেছেন—“আমাব ও যোগেশবাবুব স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব বং পূর্বেই।”

কোনো উৎসবে যেতে হ’লে সরলা দেবীব আপাদমস্তক স্বদেশী বেশভূষায় সজ্জিত থাকত। লাবণ্যময়ী লাবণ্য শতধাবায় ঝরে পডত,—সহস্র ছটায় বিচ্ছবিত হ’ত।

১৯০১ সালে দীনশা এডুলচী ওয়াচা সভাপতি ছিলেন কলিকাতা কংগ্রেস-অধিবেশনেব। বিভূষিত-উজ্জ্বলনেব সেই অধিবেশনে কপে লাবণ্যে অপকূপ সরলা দেবী সমস্ত সত্তা মগ্ন ক’রে গাইলেন তাঁবই বচিত গান—

“অতীত গোঁববাহিনী মম বাণী।

গাও আজি হিন্দুস্থান।”

সেই গান বুঝি সেদিন সভাব প্রতিটি লোকেব মনে দেশের জন্ত মরণেব স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল। যুবশক্তি মবণমস্ত্রে দীক্ষা নিতে প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই যুগেব অগ্নিবাহিকা।

১৯০৫ সালেব ডিসেম্ব মাসে বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশন-মণ্ডপে হঠাৎ কংগ্রেস সভাপতি গোথলে সবলা দেবীকে ‘বন্দে মাতবম্’ গানটি গাইতে অহুবোধ করেন। সরলা দেবী ‘সপ্ত কোটি’-কে চট্ ক’বে ‘ত্রিংশ কোটি’ ক’রে দিয়ে তাঁর কণ্ঠের সকল মধু ঢেলে ধে-গান গেয়েছিলেন তাতে ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে সমাগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

‘বন্দে মাতবম্’ গানের প্রথম সুর সরলা দেবীরই দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের অহুরোধে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছ’লাইনেব সুর নিজে বসিয়েছিলেন।

পাঞ্জাবের পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯০৫ সালে। স্বামী ছিলেন আর্থসমাজ নেতা। স্বামীর কাজের সঙ্গে তাঁর কর্মশক্তি এসে যুক্ত হ’ল। বোম্বাই ও উত্তর-ভারতে তাঁর কর্মপ্রবাহ বয়ে চলেছিল।

সরলা দেবী চৌধুরানী

স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়াসে তিনি 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' স্থাপন করেন। তা'ব শাখা লাহোৰ, অমৃতসৰ, দিল্লী, কৰাচী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, বাকীপুর, হাজাবীবাগ, মেদিনীপুর, কলিকাতা এবং আৰো কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হয়।

১৯২৩ সালেৰ ৬ই অগাস্ট তা'ব স্বামী'ব মৃত্যু হয়। কিন্তু তা'ৰ কৰ্মপ্ৰচেষ্টা তাতে ব্যাহত হয়নি। ১৯২৫ সালে 'নিখিল ভাৰত সামাজিক মহাসমিতি'ৰ সভানেত্ৰীৰূপে দেশ তাকে পেয়েছে। বীৰভূম ও লক্ষ্ণৌ শহৰে বঙ্গ-সাহিত্য সন্মেলনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি পৌৰোহিত্য কৰতে।

'ভাবতী'ৰ সম্পাদিকা ছিলেন তিনি ১৩০২—১৩০৪, ১৩০৬—১৩১৪, ১৩৩১ থেকে আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পযন্ত। সম্পাদিকা না থেকেও, 'ভাবতী'ৰ সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বহুদিন। *বৎসৰে 'ঘোড়শী' 'ভাবতী'তেই প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়। তা ছাড়া কয়কজন ডাঙৰ মনীষীৰ ইংৰাজী বচনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিয়ে তিনি 'ভাবতী'ৰ গোঁবৰ বৃদ্ধি কৰেছিলেন—

(ক) ভগিনী নিবেদিতাব—'প্ৰত্যেক মা ছেলেৰ জন্ম কি কৰতে পাবে'
—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬, 'বঙ্গমাতা'ৰ কৰ্তব্য'—শ্রাবণ ১৩০৬

(খ) মহাদেব গোবিন্দ বানাডেব—

'পূৰ্বকালেৰ সমাজ শাসন'—শ্রাবণ ১৩০৭

(গ) মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধীৰ—

'দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভাৰতোপনিবেশ'—বৈশাখ ১৩০৯।

১৯৪৫ সালেৰ ১৮ই অগাস্ট সরলা দেবী'ৰ দেহাবসান হয়। তা'ৰ মতো মনীষী ও প্ৰতিভাকে পেয়ে দেশ গোঁববাহিত ও সমৃদ্ধ।



ননীবালা দেবী



ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে । দেশও সেখানেই । পিতার নাম স্বর্ধকান্ত ব্যানার্জী, মা গিরিবালা দেবী ।

এগাবোবছর বয়সে বিবাহের পর ষোলোবছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবাব কাছেই ফিরে আসেন ।

১৯১৪ সালে বেধেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । সেই সুযোগে ভারতে যুগান্তর-দলেব বিপ্লবীরা জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবে, স্বাধীনতা আনবাব রাস্তা পরিকার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন । ইংরেজ সেই ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর জেনে যায় । বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে আত্মদান ক'রে জাতিকে দেশের জন্ত মরতে শিখিয়ে গেলেন । তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল । তবুও ইংরেজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য ক'বে পূর্ব-ভারতের পথ ধ'রে চীন, শ্রাম ও আদামের ভিতর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্ত বিপ্লবীরা আবার চেষ্টা করেছিলেন যাহুগোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে ।

চারদিকে চলছে তখন আহত ব্রিটিশ-সিংহের প্রচণ্ড আক্রমণ ও নির্দয় অত্যাচার । সেই অত্যাচারের রূপ ছিল—ফাঁসী, বীপান্তর, পুলিশের নির্ধাঙ্কনে

পাগল-হয়ে-যাওয়া এবং দালাল-হাউসে নিয়ে গিয়ে চার্লস্ টেগার্টের তদারকহ বীভংস নিপীড়ন। মলদ্বারে রুল ঢোকানো, কমেড থেকে মলমূত্র এনে মাথায় ঢেলে দেওয়া, কয়েকদিন উপবাস করিয়ে পিছনে হাতকড়া-অবস্থায় বন্দীকে দাঁড করিয়ে বেখে লাথি ও রুলের প্রহার—এই ছিল টেগার্টের অত্যাচারের বীতি।

এইবকম বিপদসংকুল দিনে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী। সম্পর্কে তিনি ননীবালা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

পলাতক অমব চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দুই মাস আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিষডাতে। পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এখানেও।

ইতিপূর্বে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে, সেই সম্পর্কে পুলিশ কলকাতার ‘শ্রমজীবী সমবায়’ নামক প্রতিষ্ঠানে তল্লাসী কবতে যায় ১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে। তল্লাসীর সময় অমব চ্যাটার্জী পলাতক হন এবং বামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হয়ে তিন-নম্বব রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার হন। গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা ‘মসার’ (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি। তখন বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে, রামবাবু সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইন্টারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে যে-যুগ ছিল তখন বাঙালী বিধবার পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিয়ে পুলিশের স্টেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পুলিস তো নয়ই, কোনো সাধারণ মেয়েও নয়। আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ, আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান। সেদিনকার নারী তৈরী করে দিয়ে গেছেন আমাদের যুগের বিপ্লবী নারীকে—তিনি পথ দেখিয়েছেন, ভিত্তি গেঁথে গেছেন আমাদের জগৎ।

পুলিস ক্রমে জানতে পারল যে, ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। কিন্তু জানল না যে, ইনিই রিষডাতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে আবার বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। রিষডার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে, বাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত না। আবার এলেন ননীবালা দেবী গৃহকর্তার বেশে। এখানে এইসময়ে আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে বড়সিসিকেও এনেছিলেন ভোলানাথ চ্যাটার্জী। এই বড়সিসি ও ননীবালা দেবী দুটো আলাদা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন পলাতক বিপ্লবীদের। পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিপ্লবী নেতা বাহুগোপাল

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর, বিনযভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হলিয়া ছিল। এই নিশাচরেরা সারাদিন দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে কাটিয়ে দিতেন। শুধু রাতে স্ববিধামতো বেরিয়ে পড়তেন। নিষ্ঠুর শিকারীর মতো পুলিশ এসে পড়লেই এই পলাতকেরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, পুলিশ হয়রান হয়ে ফিরতো।

এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাশী ও বিপ্লবীদের নিমেষে পলায়নের পর ননীবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হ'ল না। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। 'তার বাবা স্মৃৎকান্ত ব্যানার্জীকে পুলিশ ইলিসিয়াম রো-তে নিয়ে গিয়ে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি বসিয়ে বেখে জেরা করত।

ননীবালা দেবী পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র কর্মোপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন পেশোয়াব। বাল্যবন্ধু তাঁর দাদাকে অনেক অহুন্নয় ক'রে রাজী করালেন ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। প্রায় ষোলো-সতেরো দিন পরে পুলিশ সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে— তখন ননীবালা দেবী 'কলেব' চলছে তিনদিন যাবৎ। প্রথমদিন বাড়ী ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তাঁকে পুলিশ-হাজতে (লক্-আপ্-এ) ফেঁচারে ক'রে। কয়েকদিন সেখানে রেখে চালান দিল তাঁকে কাশীর জেলে। তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছেন।

কাশীতে আসার কয়েকদিন পরে, প্রতিদিন তাঁকে জেল-গেটের আফিসে এনে কাশীর ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জী জেরা করত। ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন, বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই জানেন না। তারপর ছুটতে জিতেন ব্যানার্জীর তুমি-তুই-তুকারির অসভ্য ভাষা। ননীবালা দেবী নীরব।

একদিন দুইজন জমাদারনী (wardress) ননীবালা দেবীকে একটা আলাদা সেলে (cell) নিয়ে গেল। দুজনে মিলে তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর উলঙ্গ ক'রে থানিকটা লঙ্কাবাটা গুঁর শরীরের অভ্যন্তরে দিয়ে দিতে লাগল। ননীবালা দেবী চীৎকার ক'রে লাথি মারতে লাগলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। জমাদারনীরা বেশীক্ষণ ধন্বতধন্বিত করতে পারল না। থামিয়ে

দিয়ে নিয়ে এল আবার তাঁকে সেই জেল-গেটের আফিসে জিতেন ব্যানার্জীর কাছে ।

আবার জেরা :

—কি জান বল ।

—বলব না কিছু ।

ননীবালা দেবীর চোখে আগুন ছুটছে তখন ।

—আবো শাস্তি দেব ।

—যত খুশী দিন, আমি বলব না ।

—অমর চ্যাটার্জী কোঁথায় ?

—বলব না ।

—শাস্তি পাবে কিন্তু, মনে আছে তো ?

—যা খুশী করতে পাবেন, আমি কিছু বলব না ।

কাশীর জেল পুবােনো, সেকলে । সেখানে প্রাচীরেব বাইরে মাটির নীচে একটা ‘পানিশমেন্ট সেল’ অর্থাৎ শাস্তি-কুঠুরী ছিল । তাতে দরজা ছিল একটাই, কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবাব জন্ত অত্র কোনো জানালা বা ছিদ্র ছিল না । ব্যর্থকাম জিতেন ব্যানার্জী তিন দিন প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে ননীবালা দেবীকে ঐ আলোবাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবদ্ধ ক’রে আটকে রাখত । কবরের মতো সেলে আধঘণ্টা পরে দেখা যেতো ননীবালা দেবীর অর্ধমৃত অবস্থা, তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না । তৃতীয় দিনে বদ্ধ রাখল তাঁকে আধঘণ্টারও বেশী, প্রায় ৪৫ মিনিট । স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ ক’রে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা । সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননীবালা দেবী পড়ে আছেন মাটিতে, জ্ঞানশূন্য ।

হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ননীবালা দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে । সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ ক’রে দিলেন । জেল কর্তৃপক্ষ, এমনকি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁকে অল্পরোধ ক’রে খাওয়াতে পারলেন না । বলেন, বাইরে গেলে খাবেন । প্রতিদিন সকাল ৯টায় নিয়ে যেত তাঁকে গোয়েন্দা-আফিস ইলিসিয়াম রো-তে । সেখানে আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করতো ।

—আপনাকে এখানেই থাকতে হবে । কি করলে খাবেন ?

—যা চাইব তাই করবেন ?

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

—করব।

—আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহ'লে খাব।

—আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা দেবী তখন দরখাস্ত লিখে দিলেন।

গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে ফেল দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল। আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ননীবালা এক চড বসিয়ে দিলেন গোল্ডি'র মুখে। দ্বিতীয় চড মারবার আগেই অণু সি.আই.ডি. কর্মচারীরা তাঁর উত্ত হাতকে চেপে ধরে রাখল, পিসিমা, করেন কি? করেন কি? অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন ননীবালা দেবীর ভিতর থেকে।

—ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন? আমাদের দেশের মানুষের কোনো মান সম্মান থাকতে নেই?

রেখে দিল ননীবালা দেবীকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার ক'রে প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার।

জেলের মধ্যে একদিন সিউডির ছকড়িবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জানতে পেলেন, সিউডিতে তাঁদের বাড়ীতে সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল পাবার অপরাধে ছকড়িবালা দেবীর হয়েছে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। রেখেছে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ক'রে। ডাল ভাঙতে দিচ্ছে প্রতিদিন আধমণ।

মতলব স্থির ক'রে ফেললেন ননীবালা দেবী। উপবাসের ১৯২০ দিন চলছে তখন। আবার এলেন ম্যাজিস্ট্রেট অনুরোধ করতে।

—আপনাকে তো এখানেই থাকতে হবে। কি করলে খাবেন বলুন?

—আমার ইচ্ছামতো হবে?

—হ্যাঁ, হবে।

—তাহলে আমার রান্না করবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা চাই, দুজন গি চাই।

—ব্রাহ্মণ-কন্যা কেউ আছেন এখানে?

—আছেন, ছকড়িবালা দেবী।

—আচ্ছা, তাই হবে।

ননীবালা দেবী

এল সমস্ত নতুন বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি । ২১ দিনের দিন ভাত খেলেন
সেই অসামান্য দৃঢ়চেতা বন্দিনী ।

হুই বছর এইভাবে বন্দীজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি । ১৯১৯ সালের
এক প্রাতে এল ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ ।

বাইরে এসে তাঁর মাথা ঝুঁজবারও স্থান মিলল না । সকলেই পুলিশকে ভয়
পায় । বহুদিন ধ'রে চলেছিল অনেক ওলোট-পালোট ও ভাঙাগড়া । তারপর
একটা আলাদা আধাঘুপচি ঘর ভাড়া ক'রে নিজের জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে,
আত্মীয়স্বজনের অনাদর ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির
হ'য়ে কাটিয়ে চলেছেন তিনি বছরের পর বছর ।

মনে হয়, যে-মেথের আত্মদানে পরবর্তী কালে শ্রাবণবর্ষণের মতো ঝ'রে
পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা, এই মহীয়সী মহিলার। ছিলেন সেই
পরিণতিসম্ভবা মেঘ ।

দুকড়িবালা দেবী



১৮৮৭ সালে (বাংলা ১৩২৭, ৬ই শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম জেলায় নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মা কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই ফণীভূষণ চক্রবর্তী।

তঁাব বোনপোর নাম নিবাবণ ঘটক। তিনি ছিলেন ম'ইনিং ক্লাসের ছাত্র। মাসীমা দুকড়িবালা নিবাবণ ঘটককে খুব ম্লেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তাঁব বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশী বই, বে আইনী বই লুকিয়ে পড়বার আড্ডা ছিল মাসীমাব বাড়ী। দুকড়িবালা দেবীব কেমন সন্দেহ হ'ত। তিনি সকলেব অলক্ষ্যে বইগুলি দেখে নিয়ে বোনপোকে ধমক দিলেন। বোনপো আমলেই আনেন না। ক্রমে তাঁব বাড়ীতে একদিন মাস্টারমশাই নাম নিয়ে এলেন অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। সিংবসোল রাজস্টেটে রণেনবাবু নাম নিয়ে এলেন ফেবাবী বিপিন গাঙ্গুলী। রাজবাড়ীর কর্মচারীরূপে বিপিনবাবু লাঠি ছোবা খেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার শিক্ষক হয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন। এঁদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস দেখে দুকড়িবালা দেবী মুগ্ধ হয়ে যান, বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মনে এঁদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে একটা পবিত্রভন দেখা দিল তাঁব মনে।

বোনপো নিবারণের বিবাহ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধল মাসী-বোনপোর মধ্যে। শর্ত ছিল তর্কে যে হারবে সে বিজয়ীর পথ ও মত গ্রহণ করবে। তর্কে মাসীমা হেরে গেলেন। বললেন, “এবার আমায় দলে নিয়ে নাও।” বোনপো নিবারণ বলেন, “তুমি কি এপথে আসতে পারবে মাসিমা? এমন বিপদের মুখে পা বাডাতে নাই বা এলে?” সিংহী গর্জে উঠে বললেন, “তুমি যদি দেশের জন্ত প্রাণ দিতে পার, তোমার মাও পারে।”

একদিন বোনপো নিবারণ সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিলেন মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে। এগুলি ছিল রডা কোম্পানী থেকে চুরি ক'রে আনা মাল। এই চুরির কাহিনী অভিনব। ১৯১৪ সালের

দুকড়িবালা দেবী

২৬শে অগাস্ট রডা কোম্পানীর জেঠী-সরকার শ্রীশ মিত্র বডসাহেবের হুকুমমতো মাল খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্রপূর্ণ বাস্ত্র খালাস ক'রে সাতটি গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে নিয়ে আসতে থাকেন। ৬খানা গাড়ী তিনি রডা কোম্পানীর গুদামে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ীর গাড়োয়ান ছদ্মবেশী বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়ীটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়ীতে ৯টি বাক্স ছিল কার্টিজ এবং একটিতে ৫০টি মসার পিস্তল। মালগুলি পরে বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

১৯১৭ সালের জাহুয়ারি মাসে একদিন পুলিশ দুকড়িবালা দেবীর বাড়ী ঘিরে ফেলে। তল্লাসীতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসীমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাঁকে পিস্তলগুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়ীতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটকও রেহাই পাননি। তাঁর জন্তু কারাবাসের আদেশ হয় পাঁচ বছর।

দুকড়িবালা দেবীর কারাবাসের করুণ কাহিনী ননীবালা দেবীর জীবনীতে আগেই লেখা হয়েছে। বন্দীজীবনের অসহ পরিবেশের মধ্যে থেকেও, প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্তু যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী-সৈনিকরা। মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী



১৮৮৩ সালে ময়মনসিংহ জেলাব সুন্দাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী। পৈতৃকভূমি তাঁর সেখানেই। পিতার নাম শিবসুন্দর রায়, মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী।

ময়মনসিংহের থাকুয়া গ্রামের ব্রজকিশোর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর যখন ৩২।৩৩ বছর বয়স তখন একটিমাত্র কন্যা নিয়ে তিনি বিধবা হন।

বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুরী ছিলেন তাঁর দেওরপুত্র। ক্ষিতীশ চৌধুরী এবং ময়মনসিংহের বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (পরে বি.পি.সি.সি.-ব প্রেসিডেন্ট) ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরীকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর' দলভুক্ত ক'রে নেন।

১৯১৬ সালের ৩০শে জুন কলিকাতায় গোয়েন্দা-পুলিসেব ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার পর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ক্ষিতীশ চৌধুরীর নামে গ্রেপ্তারী পর্বোযান। বের হয়। তাঁরা ময়মনসিংহে পলাতক রইলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীকে নিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে। ক্ষীরোদাসুন্দরী হয়েছিলেন পলাতকদের গৃহকত্রী এবং মা।

তার কিছুদিন পরে সেই আশ্রয়ে এসে রইলেন ভারত-জার্মান যুদ্ধের সর্বপ্রধান নেতা যাহুগোপাল মুখার্জী ও বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর। যাহুগোপাল মুখার্জীর নামে তখন দশহাজার টাকা পুরস্কাব ঘোষণা করা ছিল।

পলাতকদের এই বাড়ীটি ছিল পুলিশ-ক্লাবের একেবারে কাছে। প্রদীপের তলায়ই হচ্ছে অন্ধকার। অত কাছে থেকেও পুলিশ অনেকদিন পর্যন্ত বুথাই বাইরে বাইরে এঁদের খোঁজ ক'রে হয়রান হয়েছে। এই বিপ্লবীরা কিছুদিন পর্যন্ত মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে অবলম্বন ক'রে ময়মনসিংহে পলাতক রইলেন।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের পিতা কামিনীমোহন ঘোষ ছিলেন এই বিপ্লবী দলের একজন প্রধান ও অতিশয় শ্রদ্ধেয় কর্মী। পুত্রের নেতৃত্ব পিতা কামিনীমোহন ঘোষ অগ্নানবদনে মেনে চলতেন। তিনি এঁদের সঙ্গে বাইরের কাজের ও কর্মীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী

একদিন বিপ্লবীরা পুলিশের অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর পেলেন। তৎক্ষণাৎ হুসৈন্যমোহন ঘোষ বাদে এই দল মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে নিয়ে নারায়ণ-গঞ্জের দেওভোগে চলে গেলেন। সেখানে মাস দুই তাঁরা অবস্থান করেন। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট তখন সারা বাংলায় বেডাজাল ফেলে রেখেছে বিপ্লবী নেতা যাহুগোপাল মুখার্জী ও অত্যাচারের গ্রেপ্তারের জন্ত। এই বেডাজাল ভেদ ক'রে ছিটকে সরে গেলেন তাঁরা মা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীকে নিয়ে সরিষাবাড়ী।

কিছুদিন বাদে এখানেও পুলিশের ভিতবে চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে তাঁরা বিদ্রোহ-বেগে অন্তর্হিত হলেন জামালপুরে। জামালপুরে যে বাসা ভাড়া করা হ'ল সেখানেও মা হ'বে আশ্রয় দিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরীই। জামালপুরের এই আশ্রয়ে বইলেন যাহুগোপাল মুখার্জী, নলিনীকান্ত কব, সতীশ ঠাকুর, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, কুশা বায়, ক্ষিতীশ বসু ও পৃথ্বী বসু।

জামালপুরে প্রায় দেড়মাস থাকার পব সেখানকার আশ্রয়ও পুলিশের নজরে পড়ে গেছে সন্দেহে, তডিংগতিতে এই দল পলাতক হলেন সিরাজগঞ্জে। ক্ষীরোদাসুন্দরীচৌধুরীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক অন্তবে এবং বাইবে হয়েছিল মাতা-পুত্রের। অসুস্থ মায়ের কবিরাজী চিকিৎসার জন্ত যেন তাঁরা সিরাজগঞ্জে গেছেন এই কথা ছিল বাইবে প্রকাশ।

প্রায় তিনমাস এখানে পলাতক থাকার পব পুনরায় তাঁরা সন্দেহ করলেন যে, পুলিশ খবর পেয়ে গেছে এই আস্তানাব। চক্ষের নিমেষে তাঁরা পালিয়ে গেলেন ধুবড়ীতে। পলাতক নলিনীকান্ত কব ও সতীশ ঠাকুরকে আগে থেকেই ধুবড়ীতে পাঠানো হয়েছিল সেখানে একটা ভাতের হোটেল খুলতে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলেন যাহুগোপাল মুখার্জী, কামিনীমোহন ঘোষ, ক্ষিতীশ বসু, পৃথ্বী বসু, কুশা বায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, গিরীজনাথ রায় এবং মা ক্ষীরোদাসুন্দরী।

ঐ দুই পলাতক বিপ্লবী হোটেল-মালিকের আডালে লুকিয়ে রইলেন এতগুলি বিপ্লবী মাতুষ। দুইদিন পরে তাঁরা একটা আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে হোটেল থেকে পৃথক রইলেন। সকলেই মা ক্ষীরোদাসুন্দরীর দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে পলাতক রইলেন সেই ভাড়াবাড়ীতে প্রায় দেড়মাস। তারপর তাঁরা এখান থেকে উধাও হয়ে আসামের বিমাখাতা গ্রামের ছনখেতের মধ্যে তৈরী একটি বাড়ীতে চলে গেলেন। সাপটগ্রাম স্টেশন থেকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে ছিল এই বিমাখাতা গ্রাম।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

প্রায় দুইমাস এখানে গৃহকর্ত্রী হয়ে ছিলেন মা ক্ষীরোদাসুন্দরী। এই সময়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অগ্রাগ্র সকলেই এতদিন পর্যন্ত তাঁর খবর না পেয়ে আশঙ্কিত হয়ে খোঁজ করতে আরম্ভ করেন। নানা কথা উঠতে থাকে। তখন মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর আশ্রয়দাত্রীরূপে রাখা বিপ্লবীরা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁরা তাঁকে প্রথমে কাশী পাঠিয়ে দিলেন, পরে তাঁর স্বশ্রববাড়ী থাকতে। কাশীতে যে বাড়ীতে তিনি বয়েকদিন ছিলেন সে-বাড়ীর একটা খাতায় তিনি নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখলেন দলের নেতাদের নির্দেশে।

ময়মনসিংহে থাকার বাড়ীতে পৌঁছাব পর পুলিশ যখন তাঁর বাড়ী ঘেরাও ক'রে তল্লাশী এবং জেরা কবল তার এতদিনের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে, তখন মা ক্ষীরোদাসুন্দরী অতি ভালোমানুষের মতো জবাব দিলেন যে তিনি কাশীতে ছিলেন। পুলিশ কাশীতে সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে দেখল সত্যি সে-বাড়ীতে তাঁর নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে। পুলিশ শত জেরা করেও সন্দেহ করবার মতো কিছু তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে না পেরে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

আজ ৭৬ বছর বয়সেও তাঁর অতীত স্মৃতি ময়মন ক'রে তিনি সেই ১৯১৬, ১৯১৭ সালের কাহিনী লাজনম্রকণ্ঠে ব'লে যেতে পারেন। সেই দিনে সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীর এই দুঃসাহসিক যাত্রা ও তাঁর কীর্তি পদচিহ্ন রেখে গেছে পরবর্তীকালের কর্মীদের জন্য।

বাসন্তী দেবী



১৮৮০ সালে বাসন্তী দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়। পৈতৃক দেশ তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পবগনার মধ্যে নওগাঁও গ্রামে। পিতা বরদানাথ হালদার ও মাতা হরিশ্চন্দ্রী দেবীর সঙ্গে ছোটবেলায় তিনি আসামেই থাকতেন। বরদানাথ হালদার আসামের বিজনী স্টেটের দেওয়ান ছিলেন।

১৮৯৭ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বাসন্তী দেবী বিবাহ হয়েছিল বাইশ-বছর বয়সে চিত্রবর্জিত দাশের সঙ্গে। স্বভাববাদী ছিল ঢাকা জেলা বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামে। সেটা ছিল এক দিবাট পরিবার। তিনি দেগেন এ বাড়ী সবলেই উচ্চশিক্ষিত। সেই উচ্চশিক্ষার পরিবেশের মধ্যে থেকে চিত্রবর্জনের কাছেই তিনি শিক্ষা পেতে লাগলেন। শুধু লেখাপড়া নয়, রাজনৈতিক শিক্ষাও। পবিত্রকালে স্বামীর কর্মজীবনের প্রত্যেকটি দুর্বল দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে তিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৯২০ সালে যখন দেশবন্ধু নাগপুর কংগ্রেসে ঘোষণা করে এলেন যে, তিনি তাঁর বিরাট ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবেন তখন সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাঁকে এই ব'লে বাধা দিতে লাগলেন যে, মাসিক অন্ততঃ পঞ্চাশহাজার টাকার এই আয় ছেড়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া তাঁর উচিত নয়। এই বিরাট সংসার কি ক'রে চলবে? তা ছাড়া কত দুঃখী দরিদ্র, অনাথ-আতুরের সেবা ও উপকার করছেন তিনি, সেটাও যে বন্ধ হয়ে যাবে, তাদেরই বা কী গতি হবে?

যখন সকলে মিলে দেশবন্ধুকে এইভাবে বাধা দিতে লাগলেন তখন তিনি কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এক এক বার ভাবলেন, সব ছেড়ে বিবাহী হয়ে তিনি বেঁচে যাবেন। তাঁর এই প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বের সময় বাসন্তী দেবী সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। বাসন্তী দেবী তাঁকে বললেন, “অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ ব'লে আমি মনে করি না। তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি।” ভোগ-ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার একদিনের একটি সংকল্পেই যেন ফকিরের সংসারে পরিণত হ'ল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সেদিন যদি বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুর পশ্চাতে না থাকতেন এবং সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেকে একা স্বামীকে এভাবে প্রেরণা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ না দিতেন তবে তিনি আজ ‘দেশবন্ধু’ হতে পারতেন কিনা কে জানে !

অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশবন্ধু। ১৯২১ সালে বাংলার মেয়েরা তখনো অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই। চরকার প্রচলনও খুব কম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জীকে বললেন, তাঁদের চরকা প্রচলনের কাজ করতে হবে এবং মেয়েদের সাহস দিয়ে কাজে নামাতে হবে। তখনকার দিনে মেয়েরা বড় একটা বাড়ীর বাইরে যেতেন না—রাজনৈতিক কাজ কবা তো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্বের ভার পড়ল বাসন্তী দেবীর উপর।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স-অব-ওয়েল্স বোম্বাই আসেন। সেদিন কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। ১৮ই নভেম্বর গভর্নমেন্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী এবং সভাসমিতিকে রাজদ্রোহমূলক ব’লে ঘোষণা করে।

দেশবন্ধু তাব পবদিনই ১৯শে নভেম্বর বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর কাছে গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অনুমতি আনলেন গভর্নমেন্টের এই অত্যাচার আইন ভাঙবার।

নিজের পুত্র চিররঞ্জনকে দেশবন্ধু বললেন, “নিজের ছেলেকে আগে জেলে পাঠিয়ে তবেই তো আমি অত্যাচার ছেলেদের ডাকতে পারব।” ৬ই ডিসেম্বর চিররঞ্জন একদল স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে হরতাল ঘোষণা করতে বোম্বাইয়ের এবং কলেজ স্কোয়ারে গেলেন। কলেজ স্কোয়ারে তাঁকে এবং আরো ২১ জনকে সেদিন পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সার্জেন্টরা চিররঞ্জনকে প্রহারে জর্জরিত করে ফেলেছিল। বাসন্তী দেবী যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি পুত্রের পিঠে অত্যাচারের চিহ্ন, সার্জেন্টের বুটের দাগ দেখে বিচলিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। চিররঞ্জনের প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তার পরদিনই ৭ই ডিসেম্বর বাসন্তী দেবী বেরিয়ে পড়লেন আইন অমান্ত ও হরতাল ঘোষণা করতে। চললেন খাদি ঘাড়ে নিয়ে বড়বাজার। তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর ননদ, দেশবন্ধুর সহোদরা উর্মিলা দেবী এবং নারী-কর্মমন্ডলের একজন কর্মী স্নানীতি দেবী। তাঁরা হরতাল ঘোষণা করবার পরই তাঁদের তিনজনকে গ্রেপ্তার ক’রে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বাসন্তী দেবীরা গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার সামনে জনতা ছেয়ে ফেলল। থানা থেকে তাঁদের বাইরে নিয়ে আসাই তখন অসম্ভব। গান্ধীজীর ছেলে হীরালাল ছিলেন কাছাকাছি একটা দোকানে। হীরালালকে ডাকিয়ে, তাকে দিয়ে বাসন্তী দেবী জনতাকে স'রে যেতে অনুরোধ করলেন। জনতা সত্যি বাসন্তী দেবীর আবেদন মেনে নিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল।

পুলিস তখন তাঁদের লালবাজারে নিয়ে গেল। চাইল মুচলেকা। তাঁরা মুচলেকা দিতে অস্বীকার করলেন। তারপর রাত প্রায় ৭টায় নিয়ে গেল তাদের প্রেসিডেন্সি জেলে। তাঁরা জামীনে মুক্ত হ'তেও অস্বীকার করলেন।

ওদিকে বডবাজারের 'বিরিট জনতা' ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। সকলেই বলে, “আমরাও জেলে যাবু।” দলে দলে যুবকেরা গ্রেপ্তার হ'তে লাগলেন।

গভর্নমেন্ট রাত প্রায় ১১টায় বাসন্তী দেবীদের মুক্তি দিলেন। মুক্তি পেয়ে রাত্রি ১২টা নাগাদ যখন বাডী ফিরলেন—তিনি দেখলেন দেশবন্ধু তখনো কাজ করছেন। জীকে হঠাৎ সামনে দেখে ব'লে উঠলেন, “তুমি ফিরে এলে কেন?”

—“ফিরে আসব না তো এত রাতে কোথায় যাব? তারা তো রাখবে না। জেলের গেট বন্ধ ক'রে দিয়েছে।”

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের পরই আগুন জ্বলে ওঠে সারা বাংলাদেশে। তরুণরা উত্তেজিত হ'য়ে দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মেয়েরাও সাড়া দিলেন। সেদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের যে প্রভাব বাংলাদেশে দেখেছিল তার বর্ণনা হয় না। জাতির সে এক বিরিট জাগরণ।

বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের তিনদিন পরেই ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় দেশবন্ধুকে। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর ‘বাউলার কথা’ পত্রিকা বাসন্তী দেবীকেই সম্পাদনা করতে হয়। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশবন্ধুর নতুন কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধু তখনো জেলে।

দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক কাজে বাসন্তী দেবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত রইলেন।

১৯২৫ সালে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। তারই একবছর পরে ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনর মৃত্যু হয়। এই বিপর্যয়ের পর বাসন্তী দেবী নিজেকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছেদ প'ড়ে গেল।



নেলী সেনগুপ্তা



১৮৮৬ সালের ১২ই জানুয়ারি নেলী গ্রে জন্মগ্রহণ করেন ইংলণ্ডের কেম্বিজ শহরে। তাঁর পিতার নাম ফ্রেডারিক উইলিয়াম গ্রে এবং মাতা এডিথ হেনরিষেটা গ্রে।

নেলী গ্রে বিলাতে সিনিয়ার কেম্বিজ পাস করেন।

পঞ্চবর্তী যুগে রাজনৈতিক নেতা—চট্টগ্রামেব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন ইংলণ্ডে ব্যাবিস্টারী পড়তে যান তখন কোম্বুজে নেলী গ্রেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পবিণত হয়। ১৯০৯ সালের ১লা অগাস্ট তাঁদের বিবাহ হয়। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে তাঁরা চট্টগ্রামে চলে আসেন। স্বামীর দেশকেই নেলী সেনগুপ্তা নিজের দেশেব মতো ভালবেসেছিলেন। এবং আজও তার সেবা ক'রে চলেছেন।

১৯১০ সালে তিনি প্রথম কলিকাতা আসেন। তাঁর স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেসের কাজেব সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে আজীবন দেশের সেবা ক'রে গেছেন। তাঁর স্ত্রী হ'য়ে নেলী সেনগুপ্তাও স্বামীর পাশে থেকে স্বামীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন,—শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মূলে

নেলী সেনগুপ্তা

তাকে প্রেবণা দিয়েছিলেন শুধু তাঁর স্বামী নন, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিও।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রয় কবে বাজ্জনৈতিক আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

বাব বাব গ্রেপ্তার ও কারাভোগ এবং বাজ্জনৈতিক বঠিন কর্মভাবে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন নেলী সেনগুপ্তা তাঁর স্বামীর বাজ্জনৈতিক কর্মের অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে নেলী সেনগুপ্তাও দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ঐ দুই স্থানেই দেশপ্রিয় বক্তৃতাদান করেন এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে দিল্লীতে একটি নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতাকালে নেলী সেনগুপ্তা গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর ৪ মাসের কাবান্ডও হয়।

১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে নির্বাচিত সভানেত্রী নেলী সেনগুপ্তা স্বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি কর্পোরেসনের অন্ডারম্যান নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্তও তিনি অন্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হন।

দেশ-বিভাগের পূর্বে তিনি স্বামীর পৈতৃকভূমি চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

১৯৫৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইংলণ্ডের নাবী হয়েও তিনি স্বামীকে দেশের পবিত্রতার মানি মর্মে মর্মে অক্লান্ত করতেন এবং সেই মানি ঘোচাবার কঠোর সংগ্রামে তিনি অক্লান্তভাবে যৌগদান করেছিলেন। রাজ্জনৈতিক জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্ভোগ তিনি অজ্ঞ ও অমানবদনে বহন করে চলেছেন এবং বার্ষিক ও শারীরিক দুর্বলতা নিয়েও পাকিস্তানের সাধারণ লোকের সামান্য সুবিধা ও অধিকারের জগৎ প্রাণপণ পরিশ্রম করতেন।



উর্মিলা দেবী



উর্মিলা দেবীর দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিবাগ গ্রামে। পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ, মাতা নিস্তারিণী দেবী। দেশবন্ধু চিত্তবঙ্গন দাশের ছোট ভগ্নী তিনি।

১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর বড়বাজারে খন্দর বিক্রি করতে এবং ২৪শে ডিসেম্বর যখন প্রিন্স-অব-ওয়েলস কলিকাতা আসবেন সেদিনটা হরতাল ঘোষণা করতে উর্মিলা দেবী বেরিয়ে পড়েন বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। তাদের গ্রেপ্তার ও তার পরিণতি বাসন্তী দেবীর জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।

দেশবন্ধুর প্রেরণায় উর্মিলা দেবী মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯২১ সালে তিনি ‘নারী কর্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল চরকা ও খন্দর জনপ্রিয় করা এবং দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচার করা। সুনীতি দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি এই কর্মমন্দিরের উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু নেতা ও পুরুষ কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যান। সেই সময় সভা-সমিতি অচ্যুত করা বে-আইনী ছিল। এই ‘নারী কর্মমন্দির’ তখন বে-আইনী সভা এবং আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ

উর্মিলা দেবী

কবে। নেতৃত্ব ছিল উর্মিলা দেবীর উপর। অত্যধিক পরিশ্রমে উর্মিলা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজেব ভার এসে পড়ল হেমপ্রভা মজুমদারের উপর। পরে উর্মিলা দেবী নারী-কর্মমন্দিরের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন অসুস্থতাব কাবণে। কিন্তু বাস্তবীতি ছেড়ে দেন নাই। ১৯২৬ সালে সর্বোজিনী নাইডু এখন কংগ্রেসের সভানেত্রী তখন উর্মিলা দেবী তাঁর সঙ্গে বহুস্থানে বাস্তবনৈতিক পর্যটন করেন।

১৯৩০ সালে লণ্ডন আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় 'নারী সত্যগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। উর্মিলা দেবী এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তিনি সেই সময় আইন অমান্ত ক'বে কাবাবরণ করেন।

১৯৩১ সালের শেষদিকে হিজলী বন্দীনিবাসে বাজবন্দীদেব উপর গুলী চালানো হব। এব ফলে দুজন বাজবন্দী সন্তোষ মিত্র ও তাবকেশ্বর সেন নিহত ও অনেকে আহত হন। উর্মিলা দেবী এই সময় জেলে বাজবন্দীদেব সঙ্গে দেখা করেন ও জেলখানাব প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অসহিত করাব জ্ঞাত যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১৯৫৬ সালের মে মাসে তাঁব মৃত্যু হব।



হেমপ্রভা মজুমদার



১৮৮৮ সালে নোখাখালিতে জন্মগ্রহণ করেন হেমপ্রভা মজুমদার। পিতা গগনচন্দ্র চৌধুরী, মাতা দিগম্বরী দেবীশী*

ত্রিপুরা জেলায় কাশীনগর গ্রামে বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বসন্তবাবু ১৮৯৩ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবা। স্বামীর নিকট থেকেই হেমপ্রভা মজুমদার দেশসেবার প্রেরণা পান।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু পুত্র চিববঙ্কনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এমন প্রহাণ করে যে, গুজব রটে যায় চিববঙ্কন প্রহারের ফলে মারা গেছেন। হেমপ্রভা দেবী সেই রাতেই চলে গেলেন আলিপুর জেল গেটে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রাহ্যই কবল না। হেমপ্রভা মজুমদার গর্জন করে উঠে বলতে লাগলেন, চিববঙ্কনের খবর জানবার জন্য জনতা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। যদি তিনি কোনো খবর না নিয়ে ফিরে যান তবে তারা মনে করবে যে চিররক্তের মৃত্যুর খবরই সত্য। তখন তারা দেশে যে আগুন জ্বালাবে তাকে নিভিয়ে দেবার শক্তি জেল-কর্তৃপক্ষের নেই। এই হুঁকারে জেল-কর্তৃপক্ষ নরম

হয়ে গেল এবং দেশবন্ধুর ছেলের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিল। পুলিশের সঙ্গে, জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার মতোই তেজস্বিনী নারী হেমপ্রভা মজুমদার।

১৯২১ সালে উর্মিলা দেবী 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময়কার আন্দোলনে নেতাবা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর বে-আইনী সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনা করবার ভাব এসে পড়ল 'নারী কর্মমন্দির' ও তাঁর নেত্রী উর্মিলা দেবীর উপর। কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করার পর উর্মিলা দেবী অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। তখন পুলিশের অত্যাচার অগ্রাহ্য ক'রে সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনার ভার এসে পড়ে হেমপ্রভা দেবীর উপর। সেই সময় কলেজ স্কোয়ারে একটি বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত করবার সময় পুলিশ একটি ছেলেকে বেটন দিয়ে প্রহার ক'রে দেখে দেখে যখন তিনি তাঁকে রক্ষা করতে যান তখন সার্জেন্টের বেটনের প্রহারে তিনি আহত হন ও তাঁর একটি আঙুল ভেঙে যায়।

১৯২১ সালে চাঁদপুরে ও গোয়ালন্দে স্ট্রীমার-ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের কালে হেমপ্রভা দেবী তাঁর স্বামী বসন্ত মজুমদারের সঙ্গে ধর্মঘটকারীদের এবং আসাম-প্রত্যাগত চা বাগানের কুলীদের অকৃত্রিম সেবা করেন। এই সেবা-কাজের জগুই ছয়মাস পর্যন্ত তিনি গোয়ালন্দে এসে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। ধর্মঘট সফল হয়।

সেখান থেকে তিনি নারায়ণগঞ্জ গিয়েও স্ট্রীমার-ধর্মঘট করান এবং মেয়েদের সংগঠন করেন।

'নারী কর্মমন্দির' উঠে যাবার পর ১৯২২ সালে হেমপ্রভা দেবী কলকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি একবছরের জেল কারারুদ্ধ হন; সঙ্গে তাঁর দুটি মেয়ে শান্তিপ্রভা ধর এবং অরুণা কর-ও কারাবরণ করেন।

১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন-আইনে নারী ভোটাধিকার পায়। মহিলাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত মহিলাগণ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হবার অধিকার পেলেন। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান-সভাতে সদস্য নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়। স্বভাষচন্দ্র

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বঙ্গ মূল কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে যে কংগ্রেস পরিচালিত করেন, হেমপ্রভা দেবী তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। তখন হেমপ্রভা দেবী তাতে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্তর্ধানের পর হেমপ্রভা দেবীর উপর ফরওয়ার্ড-ব্লকের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার হস্ত হয়।

১৯৪৪ সালে তিনি কর্পোরেশনেব অন্ডারম্যান নিযুক্ত হন।

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করছেন।



মোহিনী দেবী

★

মোহিনী দেবী ১৮৬৩ সালের (বাংলা ১২৭০ সাল) ২০শে ফাগুন ঢাকা জেলাব মাণিকগঞ্জে বেউখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামশঙ্কর সেন এবং মাতা উমাসুন্দরী দেবী। সেই যুগে বাংলাদেশে প্রগতিমূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবার বিশেষ জড়িত ছিল।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রথম হিন্দু ছাত্রী ছিলেন মোহিনী দেবী। বামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নিকট তার শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরে ইউনাইটেড মিশনের শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁকে ইংবাজি শিক্ষা দেন।

বাবোবৎসব বয়সে মোহিনী দেবীর বিবাহ হয় তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে। তারকচন্দ্র দাশগুপ্ত দর্শন বিষয়ে বই লিখে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

মোহিনী দেবীর কন্যা ডাক্তার প্রভাবতী দাশগুপ্তা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম আমলের মহিলা গ্রাজুয়েটেড অধ্যাপক। তিনি কলিকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী পান। বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাত্রী। মোহিনী দেবীর অসংখ্য সম্মানগণ্য কৃতি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

শ্রীশিক্ষা, শ্রী-স্বাধীনতা ও বাল্যবিবাহে বাধাদান প্রভৃতি ব্যাপারে মোহিনী দেবী সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি একদিকে সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে এবং অত্রদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিযোজিত কবেছিলেন। তিনি নিজে অনাড়ম্বর জীবন যাপন কবতেন এবং অগ্রায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে কখনো দ্বিধা বোধ কবতেন না।

১৯২১-২২ সালে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে বিবাহট এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পান। সেসময়ে ঐ আন্দোলনে যোগদান ক'বে তিনি গ্রেপ্তার হন।

১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় তিনি কলিকাতার বাজপথে পিকেটিং, খন্দব ফেরী প্রভৃতি সরকার-বিরোধী কাজে নেতৃত্ব কবেন এবং তাঁর ছয়মাস কাবাদণ্ড হয়। পবে আরো ছয়মাস তিনি স্বগৃহে অন্তবীণ থাকেন।

‘নিখিল ভাবত মহিলা সম্মিলনী’ ব সভানেত্রী হিসাবে অগ্নিগর্ভ ভাষায় তিনি যে স্ফুটন্তিও অভিভাষণ পাঠ কবেছিলেন সে যুগে সকলেই তাব উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

গান্ধীজীব আদর্শে তাব অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। কলিকাতায় ১৯৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব সময় তিনি নিজেব জীবন তুচ্ছ কবেও, দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলমান প্রধান অঞ্চল এটনিবাগানে তাব নিজের বাড়ীতে অবস্থান ক'রে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যেব বাণী প্রচার কবতেন। সেই সময় তাঁব বন্ধুবান্ধব সকলেই তাকে ঐ স্থান পবিত্রাণ কবতে অগ্রবোধ কবেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেব সংকল্পে দৃঢ় থাকেন।

তাব মধ্যে কোনো দলীয় সংকর্ণতা ছিল না। সেজন্ত দলমত নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি আকর্ষণ কবেছিলেন। তাব ছিল অসাধারণ মানসিক শক্তি ও গভীর আত্মবিশ্বাস। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ এই বরণ্য নেত্রীব দেহাবসান হয়।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী

★



১৮৮২ সালেব জানুয়ারি মাসে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছাবকানাথ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রসিদ্ধ সমাজসেবক, দেশকর্মী ও নাবী-কল্যাণব্রতী। মাতা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট (১৮৮৩)। তিনি শুধু ডাক্তারই ছিলেন না, ছিলেন একাবাবে রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজ-সেবিকাও।

পিতামাতার নিকট থেকেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী পেয়েছিলেন জীবনের সকল শিক্ষা ও প্রেরণা। তাঁদের মতোই সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্মী। যেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ।

তিনি এম এ. পাস করার পর বেথুন স্কুল, কটক র‍্যাভেনশ' গার্লস কলেজ, কলম্বো বুদ্ধিস্ট গার্লস কলেজ, জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল প্রভৃতি নারী-শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষরূপে জীশিক্ষা-প্রচাবে বিশেষ সহায়তা করেন। 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' সংগঠনেও তাঁর দান অনেকখানি।

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী গঠন করলেন নারী-স্বচ্ছাসেবিকা বাহিনী। এদেশের নারী

এইযাব প্রথম প্রকাশে বেবিবে এলেন সংঘবদ্ধভাবে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী অধিনায়কত্বে মেয়েরা সাহসেব সঙ্গে প্রকাশ্য অধিবেশনে কাজ ক'বে সকলকে বিদিত কবলেন। তখনকাব দিনে মেয়েদেব পক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও স্বাধীনতাৰ আকাঙ্ক্ষায় দলবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে আসা এবং কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কম দুঃসাহসেব পরিচায়ক ছিল না। সেই সময় তাদেব নেতৃত্ব গ্রহণ ক'বে স্পষ্টভাবে পবিচালিত কবাও কম দক্ষতাৰ কথা নয়। দেশবন্ধু তাঁব পাবদর্শিতা দেখে তাঁকে কর্পোরেশন প্রাইমারী এডুকেশন কমিটিব সহায়ক সদস্তা রূপে গ্রহণ কবেন। তাবপব জ্যোতির্ময়ী দেবী জনগণেব মধ্যে বাজানৈতিক চেতনা জাগাবাব জন্ত, কংগ্রেসেব আদর্শ প্রচাব কববাব জন্ত বহু সভা সমিতি, যুব সম্মেলন ও জেলা সম্মেলন প্রভৃতিব সভানেত্রী রূপে দৈশেব সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৯৩০ সালে তিনি চাকবীব মাথা ত্যাগ ক'বে মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনেও তিনি বাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যে শুধু নিজে যোগদান কবেছিলেন তা নব, শহবে শহবে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা সমিতিতে উদ্দীপনামবী বক্তৃতা দিয়ে সবসাধারণকে আত্মান জানিয়েছেন এবং প্রেবণা দিয়েছেন। ঐ দুইবাবেব আন্দোলনেই তিনি কাবাকল্প হযেছিলেন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা কম্পোবেশনেব প্রথম দুইজন মহিলা কাউন্সিলারেব মধ্যে তিনি অন্ততম কাউন্সিলাব রূপে নিবাচিত হন।

তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু। তাঁব হৃদয় ছিল দবদী। ১৯৭৫ সালেব ২১শে নভেম্বর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এব মোকদ্দমাব সমব কলিকাতাব ছাত্রবা দলবদ্ধ ভাবে ঐসব বন্দীদের মুক্তিব জন্ত শোভাযাত্রা কবেছিলেন। তাঁবা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন ডালহাউসি স্টোয়ারে। তখন সেটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। পুলিশ আটকে রাখল তাদেব ধর্মতলায়। ছাত্রবা এগিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। পুলিশ গুলী ছুঁড়তে লাগল। ছাত্ররা পুলিশেব গুলীব সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন। আহতেব সংখ্যা অনেক। নিয়ে গেছে তাঁদেব হাসপাতালে। নিহত হযেছেন কিশোব ছাত্র বামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাত প্রায় বাবোটাব সময় ঐ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সশস্ত্র পুলিশেব ব্যহ ভেদ ক'রে ছাত্রদেব মধ্যে এসে দাঁড়ালেন ধর্মতলায়। তিনি কম্পিতকণ্ঠে ছাত্রদেব সম্বোধন ক'রে বললেন—“তোমাদেব মৃত এবং আহত বন্ধুদেব দেখে আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। বাংলার ছাত্র, তোমরা

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী

অসীম বীরত্ব দেখিয়েছ। পুলিশের গুলী তোমাদের ভয় দেখাতে পারেনি, ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি, তোমরা বৃকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছ, দিয়েছ বৃটিশ গভর্নমেন্টের চ্যালেঞ্জের উত্তর। সমস্ত দেশের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তোমাদের মাথায়।” সারা রাত্রি রইলেন তিনি ছাত্রদের পাশে ধর্মতলার রাস্তায়।

দ্বিতীয় দিনে দ্বিগুণ ছাত্র এসে যোগ দিলেন ধর্মতলার ছাত্রদের সঙ্গে। তাঁদের সংকল্প দেখে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আরো শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। আরো গুলী বর্ষিত হ’ল, আরো রক্ত ছাত্রদের বুক থেকে বয়ে গেল। অনেক রক্তের বিনিময়ে বিজয়ী বীর ছাত্ররা সেদিন ডালহাউসি স্কোয়ারে যাবার দাবী আদায় কবেছিলেন। ছাত্রদের বিদ্রোহের কাছে বৃটিশ সিংহের মাথা নত করতে হয়েছিল।

এই দ্বিতীয় দিনেই ২২শে নভেম্বর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছাত্রদের শোভা-যাত্রাব নেতৃত্ব ক’রে চলেছিলেন গুণানে। শহীদ রামেশ্বরের শবদেহ বহন ক’রে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল। পথে মিলিটারী ট্রাক পশ্চাৎ থেকে এসে তাঁর মোটরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়। এই দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু ছাত্র-আন্দোলনে তার ভূমিকার গৌরবময় পরিণতি।



লাবণ্যপ্রভা দত্ত

★

১৮৮৮ সালে পিতার মামাবাড়ীতে বহুবমপুরে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন লাবণ্যপ্রভা দত্ত। মাতৃষণ্ড হন দেখানেই। সেটা ছিল গোঁড়া পর্দানশীন এক বৈষ্ণব জমিদার পরিবার। পিতা হেমচন্দ্র রায় এবং মাতা কুম্ভকুমারী দেবী।

ঐ জমিদার-বাড়ীর নিয়ম ছিল—গ্রহণ লাগলেই বাড়ীর বৌ ও মেয়েদেব সবাইকে পাল্কি ক'রে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে পাল্কিগুদ্ধ ঠিক বেড়াল-চুবানির মতো চুবিয়ে আনা হবে। বাড়ী এসে তারা কাপড় বদলাবে। সাতবছরের বালিকা লাবণ্যপ্রভা এক শীতের গ্রহণের রাতে পাল্কি-বন্দী হয়ে গঙ্গায় না গিয়ে বাড়ীতে লুকিয়ে রয়ে গেলেন। তিনি সেদিন মনে মনে সংকল্প কবলেন যে, বড় হয়ে এই নিষ্ঠুর প্রথা দূর কববেন। সত্যিই যখন ১৯৩০ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন বহুবমপুরে গিয়ে ঐ গোঁড়া জমিদার-বাড়ীর বৌদের বাইরে নিয়ে এসে তিনি সভা অনুষ্ঠিত করেন এবং সেখানে চার জায়গায় চারটি মহিলা-সমিতি গঠন করেন। গোঁড়া পরিবারের মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসা তখন বড় সহজ কথা ছিল না।

নবচর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামের যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। তাঁর স্বামী প্রথমে কলিকাতায় উকিল ছিলেন। পরে বৈষয়িক কাজে সাতক্ষীবাতে ওকালতি করতে যান।

লাবণ্যপ্রভা দত্তের বড় ভাই সুবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বিপ্লবী বাবীন ঘোষের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে জড়িত। বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মের প্রথম প্রেৰণা পান। তিনি দাদাব দেওয়া রিভলভার ও নিষিদ্ধ পুস্তক লুকিয়ে রাখতেন।

তাঁর দাদা যখন মারা যান তখন লাবণ্যপ্রভা দত্তের বয়স আঠারো। মৃত্যুর পূর্বে ছোট বোন লাবণ্যপ্রভা দত্তের মাথায় হাত বেগে তিন আশীর্বাদ করে যান যে, তিনি যেন দেশসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কবেন। সেই কথা লাবণ্যপ্রভা দত্ত ভোলে ননি সার জীবন।

১৯০৬ সালের স্বদেশী যুগ তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন, স্বদেশী ছেলেদের অর্থ দিয়ে সাহায্য কবতেন। এমনকি তার প্রভাবে তাঁর স্বামীও মত বদলে স্বদেশীভাবাপন্ন হন।

লাবণ্যপ্রভা দত্তের তেইশ বছর বয়সের সময় অকস্মাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। অসম দুঃখসাগর তাকে ঘিরে ফেলে। তিনি পুৰী চলে গেলেন। রামদাস-বাংলাজীর নিকট থেকে সেখানে তিনি দীক্ষা গ্রহণ কবেন। বহুদিন তিনি পুরীতে রইলেন। তারপর তাঁর ছোট মেয়ে ও পিতার মৃত্যুর পর পুরী ছেড়ে তিনি প্রথম নবদ্বীপ ও পরে কলিকাতায় আসেন।

সেই বছরবেই ১৯২৯ সালে লাহোব জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীন দাসের আশানে দাঁড়িয়ে তিনি ও তাঁর কন্যা শোভাবাগী প্রতিজ্ঞা কবেন যে, তাঁরা দেশসেবায় পবিত্রভাবে আত্মনিয়োগ কববেন।

১৯৩০ সালে লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং কন্যা শোভাবাগী দত্ত 'অনন্দমঠ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিয়ে। এখান থেকে অনেক কর্মীকে আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করতে পাঠানো হ'ত।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। তার মুখ্য-সম্পাদিকা ছিলেন শান্তি দাস (কবীর) ও বিমলপ্রতিভা দেবী। 'নারী সত্যগ্রহ সমিতি'-র আস্থানে লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও শোভাবাগী দত্ত কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

আন্দোলন পরিচালনা করেন। দুজনেই বড়বাজারে গিয়ে নিজেরা পিকেটিং করতেন এবং পিকেটিং করবার জ্ঞান মহিলা কর্মী সংগ্রহ করতেন। এই সময় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে লাভণ্যপ্রভা দত্ত মহিষবাধান চলে যান।

ফিরে আসার পর তিনি ‘যতীন্দ্র স্মৃতিমন্দির’-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। স্মৃতিমন্দির থেকে বহু কর্মীকে পিকেটিং ও আন্দোলনে যোগদান করতে পাঠানো হ’ত।

একদিন বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী এসে তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের কাজ করতে আহ্বান করেন। সেই সময় ১৯৩০ সালে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী এবং প্রেসিডেন্ট সূভাষচন্দ্র বসু। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস থেকে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল তার পরিচালনা করতে করতে লাভণ্যপ্রভা দত্ত গ্রেপ্তার হন। তাঁর প্রতি তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তাব জেল থেকে ফিবে আসার পর সেক্রেটারি চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাঁর কারাদণ্ডের পর লাভণ্যপ্রভা দত্ত দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এইসময় দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে লাভণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে সঙ্গে শোভারাগী দত্তের দানও অনস্বীকার্য।

লাভণ্যপ্রভা দত্ত শুধু যে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন, তাই নয়, তিনি চব্বিশ-পরগনা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন।

চব্বিশ-পরগনার নীলা গ্রামে একদিন তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে যান। নীলা গ্রামের হাটের মধ্যে সেদিন আইন-অমান্যকারীরা জমায়েত হচ্ছিলেন। মায়ের একমাত্র সন্তান আশু দলুই দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তিনি হাটের মধ্যে পুলিশের সঙ্গে আইন-অমান্যকারীদের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে জেগে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান আইন-অমান্যকারীদের মধ্যে। সেই সময় পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়বার পূর্বে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছিল। পুলিশের সেই চ্যালেঞ্জ শুনে আশু দলুই সামনে এগিয়ে গিয়ে

বললেন, “আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, গুলী কর।” পুলিশের গুলীতে আশু দলুইর রক্তাক্ত দেহ মুহূর্তে ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। তাঁর মৃত্যু সেদিন আইন-অমান্যকারীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে শিখিয়ে গেল। কিন্তু আজ সেই অনাথিনী মায়ের একমাত্র সন্তান আশু দলুইকে কেই বা মনে রেখেছে? ক’জনই বা তাঁর নাম শুনেছে?

১৯৩১ সালের ২৬শে জাভুয়ারি স্বাধীনতা-দিবসে দক্ষিণ কলিকাতায় লাবণ্যপ্রভা দত্ত এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁর ডান হাতখানা ভেঙে যায়। তার পরদিনই ভোরে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা অনেকে ডাখমগুহারবারের ‘বাণীমন্দির’-এ গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানকার কর্মী প্রেমলতা বসু (বিপ্লবী দুর্গাচরণ বসুর স্ত্রী) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা গেলেন কোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে। প্রেমলতা বসু যখন লাবণ্যপ্রভা দত্তের উপর পুলিশের লাঠিচাঙ্গের ফলে ভেঙে-যাওয়া হাতখানা জনতাকে দেখালেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগলেন তখন জনতা ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারাও দলে দলে এগিয়ে গেল আইন অমান্য করতে। এবারে রাজদ্রোহেব অভিযোগে লাবণ্যপ্রভা দত্তকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালে পুনরায় তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। হরিশ পার্কে হিজলীর রাজবন্দীদের উপর গুলী চালানার প্রতিবাদে বক্তৃতা দেবার জন্ত রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর পুনরায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরে ফিমেল-ইয়ার্ডে বিধবাদের নিজেদের রান্না ক’রে খাবার অধিকার পাবার জন্ত তিনি ঐ জেলে ১৪ দিন অনশন ক’রে সফল হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে তিনি বি.পি.সি.সি.-র মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ যখন ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগদান ক’রে জেলে চলে যান তখন তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্তকে বি.পি.সি.সি.-র সভানেত্রী মনোনীত করেন। ১৯৪১ সালে তিনি বি.পি.সি.সি. থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি বি.পি.সি.সি.-র সভানেত্রী ছিলেন। ঐ শেষ সংগ্রামের সময় অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

করেছিলেন। তারপর পূর্বতন সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ জেল থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে সভাপতির পদ ছেড়ে দেবার জন্ত তিনি নিজে পদত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত ও আদর্শনিষ্ঠ সৈনিক লাবণ্যপ্রভা দত্ত বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে অগ্রসব হ'য়ে চলেছিলেন। এই মাতৃসমা স্নেহময়ী নেত্রীর প্রেরণায় কত সৈনিক যে সেদিন কারাগৃহে প্রবেশ করেছিলেন তার সংখ্যা কেউ রাখেনি।

চারুশীলা দেবী

★



১৮৮৩ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন চারুশীলা দেবী। দেশ তাঁদের মেদিনীপুরেই। পিতা বাখালচন্দ্র অধিকারী, মা কুমুদিনী দেবী।

চারুশীলা দেবী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছাত্রী। শিশুবয়স থেকেই তিনি ছিলেন পাঠপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। বাবোবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল মেদিনীপুরের বীবেন্দ্রকুমার গোস্বামীর সঙ্গে।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অগ্নিশিশু ক্ষুদ্রবাম থাকতেন মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে হবিবপুরে তাঁর দিদির কাছে। তিনি প্রায়ই চারুশীলা দেবীর বাড়িতে আসতেন। তাঁকে ক্ষুদ্রবাম এত ভালবাসতেন যে, মাঝে মাঝে দিদির বুড়ী থেকে চলে এসে তাঁর কাছে থাকতেন। ক্ষুদ্রবাম ছিলেন চারুশীলা দেবী অপেক্ষা কয়েক বছরের ছোট। ক্ষুদ্রবাম জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯০৫ সালে ক্ষুদ্রবাম বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। চারুশীলা দেবীকেও একদিন ক্ষুদ্রবাম বক্তৃতিসকল পরিবেশিত করেছিলেন প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নেন।

এই প্রতিজ্ঞার পব ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন মেদিনীপুরের পুরানো-কেন্দ্রার এক প্রদর্শনীতে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্রবাম ‘বন্দে মাতরম্’ নামে একটি পুস্তিকা বিলি করছিলেন। পুলিশ ক্ষুদ্রবামের হাতে পুস্তিকা দেখে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সেগুলি কেড়ে নিতেই ক্ষুদিরাম পুলিশকে মেরে বসলেন। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন।

মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের প্রধান সমর্থক ও সাহায্যদানকারী রাজা নরেন্দ্রলাল খান অকাতবে টাকা দিয়ে এই মামলা পরিচালনা করান। অবশেষে ক্ষুদিরাম মুক্তি পেলেন। তারপর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা কবতে যাওয়ার আগে ক্ষুদিরাম চাকুশীলা দেবীর বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। ক্ষুদিরামের মামলাব সময় পুলিশ চাকুশীলা দেবীকে খোঁজ করতে থাকে। তিনি তখন আত্মগোপন ক'বে বইলেন। এবই কথেকবছর পব তিনি বিধবা হন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি মেদিনীপুরে যান। ঐ সময় তাঁদের প্রেরণাব মেদিনীপুরে নাবীজাগরণ দেখা দেয়। চাকুশীলা দেবীও একটি মহিলা-সমিতি গঠন করেন।

১৯২২ সালে তিনি কলিকাতায় ট্রেনিং পড়তে আসেন। তারপর মেদিনীপুরে ফিরে গিয়ে পুনরায় মহিলাদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্যের সময় তিনি আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়েন। নরঘাটে একটা জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল, বক্তা চাকুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এই মিটিং ভেঙে দেবার জন্ত মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। পেডি আদেশ দিলেন, “১৪৪ ধারা জারী আছে, মিটিং ক'রো না।” জ্যোতির্ময়ী দেবী পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে জনতাকে আহ্বান ক'বে বললেন, “গাঁরা বুকেব বক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা এই সভায় এগিয়ে আসুন, যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন তাঁরা ফিবে যান।” এই আহ্বান শুনে সাবিত্রী নামে তমলুকেব এক সালঙ্কারা পবমাস্ত্রধারী ষোড়শী পতিতা নারী এসে বললেন, “আমরা বুকের রক্ত দেব কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না।” তাঁর পশ্চাতে প্রায় আটশত গ্রাম্য মেয়ে ও বৌ কোলে-পিঠে সস্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, তাঁরাও এই সভা রক্ষা করবার জন্ত জীবন বিসর্জন করবেন। তাঁরা পুরুষদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভা সাক্ষ ক'রে তাঁরা সকলে মিলে লবণ-তৈরীর ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী এই সময় জনতার উপর লাঠিচার্জ করে।

একটি দশবছরের বালকের চোখে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিজেই আঘাত হেনে রক্তাক্ত করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ পতিতা নারী সাবিত্রী ছুটে এসে

নিজেব পরনের খদ্দের শাড়ী ছিঁড়ে তার চোখ বেঁধে কোলে নিয়ে বসলেন। এ দৃশ্য সেদিন মেদিনীপুরের জনসাধারণকে বিস্মিত ও বিচলিত ক'রে তুলেছিল। পেডি সেদিন সেখানে প্রায় একঘণ্টা লাঠিচার্জের ভকুম-জাবী রেখেছিলেন।

পরের দিন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও চারুশীলা দেবীবা কাঁথি, কালীনগর ইত্যাদি স্থানে গিয়ে পুনরায় সভার আয়োজন করেন এবং জনসাধারণকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান করেন।

বে আইনী লবণ তৈরী করাব অপবাধে কর্মী ঝাডেশ্বব মাঝিব কাবাদগু হয়। তাঁব মায়েব সঙ্গে দেখা কবতে গিয়ে চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী জানতে পাবলেন যে, তাদের প্রায় আটশত মণ ধান পুলিশ মাঠেব মধ্যে চেলে ফেলে পড়িয়ে দিয়েছে। কিছু ধান পুকুবে ফেলেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই আদর্শ কৃষক-পরিবারেব সমস্ত কৃষিজাত সম্পদ ও কৃষিব বাগান পুলিশ নষ্ট কবে দিয়েছে। চবকা, তৈজসপত্র, গৃহদেবতা সবই তাবা ধ্বংস কবে গেছে।

তাবা আবে দেখলেন যে, ঝাডেশ্বব মাঝিব মা দুই টুকবো বস্ত্রথণ্ডে কোনাবকমে লজ্জা নিবাবণ ক'বে আছেন। ছেলে দুটি কোপীন পবেছেন। চারুশীলা দেবী ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীকে বৃদ্ধা বাব নাবী বললেন—“আমার আটশত মণ ধান নষ্ট কবেছে, আবাব ষোলোশত মণ ধান হবে। আমার কিছু ক্ষতি হয়নি। আবাব আমি সভা কবব। একটা ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে, এখনো ছুটো ছেলে মা ব'লে ডাকে। লবণ আইন অমান্য আমি তো কববই।”

এই অনমনীয় নারীব উক্তিবে সেদিন মেদিনীপুরেব পল্লীগ্রামের নাবীদের সাহসেব ছবি ফুটে ওঠে চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবীব চোখে। তাবা বে-আইনী সভা আহ্বান কবতে করতে অগ্রসব হন।

চল্লাকরে গিয়ে চারুশীলা দেবী এরূপ একটি সভায় বক্তৃতা কববাব সময় লাঠিচার্জ হয়। নবঘাটেব মতোই এবাবেও মেদিনীপুরেব দুঃসাহসী নাবীরা নেত্রীদের আহ্বানে লাঠিচার্জকে অগ্রাহ্য ক'রে সভা অনুষ্ঠিত করেন। চারুশীলা দেবীব নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। তিনি পলাতক অবস্থায় খডগপুরে এসে শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভা আহ্বান করেন, সত্যগ্রহীদের জগ্ন অর্থ সংগ্রহ করতে। সেখানে হাজার হাজার লোকের জনতাকে উত্তেজিত দেখে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার কবতে সাহস পায়নি।

ঐ সংগৃহীত টাকা নিয়ে তিনি কাঁথি রওনা হন। যে বাসে তিনি ওঠেন সেই বাসে এবং সঙ্গেব আরো কয়েকটা বাসে ছিল শুধু পুলিশ। চারুশীলা দেবী

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সংগৃহীত পাঁচশত টাকা ও গহনা নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে রইলেন অসীম দুঃসাহসে। রাত প্রায় দুইটায় কাঁথি পৌছে তিনি সেই অর্থ ও গহনা নেতা অমল চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

৭ই অগাস্ট একটা বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করাব সময় মেদিনীপুর শহরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মেদিনীপুর জেলের ভিতরে গিয়ে বিধবাদের নিজ হাতে রান্নার অধিকারের জ্ঞা তিনি অনশন করেন। কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাঁর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৩০ সালে মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ফলে চাক্ষুশীলা দেবীর বাড়ী তিনমাসের জ্ঞা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত থাকাকালে তাঁর বাড়ীর জিনিসপত্র, গহনা ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি প্রায় সত্তরহাজার টাকা মূল্যের জিনিস চুরি যায়।

১৯৩১ সালের শেষে তাঁকে একমাসের জ্ঞা জেলে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখা হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি ১৯৩২ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দেড়বছরের কারাদণ্ড লাভ করেন। এবারে বাইরে আসার পর তিনি পাবনা যান। সেখানে এক সভায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়াতে ১৯৩৩ সালে তাঁর পুনরায় একমাসের কারাদণ্ড হয়। কারাভোগের পর ফিরে এলেন তিনি মেদিনীপুরে।

১৯৩৩ সালেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বাজকে বিপ্লবীরা হত্যা করেন। তখন চাক্ষুশীলা দেবীকে মেদিনীপুর জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয় আটবছরের জ্ঞা। তিনি পুরী চলে যান। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক পিউনিটিভ পুলিশেব ট্যাক্স আদায় কবাব জ্ঞা তাঁর বাড়ী ও জমি নিলাম হয়ে যায়।

পরে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ওই আটবছরের বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং তিনি ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় চলে আসেন।

গৃহহারা, বাস্তবহাবা ও কপদকশূন্য অবস্থায় তিনি কলিকাতার রাস্তায় সাত-দিন ঘুরে বেড়ান। তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার শৈলেন ঘোষ তাঁকে কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা কোথাও তাঁকে মাথা নত করতে শেখায়নি।

শান্তি দাস (কবীর)



শান্তি দাস জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৯০৫ সালে দেবাছনে। পৈতৃক ভূমি তার শ্রীহট্ট। পিতা হৃদয়চন্দ্র দাস, মাতা অশোকলতা দাস। মা সন্তানদের শিশুকাল থেকেই সেবা ও ত্যাগেব উচ্চ আদর্শ সামনে বেখে লালনপালন করেছিলেন।

শান্তি দাস ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম এ পাস করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ও তাঁব ভগ্নী প্রীতি দাস (চ্যাটাজী) কলিকাতায় নিজেদেব বাসভবনে ‘দীপালী শিক্ষামন্দির’ নামে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থের কোনো সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অনেক পবিশ্রম ক’বে মা, দুই ভগ্নী এবং কয়েকটি বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠানটিকে বিদেশী সরকারেব প্রভাব থেকে মুক্ত বেখে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পবিচালিত করেন। মেয়েদেব স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাবলম্বী ক’বে গ’ড়ে তোলার উদ্দেশ্বে সেখানে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়াস করা হয়েছিল।

১৯৩০ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কববাব জগু গান্ধীজীর আহ্বান শান্তি দাস এবং তাঁব মাতা ও ভগ্নীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিদেশীর কবল থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন কবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেছিল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩০ সালে শান্তি দাস এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেস-নেত্রী ও কর্মী কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সংগঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু কর্মিগণ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন উমিলা দেবী। যুগ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী।

বাংলার নারী এবার প্রত্যক্ষভাবে দলে দলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। সত্যাগ্রহীরা জেলখানা ভ'রে ফেললেন। শুধু বাঙালী নন, বহু অবাঙালী নারীও এই সমিতিতে যোগ দিয়ে সত্যাগ্রহ ক'রে কারাৰুদ্ধ হন।

সমিতির সত্যাগ্রহী নাবীবা বিদেশী বস্ত্রের বিক্রি বন্ধ করবার জগু বড়বাজার গিয়ে পিকেটিং করতেন, বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত ক'রতেন। পুলিশের লাঠিচার্জ, বেটনের প্রহার, ঘোড়ার পদতলে নিষ্পিষ্ট হওয়া প্রভৃতি সমস্ত নিৰ্যাতন বরণ ক'রে নারীরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। পুলিশ এইসকল মহিলাদের অনেকসময় বন্ধ ভ্যানে তুলে নিয়ে বহু দূরে নির্জন গ্রামে ছেড়ে দিয়ে চলে আসত। নবজাগ্রত নাবী অকুতোভয়ে সেই ভয়সংকুল অবস্থা পার হয়ে চলে আসতেন—তখন বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ শক্তি তাঁদের হৃদয়ে। এ তরঙ্গ রোধ করবার সাধ্য কারো ছিল না।

সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে করতে শান্তি দাস গ্রেপ্তার হন ও কাবাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর মাতা অশোকলতা দাস এবং ভগ্নী প্রীতিলতা দাসও আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে কারাবরণ করেন।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে শান্তি দাসকে বিভিন্ন স্থানে চারবার বন্দীজীবনের নিৰ্যাতন সহ্য করতে হয়। তিনি হাসিমুখে সকল নিৰ্যাতন বরণ ক'রে অগাধ কর্মীদের মনে প্রেরণা জাগিয়ে চলেছিলেন। বর্তমানে তিনি নানা সমাজ-সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১৯৩২ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী।

বিমলপ্রতিভা দেবী



১৯০১ সালেব ডিসেম্বর মাসে কটকে বিমলপ্রতিভা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।
পৈতৃক দেশ তাঁদের নদীয়া জেলাব কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। পিতা সুবেন্দ্রনাথ
মুখার্জী, মাতা ইন্দুমতী দেবী।

বিমলপ্রতিভা দেবী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ও বধূ। পিতা প্রবর্তক-
সংঘের কর্মী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তিনি শৈশবেই স্বদেশী কাজে অনুপ্রাণিত
হন।

তাঁর বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত ধনী পরিবার জে. সি. ব্যানার্জীদের বাড়ীর
ডাক্তার চারুচন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে। এই গৌড়া পরিবারকে চারদিক থেকে
জড়িয়ে বেঁধেছিল সংস্কারের কঠিন শৃঙ্খল।

পিতার স্নেহভাজন একজন বিপ্লবী কর্মীর প্রভাবে ১৯১৮ সাল থেকে
বিমলপ্রতিভা দেবী ক্রমেই বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা লাভ
করেন।

১৯২১ সালে উর্মিলা দেবীর ‘নারী কর্মমন্দির’-এ যোগদান ক’রে তিনি
বাড়ীর অজ্ঞাতসারে অসহযোগ আন্দোলনের কাজ করতে থাকেন। বাড়ীর
প্রচণ্ড বাধা তাঁকে রুদ্ধ ঘরে বদ্ধ ক’রে রাখতে পারেনি।

১৯২৭ সালে তিনি ‘ভারত নওজোয়ান সভা’-র বাংলা শাখার প্রেসিডেন্ট

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী

নির্বাচিত হন। 'নওজোয়ান সভা'-ব নিখিল ভাবতেব প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভগৎ নি। এই ক্ষেত্রে বাংলার বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিমলপ্রতিভা দেবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

১৯২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যা কিছু কাজ কবেছেন সবই গোপনে। কিন্তু ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় তিনি খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসে যোগদান কবেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ কবতে থাকেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি, শান্তি দাস (কবীর) প্রভৃতি কংগ্রেস নেত্রীবৃন্দেব সঙ্গে মিলিত হয়ে 'নাবী সত্যগ্রহ সমিতি' সংগঠন করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন পবিচালনা কবেন। বিমলপ্রতিভা দেবী 'নাবী সত্যগ্রহ সমিতি' ব যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন।

১৯৩০ সালের ২২শে জুন দেশবন্ধু বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি দিবস পালন উপলক্ষ্যে 'নারী সত্যগ্রহ সমিতি' ১৪৪ ধাবা ভঙ্গ ক'বে শোভাযাত্রা পরিচালনা কবেন কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পযন্ত। বিমলপ্রতিভা দেবী এই বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় অংশগ্রহণ কবাতে তাঁব ছয়মাস কাবাদণ্ড হয় ২৬শে জুন।

এই সময় তিনি বিপ্লবী দলেও কাজ কবতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাব বন্দীদের মামলা পবিচালনাব জ্ঞা তিনি জালালাবাদ থণ্ডুক্ষে নিহত বিপ্লবীদের ছবি বিক্রীব ব্যবস্থা ক'বে বহু অর্থ সংগ্রহ কবেছিলেন এবং সেই অর্থ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাব ব্যয়নির্বাহেব জ্ঞা দিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি মাণিকতলাব ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। এ সম্পর্কে আবো গ্রেপ্তার হন ধীবেন চৌধুরী, কালিপদ বায়, নরহরি সেন প্রভৃতি। বিমলপ্রতিভা দেবী পবে মামলা থেকে মুক্তি পান এবং সেদিনই তাঁকে ডেটিনিউ অর্থাৎ বিনাবিচাবে বন্দী ক'রে আটক রাখে। সিউডি, হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তিনি প্রায় ছয়বছর। ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের 'নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটি'-ব সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেস ছাড়বাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সালের এ আই সি.সি মিটিং-এর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

বিমলপ্রতিভা দেবী

১৯৪১ সালের ২৭শে জানুয়ারি রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার রাখার অভিযোগে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং দুইবছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাদণ্ড ভোগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক রাখা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৯৪৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি পান। বর্তমানে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।



ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা



ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা ১৯১৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশ তাঁর বাজ-স্থান। পিতা বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও সমাজসেবী পদ্মবাজু জৈন, মাতা চন্দা দেবী।

দুইপুরুষ বাবু তাবা ব্যবসা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় বসবাস করছেন। পদ্মবাজু জৈন কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করে তিনবার কারাবরণ করেন। এবং তাঁর পৈতৃক ব্যবসা এই আন্দোলনের ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষতিকে তিনি জাতীয় সংগ্রামেব অংশরূপে গৌরবেব সঙ্গে গ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারক রূপে তিনি নিজের পবিত্রতার পদাশ্রয় ভেঙে ফেলে দিয়ে নিজেদের মারোম্বাডী সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন। নারীর শিক্ষা ও নারীর অগ্রগতির দিকে সেসময় যে কয়জন রাজস্থানী মনীষী অগ্রসর হন, তাঁদের মধ্যে পদ্মবাজু জৈন অন্যতম।

বিখ্যাত কংগ্রেসসেবী কেদারনাথ গোয়েঙ্কার পুত্র কেশবদেব গোয়েঙ্কার সঙ্গে ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা বিবাহ হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা পিতা এবং স্বামীর নিকট থেকেই দেশসেবার প্রেরণা লাভ করেন।

১৯৩০ সালে কলিকাতায় যখন 'নারী সত্যগ্রহ সমিতি' কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন তখন কলিকাতার বাঙালী ও অবাঙালী বহু

ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

নাৰী দলে দলে এসে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইন্দুমতীও তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তিনি বডবাজারে গিয়ে বিলিভী বস্ত্ৰেব দোকানের সামনে গিকেটিং করতেন, বিলিভী কাপড় যোগাড় ক'বে পোড়াতেন, দলে দলে মেয়েদের সঙ্গে সভা ও শোভাযাত্রা করতেন। একদিন তিনি যখন জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা পূর্বোভাগে থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একজন সার্জেণ্ট দ্রুতবেগে এসে তাব হাতে অত্যন্ত কঠিন চাপ দিয়ে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কবে। নিরুপায় ইন্দুমতী সার্জেণ্টের হাতের প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যর্থ করবার অগ্র উপায় না পেয়ে, তার হাতে কামড় বসিয়ে দেন। তৎক্ষণাৎ সার্জেণ্টের হাতের মুঠি শিথিল হয়। ইন্দুমতী দেবী জাতীয় পতাকা উচিয়ে এগিয়ে চললেন।

ইন্দুমতী দেখতেন পুলিশ এবং সার্জেণ্টগণ সত্যাগ্রহীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে লাঠিচাঙ্গ কবে, তাঁদের আহত ও লালিত কবে এবং নানা ভাবে অত্যাচার করে। এইসমস্ত ঘটনা ইন্দুমতীর মনে গভীর বেথাপাত করে। তিনি চুঃখের সঙ্গে ভাবতেন, নিজেব দেশেব লোক হ'য়ে পুলিশ এত অত্যাচার করে? পুলিশেব মনে কি কোনো পবিবর্তন আনা যায় না?

ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা নিজেব নামে বে-আইনী ইস্তাহাব ছাপিয়ে পুলিশ-কর্মচারীদের এই মর্মে আবেদন জানালেন :

“আমরা সব একই ভারতমাতার সন্তান। ভীত ইংরেজ সবকাব যেমন ক'বে হোক আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পিষে মেবে ফেলতে চাইছে। নিদোষ জনতার উপর তারা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। নারীর গায়ে হাত উঠাতেও তারা বিধা কবছে না। কাঁথিতে আমাদের মা ও ভগ্নীদের উলঙ্গ ক'রে মাঝপিট চালিয়েছে, তাঁদের স্তন ধ'বে ওঠ-বোস করাচ্ছে। রাবণও এমন অমানুষিক অত্যাচার করেনি। ভাইসর, এসব দেখেও কি আপনারা এই সরকারের অঙ্গ হয়ে থাকবেন? আমরা কি আপনাদের মা বোন নই? একথা নিশ্চিত যে, বিদেশী সরকারের অস্তিম দিন ঘনিয়ে এসেছে, রাবণের মতো অত্যাচারীর শক্তিও চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। এখন শুধু আপনাদের পদত্যাগের অপেক্ষা। বিদেশী শাসকের বল ও শক্তি তো আপনারাই। আজই আপনারা চাকবী ছেড়ে দিন, ওরা বিদায় হোক।

“আপনারা ওদের সহায়তা না করলে ওদের হাজার হাওয়াই জাহাজ, হাজার বোমা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারা যখন নিজের ভাইয়ের গায়ে লাঠিবর্ষণ করেন

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তখন আমার গভীর দুঃখ হয়, আমার চোখে জল আসে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কি এত নীচ কাজ করতে হবে, যার জন্য আপন ভাই, মা, বোনের উপর এমনি ক'রে হাত উঠাতে হবে ?

“আপনাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। খাণ্ডসমস্তা যত কঠিনই হোক, আপনারা এই ভারতবর্ষেরই সন্তান। আমরা আপনাদেরই ভগ্নী—আমরা ও আপনারা একই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি—সেই দাবি নিয়ে আমি আপনাদের নিকট জোড়হাতে প্রার্থনা করছি যে, আপনারা এই রাক্ষসী সরকারের চাকরী ছেড়ে দিন, অন্ততঃ ভগবানকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করুন যে, নিজের দেশের ভাইয়ের উপর, বোনের উপর হাত উঠাবেন না।”

ইন্দুমতী দেবীর এই ইস্তাহার কলিকাতা, আগ্রা, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি নানা জায়গায় বিতরণ করা হয়।

এই আবেদনের ফলে ইন্দুমতী গোয়েঙ্কাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ন'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ১৯৩০ সালের ২৪শে জুন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। কোর্ট হাজার হাজার লোকের জনতায় পূর্ণ ছিল। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে কারাবরণ করেন।

তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সমগ্র কলিকাতা শহরে বড়বাজার প্রভৃতি বহু স্থানে হরতাল পালন করা হয়। তিনি তখন বেথুন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। সেজগৎ বেথুন স্কুল ও কলেজে হরতাল পালন করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৫শে জুনের বৈঠক স্থগিত রাখা হয় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুক্তির পরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন।

১৯৩১ সালে কানপুরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। ইন্দুমতী দেবী সেসময়ে কানপুরে ছিলেন। তিনি কানপুরের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীকে জানান যে, তিনি শাস্তির জন্য দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানে কাজ করতে চান। তখনকার দাঙ্গার অবস্থা দেখে গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ইন্দুমতীকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী নিজে শাস্তি স্থাপন করবার চেষ্টা করতে যান এবং সেখানে নিহত হয়ে শহীদ হন। তখন ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা এবং তাঁর স্বামী ও অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য সেখানে কাজ করতে থাকেন।

তদবধি ইন্দুমতী দেবী সমাজসেবার কাজে জড়িত আছেন।

কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি



ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথমদিকে খুব সীমাবদ্ধ হ'লেও, সংগ্রাম যতই জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করে ততই অধিক সংখ্যায় তাঁরা সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময়ে প্রথম অগ্নিযুগের এবং ১৯১৪ সালের দ্বিতীয় অগ্নিযুগের কুরুসাঁধনায় অতি অল্পসংখ্যক নারী সহায়তা করলেও তাব প্রভাব কম ছিল না। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যখন বাসন্তী দেবী, উমিলা দেবী প্রভৃতির প্রেরণা নাবী বাইরে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন তখন দেখা গেল এই অপেক্ষাকৃত সরল পথে দেশসেবা করতে অনেক নারী সহজেই প্রস্তুত। ধীরে ধীরে নারীজাগরণ বেগবান হ'তে থাকে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে এই জাগরণেব বচা কূল ছাপিয়ে ক্রমশঃই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর আস্থানে সাধারণ নারী কাতারে কাতারে বেরিয়ে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য ব'লে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের তিনি বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান করেছিলেন। ভারতের নারী শত শত বছরের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠলেন। যেখানেই স্ববিধা পেয়েছেন সেখানেই তাঁরা সত্যাগ্রহ ক'বে কারাবরণ করেছেন।

১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস-নেত্রী কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের বাইরে ছিল।

সমিতির সভানেত্রী ছিলেন উর্মিলা দেবী ; সহকারী সভানেত্রী—মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গান্ধুলী, নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা দাস এবং হেমপ্রভা দাশগুপ্ত ; যুগ্ম-সম্পাদিকা—শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ; সমিতির সদস্তা—ইন্দুমতী গোয়েন্ধা, সরলাবালা সরকার, অম্বালিকা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, সজ্জন দেবী, মানসনলিনী দেবী, প্রীতি দাস, সুষমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সমিতিতে যোগদান ক'রে বহু বাঙালী, গুজরাটী, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশী, বিহারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশীয় মহিলাগণ সত্যাগ্রহ ক'রে বন্দীজীবন যাপন করেন। অবাঙালী মহিলাগণ প্রধানত ছিলেন কলিকাতা-নিবাসী।

সমিতির কার্যধারা ছিল সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালিত করা, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করা। বডবাজারের সদাশুখ কাটরা, মনোহরদাস কাটরা, পচাগলি, সুতাপটি, গ্রান্ট স্ট্রীট, চাঁদনী, ক্রস স্ট্রীট, বোবাজার ও নিউমার্কেট প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দোকানের সামনে তাঁরা পিকেটিং করতেন।

পিকেটিং-এব প্রভাব এত গভীর হয়েছিল যে, বহু দোকানের বিলাতী মাল বিক্রী তখন একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুঁজিপতিদের বিদেশী মালগুলি গুদাম, কুঠী ও গদাতেই বস্তাবন্দী হয়ে রইল। বডবাজারের বিলাতী বাজার পুলিশ এবং মিলিটারীর ছাউনীতে পরিণত হ'ল। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পুলিশের কড়া দৃষ্টির সামনে মহিলাগণ পিকেটিং করতেন। পুলিশ তাঁদের দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যেতো। পুলিশের ভ্যান সব-সময় বডবাজারে মজুত থাকত গ্রেপ্তার করবার জন্য। কিন্তু পুলিশ ও মিলিটারী ভয় দেখিয়ে নাবীদেব নিবস্ত্র করতে পারেনি। পুলিশ যতই কঠিন শাস্তি দিতে গেছে, নারী ততই মরিয়া হয়ে আরো দলে দলে এগিয়ে এসেছেন।

শোভাযাত্রার একদিনের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালের ২২শে জুন দেশবন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি দিবসে সমস্ত কলিকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। সেদিকে ক্রম্বেপ না ক'রে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সেদিন শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে। শোভাযাত্রা চলেছিল কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। অসংখ্য পুলিশ, সার্জেন্ট ও ঘোড়সওয়ার বেষ্টিত বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল। কলিকাতা শহরের বৃক্কের উপর নারী তখন রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ ক'রে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত-করতে-উগত ঘোড়াকে রুখেছেন তার লাগাম ধ'রে ঝুলে প'ড়ে; আলুথালু কেশ তাঁদের খুলে পড়েছে, দেহমনের অসীম শক্তি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সবিক্রমে আটকাচ্ছেন তাঁরা পুলিশের লাঠিকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে। ঘোড়সওয়ার পুলিশ ও সার্জেন্ট তখন অত্যাচারের নির্মমতা সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেদিনের দৃশ্য বর্ণনার বাইরে—শুধু শে দেখেছে সেই জানে।

কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি

ক্রমে শোভাযাত্রা এসে পৌছাল দেশবন্ধু পার্কে। সেখানেও পার্ক ঘেরাও ক'বে দাঁড়িয়ে আছে বৃটিশ শক্তি। জীবন তুচ্ছ ক'রে অগণিত নরনারী ১৪৪ ধারা ভেঙে পার্কেব ভিতরে প্রবেশ করলেন জলশ্রোতের মতো। সার্জেন্ট, ঘোডসওয়ার ও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের উপর। নারী সেদিন অকুতোভয়ে কখনো ঘোড়াব পদতলে পিষ্ট হচ্ছেন, কখনো গুয়ে পড়ে ঘোড়ার অগ্রগতি ব্যর্থ করছেন, কখনো পুলিশেব বেটনে আহত হচ্ছেন।

এইভাবে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সামনে বক্তাগণ বক্তৃতা দিতে থাকেন। সভানেত্রী উর্মিলা দেবী তাঁব ভাষণে দেশবন্ধুর জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করেন। অবশেষে যুগ্ম-সম্পাদিকা শাস্তি দাস (কবীর) ও বিমলপ্রতিভা দেবীর সঙ্গে বিশাল জনতাবন্দেয়াতবম্ ধ্বনি দিয়ে গগন বিদীর্ণ করেন ও সভা ভঙ্গ হয়।

আবার ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালন উপলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তাও অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা-দিবসের দু'তিনদিন আগেই বহু নেতাকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে। ২৬শে জানুয়ারি প্রাতে কলিকাতার সমস্ত বড় বড় পার্ক এবং অক্টারলোনী মহুমেন্ট অজস্র পুলিশ এবং ঘোডসওয়ার ঘিরে বাধে যাতে সেখানে গিয়ে কেউ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পারে। কিন্তু পুলিশ ও ঘোডসওয়ার বাহিনী অগ্রাহ্য ক'রে, তাদের ব্যয় ভেদ ক'রে শত শত মেয়েবা মহুমেন্টের তলায় পৌছবার জ্ঞা অগ্রসর হন। পুলিশের লাঠিচার্জেব আঘাতে, ঘোড়ার পদতলে বহু নারী আহত ও পিষ্ট হয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ওরই ভিতর থেকে দু'চারজন নারী মাটিতে পড়ে আহত হ'য়েও আবার উঠে দৌড়ে গিয়ে মহুমেন্টের তলায় পৌছেই উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের জাতীয় পতাকা, ঘোষণা করেছেন স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি।

তাবপর শুরু হয় দলে দলে নারী-পুরুষের গ্রেপ্তার। পতাকা উত্তোলন করতে চলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে পথে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড পার হতেই গ্রেপ্তার করে সর্বাগ্রে। সেদিন যদি মহিলাগণ পুলিশের নির্মম নির্ধাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারি ভিতর থেকে ছুটে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করতেন তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের পরাজয়েরই সূচনা করত। কিন্তু ভারতের নারী অপরাজেয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের আপন শক্তি ক্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তি জাগরিত হয়েছে। ঘটনাটি যখন কংগ্রেসের ডিক্টেটার পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে জানানো হ'ল, তিনি বলে উঠলেন, “সাবাস! তোমাদের কাছে এই আশাই তো করেছিলাম।”



লীলা নাগ (রায়)



১৯০০ সালে লীলা নাগ জন্মগ্রহণ করেন আসামের গোয়ালপাড়ায়। পিতৃভূমি তাঁর সিলেটে। তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ ও মাতা কুঞ্জলতা নাগ।

পিতা বাংলা ও আসামের সিভিল সাভিসে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সেবাব্রতী, তেজস্বী ও গ্নায়পরায়ণ। পরবর্তী জীবনে তিনি ভারতীয় আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে লবণ-করের প্রতিবাদে একবছর পরেই পদত্যাগ করেন। মাতামহ প্রকাশচন্দ্র দেব ছিলেন আসাম সেক্রেটারিয়েটের প্রথম ভারতীয় রেজিস্ট্রার। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী।

লীলা নাগের বিদুষী মা শৈশব থেকেই কণ্ঠ্যাকে শিখিয়েছিলেন যে, ত্যাগের মধ্য দিয়েই সেবা করতে হয়। মায়ের শিক্ষায় মহৎ জীবনের আদর্শ কণ্ঠ্যাকে সকল কর্মে প্রবুদ্ধ করত।

পিতা ও মাতামহ সরকারী চাকুরিয়া হওয়া সত্ত্বেও লীলা নাগ শৈশবাবধি ১৯০৫ সাল থেকেই দেখতেন বাডীতে বিলিভী কাপড় বর্জন এবং ‘বঙ্গলক্ষ্মী’র মোটা কাপড় বরাদ্দ হয়েছে। ক্ষুদ্রিরামের ফাঁসির দিনে অশ্রু ও অরক্তনের মধ্য দিয়ে এই পরিবার বাংলার সেই প্রথম শহীদদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কিশোরী লীলা নাগকে তাঁর বাবা, মা ও মাতামহ শোনাতেন দেশবিদেশের কাহিনী এবং নানা দেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস। ম্যাট্রিনি, গ্যারিবন্ডি ও নেপোলিয়ানের জীবনের ঘটনাবলী তাঁর কিশোর মনে গভীর ছাপ ফেলে যেতো। এই আদর্শনিষ্ঠ পরিবারের শিক্ষা লীলা নাগকে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে।

তিনি ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে কলিকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বি.এ. পাস করেন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তাঁর পিতা ঢাকাতে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়তে চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বলে তাঁকে প্রথমে ভর্তির অহুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু লীলা নাগেব দৃঢ়তা ও শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে সহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন ১৯২৩ সালে।

ছাত্রীজীবনেই তিনি নানাপ্রকার সংগঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। বেথুন কলেজের ছাত্রী রি-ইউনিয়ন গড়ে ওঠে যাদের প্রচেষ্টায়, লীলা নাগ তাঁদের অন্ততম।

১৯২১ সালে 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'-র সহ-সম্পাদিকারূপে তিনি নারীর সামাজিক ও আর্থিক অধিকার সম্বন্ধে জনমত গঠনের জন্ত নানা সভাসমিতির আয়োজন করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন লীলা নাগের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকাতে বারোজন সহকর্মীর সঙ্গে 'দীপালী সংঘ' নামে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন তার সম্পাদিকা। 'দীপালী স্কুল' নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'দীপালী সংঘ'-র উদ্যোগে বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল এবং পবে 'নারী শিক্ষামন্দির' ও 'শিক্ষাভবন' নামে আরো দুটি ইংরাজি উচ্চবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। ঢাকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও ব্যবস্থার ব্যাপারে লীলা নাগের অবদান অতুলনীয়।

শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৯২৪ সালে 'দীপালী শিল্প প্রদর্শনী' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনী 'দীপালী সংঘ'-র একটি

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বাংসরিক অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেয়েদের হাতের কাজ, শিল্প ও অগ্নাগ্র কারিগরি কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ত। তখনকার দিনে এরূপ প্রদর্শনী অভিনব ছিল।

১৯২৫ সালে তিনি 'শ্রীসংঘ' নামে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং এই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

১৯২৬ সালে তিনি ঢাকায় 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে একটি ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে এর শাখা বাংলা ও আসামের নানা স্থানে বিস্তৃত হয়।

১৯৩০ সালে মেয়েদের সহজভাবে চলাফেরা এবং মেলামেশা খুব অস্ববিধা-জনক ছিল। মহিলা-কলেজের আবাসিকাগুলির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর ছিল। রাজনৈতিক ভাবাপন্ন ছাত্রীরা বিশেষ অস্ববিধা ভোগ করতেন। এই অস্ববিধা দূর করার জন্ত এবং বিশেষভাবে 'দীপালী সংঘ'-ব সহিত যুক্ত কর্মীদের ও ছাত্রীদের মেলামেশার স্বযোগ সৃষ্টির জন্ত লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ছাত্রীভবন' নামে একটি ছাত্রী-আবাসিকা কলিকাতায় খোলা হয়। এই 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় লীলা নাগের সহকর্মী রেণু সেন অসাধারণ কর্মকুশলতা ও সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন।

১৯২৭-২৮ সালে যখন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক নারীনিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় তখন সে-সম্পর্কে নিগৃহীত নারীদের আশ্রয়দান, তাদের মামলা পরিচালনায় সাহায্য এবং সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে সাহস ও আত্মরক্ষার ভাব উদ্বুদ্ধ করার জন্ত লীলা নাগ 'নারী আত্মরক্ষা ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড খোলেন। মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেবার জন্ত এবং মানসিক শক্তি বিকাশের জন্ত ঢাকায় ও অগ্নাগ্র স্থানে মেয়েদের মধ্যে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, জুজুংসু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেন। ঢাকায় এসব শিক্ষা দিতেন আশুতোষ দাশগুপ্ত, কলিকাতায় পুলিন দাস।

'দীপালী সংঘ'-র মাধ্যমে নারী-শিক্ষার ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করার জন্ত তিনি 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

১৯৩০ সালে লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামে মহিলাদের একটি মুখপত্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এটি মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত ছিল এবং এর লেখকগোষ্ঠীও গঠিত ছিল প্রধানতঃ মহিলাদের দ্বারাই।

বিভিন্ন সময়ে ‘জয়ন্তী’র সম্পাদিকা ছিলেন :

লীলাবতী নাগ (রায়)— বৈশাখ ১৩৩৮—চৈত্র ১৩৩৮, আষাঢ় ১৩৪৫—
চৈত্র ১৩৪৮, ফাল্গুন ১৩৫৩—মাঘ : ৩৫৬, বৈশাখ ১৩৫৭—অষ্টাবধি (১৩৬৯
পর্যন্ত)।

শকুন্তলা দেবী (বায়)— বৈশাখ ১৩৩২—আশ্বিন ১৩৭০ পর্যন্ত।

বীণাপাণি বায়— কার্তিক ১৩৪০—চৈত্র ১৩৪০ পর্যন্ত।

উষাবাগী বায়— বৈশাখ ১৩৪১—চৈত্র ১৩৪২ পর্যন্ত।

(লীলা নাগ যখন জেলে ছিলেন সেসময়ে এঁরা তিনজন সম্পাদিকা
ছিলেন।)

[বৈশাখ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ পর্যন্ত এবং বৈশাখ ১৩৪২—মাঘ ১৩৫৩ পর্যন্ত
সরকার কর্তৃক ‘জয়ন্তী’ প্রচাব বন্ধ ছিল।]

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় লীলা নাগ ঢাকার মহিলাদের নিয়ে
‘ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি’ গঠন করেন। তাঁরা ঢাকা শহর ও জেলার
বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে লবণ তৈরী করে লবণ আইন ভঙ্গ
করেন। এই সময় গান্ধিজীব ডাঙি অভিযান ও তার পটভূমি-সংক্রান্ত তথ্যাবলী
নিষে ৮০টি বিভিন্ন ছবি ও মহাত্মাজীব বাণী এবং চিঠির অঙ্কলিপির স্লাইড তৈরী
করিয়া ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন মাধ্যমে মহিলাগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে
সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহে যোগদান করবার উৎসাহ সৃষ্টি
করেন। বেণু সেন, বীণা বায়, শকুন্তলা চৌধুরী প্রভৃতি কর্মিণ এই ম্যাজিক-
ল্যান্টার্ন পবিচালনায় অগ্রণী ছিলেন।

১৯৩০ সালে ‘শ্রীসংঘ’র দলনেতা অনিল রায়ের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র দলের
পবিচালনাব দায়িত্ব এসে পড়ে লীলা নাগের উপর।

১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর লীলা নাগ ও বেণু সেনকে ডেটিনিউ করে
জেলে আটক রাখা হয়। এই সময় লীলা নাগের আরো যেসমস্ত মহিলা
সহকর্মী ডেটিনিউ অর্থাৎ বাজবন্দীরূপে কাবারুদ্ধ ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সুনীলা
দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত ও হেলেনা দত্ত। লীলা নাগ রাজবন্দী হবার পব শকুন্তলা
বায়, স্ববমা দাস প্রভৃতির উপর বাংলাদেশ হ’তে বহিষ্কারের আদেশ হয়। এঁরা
ছাড়া তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উষা রায়, বীণা রায়,
সীতা সেন, অম্বপমা বসু, লতিকা দাস (সেন), রেণুকণা দত্ত প্রভৃতি। বেণু
সেনের ছিল সংগঠনী শক্তি এবং শকুন্তলা দেবীর ছিল তীক্ষ্ণদী ও যুক্তিবাদী মন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লীলা নাগ মুক্তি পান। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ ও অনিল রায় পরস্পরকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন।

এই সময় গুপ্ত বিপ্লববাদের যুগ শেষ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়। লীলা রায় ও অনিল রায় তখন জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রকাশভাবে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গ'ড়ে তোলার কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দিগণ ব্যাপকভাবে মুক্ত হন তখন কংগ্রেস ও তার কাষাবলীকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার প্রস্ন এল। সেসময় রাজনৈতিক মহিলাগণ একটি সম্মিলিত সংস্থাতে মিলিত হবার কথা চিন্তা করেন। প্রদেশের বিভিন্ন কংগ্রেস-মহিলা-কমীদেব আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাক্ষাৎ সংযোগ রক্ষা করা হবে, 'কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটি'র মারফত। 'কংগ্রেস মহিলা সাব কমিটি' পূর্বেই গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। লাবণ্যলতা চন্দ ছিলেন তাব সেক্রেটারি।

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি লীলা নাগ উত্থাপন করেন এবং কংগ্রেস কর্মিগণ সাগ্রহে সমর্থন করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এই পরিকল্পনাকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত মহিলাদের নিয়ে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন' অগ্ৰস্তিত হয়। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তার সভানেত্রী নির্বাচিত হন মোহিনী দেবী এবং সেক্রেটারি লাবণ্যলতা চন্দ।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে বাংলা কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। তার ফল-স্বরূপ 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ'-র কাজ একবছরের বেশী অগ্রসর হ'তে পারে নাই।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক যে 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠিত হয়, সেই কমিটিতে লীলা রায় বাংলাদেশ থেকে মহিলা-সাব-কমিটির সভ্য মনোনীত হন এবং পরিকল্পনা-কমিশনের কাছে বাংলার তরফ থেকে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হয়। লীলা রায় ও অনিল রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

অগ্রতম সহযোগীরূপে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের সহকর্মীরাও সকলেই ‘ফরওয়ার্ড ব্লকে’ যোগদান করেন।

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হলওয়েল মহুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে লীলা রায় ও অনিল রায় কারাবরণ করেন। সকলেই মুক্তি পান, কিন্তু স্বভাষচন্দ্র কারাস্তুরালে রয়ে গেলেন। তাঁরই নিদেশে লীলা রায় মুক্তিবাদের পর ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। নেতাজীর ভারত-ত্যাগের পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি এই কাগজের সম্পাদনা করেন।

অন্তর্ধানের পূর্বে নেতাজী যে নির্দেশ দেন, সে অনুযায়ী লীলা রায় ও অনিল রায় ১৯৪০-৪১ সালে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ গঠন করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের জন্য ব্যাপকভাবে সফর করেন। ১৯৪১ সালে লীলা রায়ের উপর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা ও বাংলাব বাইরে যাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে অনিল রায়কে কারারুদ্ধ করা হয়।

ক্রিপ্স্ মিশন ব্যর্থ হবার পর ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সারা ভারতের ফরওয়ার্ড-ব্লকের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হ’তে থাকে। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে লীলা রায়কে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক রাখা হয়। ‘জয়শ্রী’ আফিস পুলিশ তালা লাগিয়ে বন্ধ ক’রে দেয় এবং সমস্ত জিনিসপত্র কোক করে। এবারে লীলা রায়ের সহকর্মীদের মধ্যে যারা জেলে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন লাভণ্য দাশগুপ্ত, হেলেনা দত্ত, শৈল সেন, গৌরী সেন, প্রভা মজুমদার, উমা গুহ, ছায়া গুহ ও আশা রায়। লীলা রায়কে প্রথমে দিনাজপুর জেলে ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান।

আবার তিনি ‘জয়শ্রী’ ও ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার সাধারণ আসন থেকে তিনি ভারতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে কলিকাতা ও নোয়াখালিতে দাঙ্গার পর লীলা রায় চলে যান নোয়াখালিতে—দুর্গতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে। তিনি ‘গ্রাশনাল সাভিস ইন্সটিটিউট’ নামে একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গ’ড়ে তোলেন এবং তারই সম্পাদিকা রূপে সেখানে শান্তি ও সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

এর পরেই আসে ভারত-বিভাগের দুর্যোগ। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। লীলা রায়েব সারাজীবনের প্রিয় কর্মভূমি ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ ছেড়ে তাঁকে চিরকালের জন্য চলে আসতে হ'ল।

তার অদম্য প্রাণশক্তি এবং আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে তিনি অগ্নাবধি জনসেবার কাজে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখে চলেছেন। বর্তমানে তিনি 'প্রজা সোশ্যালিস্ট' দলের সভানেত্রী।

হৃদয় ও মনের বহু উচ্চগুণে বিভূষিতা লীলা রায়কে রাজনৈতিক বাংলার, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার নারীপ্রগতির ইতিহাসে অনেক বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়।

কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)

★



১৯০৭ সালের ২৮শে মে তাবিখে কল্যাণী দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন কটকে।
তাব পিতা বেণীমাধব দাস, মাতা সবলা দাস, ছোট ভগ্নী বীণা দাস। পিতৃভূমি
তাঁদের চট্টগ্রাম।

দুই ভগ্নী কল্যাণী ও বীণার জীবনে গভীর প্রভাব ছিল তাঁদের পিতামাতার
এবং বড়মামা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের। পিতামাতাব নিকট থেকেই
শুনতেন তাঁরা বড়মামাব মহৎ চবিত্রকথা। পিতাব কাছ থেকে কল্যাণী ও বীণা
ছোটবেলায় বসে বসে শুনতেন সমাজ বিপ্লবীদের জীবনী। একটা আদর্শের
জন্তু মাঝে মাঝে যে কত বড় ত্যাগ স্বীকার নিজেব জীবনে কবতে পাবে সে-শিক্ষা
তাঁরা পিতার নিকটেই লাভ করেন।

পিতার ছিল অজস্র নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবাহ। অত্যায়েব কাছে মাথা নত করতে
তিনি জানতেন না। কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলেব প্রধান শিক্ষক থাক-
কালে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল যে, তিনি স্কুলে রাজদ্রোহ প্রচার
করেন। ফলে বদলি হন তিনি কৃষ্ণনগরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের
ভিত্তি গ'ড়ে ওঠে ঐ আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ছাত্ররূপে কটকের স্কুলেই।

মায়ের ছিল সংগঠনী শক্তি। দুস্থ নারীদের জন্ত 'পুণ্যাশ্রম' তাঁর একার

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

চেষ্ঠায় গড়ে উঠেছিল। ভাই বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের প্রতিষ্ঠিত নীতি-বিদ্যালয় তিনি বহুদিন পরিচালনা করেন। জাতির চরিত্রগঠনের কাজে সে-যুগের নীতি-বিদ্যালয়-এর প্রভাব ছিল স্বদূরপ্রসারী।

এমন পিতামাতার সন্তান কল্যাণী দাস ও বীণা দাস যতই বড় হ’তে লাগলেন ততই পরাধীনতার শ্রানি তাঁদের গভীর পীড়া দিতে থাকে। তাঁরা গতানুগতিক জীবনে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি।

কল্যাণী দাসের ছিল মায়ের মতোই সংগঠনীয় ক্ষমতা। ১৯২৮ সালে বি.এ. পাস করবার পর তিনি ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. পড়তে যান। ঐ ১৯২৮ সালেই কল্যাণী দাস তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু সুরমা মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতির সহযোগিতায় ‘ছাত্রীসংঘ’ সংগঠন করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র, সম্পাদিকা কল্যাণী দাস। কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এই ‘ছাত্রীসংঘ’ গঠিত হয়। তখনকার দিনে ছাত্রীদের মধ্যে অতবড় সংঘ বোধহয় আর ছিল না। প্রাতিলতা ওষাদ্দাদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, সূহাসিনী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্তী দিনের রাজনৈতিক কর্মিগণ এই ‘ছাত্রীসংঘ’র সক্রিয় সদস্য দিলেন। যুগান্তর-দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী দৌনেশ মজুমদার এই ‘ছাত্রীসংঘ’র মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন। পরে দৌনেশ মজুমদারের বিপ্লবী কাজের জ্ঞান ফাঁসী হয়ে যায়। ‘ছাত্রীসংঘ’র পক্ষ থেকে পাঠচক্র, সাতার-শিক্ষা, সাইকেল চড়া শিক্ষা, ফাস্ট-এইড শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজনীতির দিক থেকে এই সংঘের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান করবার আহ্বান জানালেন কল্যাণী দাস ও তাঁর সহকর্মিগণ। তাঁরা যখন বেথুন কলেজ বন্ধ করবার জ্ঞান কলেজ-গেটে পিকেটিং আরম্ভ করেন তখন দলে দলে ছাত্রীরা এসে পিকেটিং-এ যোগ দেন। এখানে পিকেটিং করবার সময় একদিন পুলিশ তাঁদের একদলকে গ্রেপ্তার ক’রে একটা ভ্যানে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে একটা ভাঙা বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসে। সেই নির্জন স্থান থেকে হেঁটে ফিরে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা আবার সেই বেথুন কলেজ গেটের সামনে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের সামনে পেয়ে অগ্নাগ্র ছাত্রীরা মহা উল্লাসে সম্মুখে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি ক’রে উঠলেন।

একদিন তাঁরা বেথুন কলেজে পিকেটিং করছিলেন এমন সময় ইলা সেন

নামে বেথুন কলেজের একটি ছাত্রী পিকেটার এসে খবর দিলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে ছাত্র-পিকেটারদের উপর নাকি গুলীচালনা করা হবে। তৎক্ষণাৎ কল্যাণী দাস ও তাঁর একদল সাথী বেথুন কলেজ গেট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে চলে গেলেন। ছাত্র-পিকেটারদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা পিকেটিং করতে লাগলেন। পুলিশ লাঠিচার্জ ক'রে ভেঙে দিতে গেল ব্য্থ, কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলী করা আর সম্ভব হ'ল না।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে কল্যাণী দাস ও অন্যান্য কর্মিগণ শোভাভাত্রায় যোগ দিয়ে বডবাজারে বিলিভী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি হাজরা পার্কে একটি বে-আইনী সভা অস্থিত কবতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং আটমাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালের শেষে তিনি মুক্তি পান।

ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে আসেন ১৯৩২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। কল্যাণী দাস জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে এবার বিপ্লবী কাজে যুক্ত হলেন। এই সময় বহু পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবী কর্মী কারার অন্তরালে বন্দী ছিলেন। পরিচালকহীন ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বাইরে ছিলেন তাঁদের অনেককে একত্রিত ক'রে পুনর্গঠন ও কর্মপরিচালনার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হন দীনেশ মজুমদার। কল্যাণী দাস পুনর্গঠন করতে থাকেন মেয়েদের।

দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি পলাতকদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা, পুলিশের দৃষ্টি থেকে বে-আইনী জিনিস গোপন রাখা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে কল্যাণী দাসের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী মেয়েরাও এগিয়ে এলেন। এই মহিলা-কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সুলতা কর, আভা দে, সূহাসিনী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, লীলা কামলে, স্মৃতিপা দেবী, অমিয়া দেবী প্রভৃতি।

দীনেশ মজুমদার তখন কলিকাতায় অথবা পুুলিয়ার দিকে নানা স্থানে অথবা চন্দননগরে পলাতক হয়ে ফিরছিলেন। একবার তিনি ঝরিয়ার কয়লার খনির মজুর সেজেও কাজ করেছিলেন। চন্দননগরে থাকাকালে ১৯৩৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চাতে ধাবমান করাসী পুলিশ-কমিশনার কুইন্সকে গুলীতে নিহত ক'রে ছুটে পালিয়েছিলেন তিনি গঙ্গার দিকে। সেখানে কৌপীন প'রে গাঁজাখোর সাধুদের সঙ্গে জুটে এপারে পৌছে আশ্রয় নিয়েছেন গিয়ে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

একটা ঘোড়ার আস্তাবলে। ঘোড়ার দানা খেয়েই ৩৪ দিন কাটিয়ে অবশেষে কলিকাতার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। তখন বিপ্লবী বন্ধু নারায়ণ ব্যানার্জী তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটি বাজী ভাড়া ক'রে সেখানে আশ্রয় দিলেন দীনেশ মজুমদারকে।

অথাভাব নগ্নমূর্তিতে দেখা দিল। মহিলা কমিগণ নিজেদের কর্মের অবসরে গৃহশিক্ষকতার কাজ ক'রে অর্থের অনটন ঘোচাতে চেষ্টা করতেন। ওদিকে পুলিশ জানতে পারলেই গৃহকর্তাকে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসত। ফলে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজও বন্ধ হয়ে যেতো।

বিপ্লবী কাজেব ৬৭ বছ অর্থের তখন প্রয়োজন ছিল। দীনেশ মজুমদারের বন্ধু কানাই ব্যানার্জী ছিলেন গ্রীণ্ডলে ব্যাক্সের কর্মচারী। '১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে জাল সই দ্বারা উক্ত ব্যাক্স থেকে সাতাশ হাজার টাকা তুলে আনা হয়। একমাত্র কানাই ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে তাঁকেও মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে রাজবন্দী ক'রে জেলে আটক রাখা হয়।

পুলিস এই সময় সন্দেহবশে বড় পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। এই ব্যাপারে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হবার পর শাস্তিস্থধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী ও স্থলতা কর অন্তরীণ রইলেন। লীলা কামলে ছিলেন মারাত্মী মেয়ে। তাঁকে বাংলাদেশের বাইরে বহিস্কার (externed) করা হয়।

দীনেশ মজুমদারের ছিল প্রগাঢ় আদর্শনিষ্ঠা ও দরদী প্রাণ। গ্রীণ্ডলে ব্যাক্সের টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে ওই টাকা খরচ করতে তিনি রাজী ছিলেন না—অস্বস্থ হয়েও নয়। তিনি জানতেন এবারে গ্রেপ্তার হ'লে ফাঁসী তাঁর অনিবার্য। তিনি ভালহাউস স্কোয়ারে টেগার্টের উপর বোমা ফেলার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বন্দী ছিলেন এবং সেই বন্দী অবস্থায় তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন কুইন্স-হত্যা এবং গ্রীণ্ডলে ব্যাক্সের মামলার আসামী। তিনি জানতেন পলাতক জীবনে গ্রেপ্তার করতে এলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে হয় সেখানেই মৃত্যুকে বরণ করবেন, না-হয় পরাজিত হ'লে ফাঁসীর দড়িটি হাসিমুখে গলায় তুলে নেবেন। বাঁচিয়ে রাখা তাঁকে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ নিজেকে কেবল নীরবে নিশ্চিহ্ন ক'রে বিলিয়ে

দিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে সত্যই একদিন পুলিশ তাঁদের অবস্থান জানতে পাবল। ১৯৩৩ সালের ২২ মে তারিখে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে পুলিশের সঙ্গে দেখেছিল তাঁদের থওয়ুদ্ধ। যুদ্ধ করতে কবতে হাতের সমস্ত গুলী যখন ফুবিয়ে গেল তখন দীনেশ ও তাঁর সহকর্মীগণ আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে যান।

অতগুলি গুরুতব মামলার অপরাধেব জন্ম বৃটিশের আইনে লেখা ছিল ফাঁসীই একমাত্র শাস্তি। দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম আদর্শের জন্ম নতমস্তকে চবম শাস্তি গ্রহণ কবে—মানবজাতি সজল নয়নে স্মরণ করে সেই অমর মৃত্যুকে। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন গভীর রাত্রে। দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পবে কল্যাণী দাস গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালেব শেষে তাঁকে হিজলী ও মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দী ক'রে রাখা হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৯৩৮ সালেব প্রথমে মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যেব সঙ্গে কল্যাণী দাসের বিবাহ হয়।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩৪৫ সালেব ১লা বৈশাখ) তিনি মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের মুখপত্র 'মন্দিরা' প্রকাশ কবেন। এই পত্রিকাতে তিনি নিজে সম্পাদিকাব পদ গ্রহণ না করলেও, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সমস্ত সংগঠনই তিনি কবেন।

শুধু 'মন্দিরা' পত্রিকা নয়, ১৯৩৮ সালে তিনি 'ছাত্রীসংঘ'কেও পুন-রুজ্জীবিত কবেন।

এই সময় ছাত্রীসংঘ ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মহাসিনী চ্যাটার্জী। প্রায় ৪০ বছর বয়সের কাছাকাছি এই মহিলার অদম্য সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। গৃহের শত অসুবিধাও তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা ঘরের বৌকে বাইরে নিয়ে এল। তিনি নিজে সাইকেল চডতে শিখে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। পাড়ার লোকে 'ছিঃ ছিঃ' ক'রে তাঁকে টিল ছুঁতে লাগল। নিন্দা তাঁর তেজকে স্পর্শ করতেও পারেনি। তাঁরই জয় হ'ল।

১৯৪০ সালে কল্যাণী ভট্টাচার্য বম্বে চলে যান স্বামীর কর্মস্থলে। সেখান কার সিভিল লিবার্টি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। সেই সময় বম্বের আশিটি মহিলা-প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে যে যুক্ত সমিতি গঠিত হয় তার মধ্যে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি বন্দিতে তিন মাসের জন্ম কারাবরণ করেন।

মুক্তির পরে চলে আসেন তিনি কলিকাতায়। বাংলায় এসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে শোচনীয় দৃশ্য তিনি দেখলেন তারপর আর স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরতুঃখকাতব হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রায় এক-বছর তিনি বাংলাদেশের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে পযবেক্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যাগ্টি-ডিজিজ বিভাগ খুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলিতে বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার, স্বৈচ্ছাসেবক ও স্বৈচ্ছাসেবিকাগণ সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। সেখানে গুয়ুধ, বস্ত্র ও চাউল বিতরণ করা হ'ত।

'জীবন অধ্যয়ন' নামক আত্মচরিতে তিনি তার দরদী হৃদয়ের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছেন। আজও সেবা, শিক্ষাপ্রচাব ও নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে বেখেছেন।

আশালতা সেন



১৮৯৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশালতা সেন। তাঁর পিতা বগলামোহন দাশগুপ্ত নোয়াখালি জজকোর্টের উকিল ছিলেন; মাতা মনোদা দাশগুপ্ত। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে বিদগাঁও গ্রামে।

ছোটবেলা থেকেই আশালতা সেনের কবিতা রচনা করার অভ্যাস ছিল। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয ১৯০৭ সালে। সেই বছরেই ‘অন্তঃপুর’ নামক এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর একটি জাতীয়তাবাদমূলক কবিতা তখনই লোকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বয়স তখন তাঁর মাত্র দশ বৎসর। এই সাহিত্যাত্মরাগ তার জীবনে ক্রমে বিকশিত হয়। পরিণত বয়সে তিনি বাম্মৌকির মূল রামায়ণ থেকে ‘যুদ্ধকাণ্ড’টি সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা কবিতায় অলুবাদ ক’রে প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কাজে পরিণত হয় তখন আশালতা সেনের মাতামহী নবশশী দেবী, স্মৃণীলা সেন, কমলে-কামিনী গুপ্তা প্রভৃতি মহিলাগণ ‘মহিলা সমিতি’, ‘স্বদেশী ডাঙার’ ইত্যাদি স্থাপন ক’রে বিক্রমপুর অঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে উদ্যোগী হন। এই সময় নবশশী দেবী বিলাতী-বর্জনের সংকল্প-পত্র দোহিত্রী আশালতাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে স্বদেশীব্রতে দীক্ষিত করেন এবং গ্রামের মেয়ে ও বোদের স্বাক্ষর করার ভার নাতনী আশালতাকেই দেন। ১১ বছর বয়সের মেয়েটি গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বাক্ষর করাতে থাকে। এই তাঁর প্রথম দেশের কাজ।

ক্রমে দিদিমা নবশশী দেবীর প্রেরণায় আশালতা সেন টাডের রাজস্থান, শিশুযুদ্ধের ইতিহাস, মণিপুরের টিকেজ্জিতের কাহিনী, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী ইত্যাদি নানা পুস্তক পাঠ করতে থাকেন; ওরি মধ্যে কখন তাঁর মানস-লোকে নিজের দেশের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষার বীজ উগ্ধ হয়ে যায়।

‘অল্পবয়সেই তাঁকে সংসারজীবনে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। সংসারজীবন যাপনের কয়েক বছর পরে ১৯১৬ সালে তাঁর স্বামী সত্যরঞ্জন সেনের

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

অকালমৃত্যুর পর তিনি একটি শিশুপুত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় পতিত হন।

১৯২১ সালের অসযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি তখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় তাঁর স্বশ্রমদাশয়ের সহায়তায় নিজেদের বাড়ীতে মহিলাদের জন্য ‘শিল্পাশ্রম’ নামে একটি বথনাগার তিনি স্থাপন করেন।

তিনগানা ফ্লাই-শাটল্ তাঁত যখন মহিলাদের হাতে সশব্দে চলতে থাকত তখন সেই তাঁত-বোনার সঙ্গে সারা পাড়াময় যেন গান্ধীজীর বাণী ও খদ্দের কথাই প্রচারিত হ’ত। মহিলাদেব নিজেদেব হাতে তাঁত বোনার কাজ দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল। পাড়ার মহিলাগণ এই খদ্দের বোনার কাজ দেখতে ভীড় করে এসে দাঁডাতেন।

১৯২২ সালে ঢাকা জেলার মহিলা প্রতিনিধিরূপে তিনি ডেলিগেট হয়ে যোগদান করেন গয়া কংগ্রেসে। সেই অবধি কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং গান্ধীজীর বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে তিনি সরমা গুপ্তা ও সরযুবালা গুপ্তার সহযোগিতায় ‘গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি’ সংগঠন করেন। সমিতির মহিলাগণ নিজেরাই খদ্দের বোঝা কাঁধে নিয়ে অনেক দূরে দূরে চলে যেতেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে খদ্দের বিক্রি ও প্রচারকাৰ করতেন। সমিতির বার্ষিক শিল্পমেলাতে একটি ‘গান্ধীমণ্ডপ’ তৈরী করা হ’ত। তাতে বুদ্ধদেব থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত মূর্তি ও ছবি রাখা হ’ত। কিভাবে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার বাণী গান্ধীজীর ভিতর দিয়ে বর্তমান যুগে নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে-সম্বন্ধে মেলায় সমবেত লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া হ’ত। এই ‘গান্ধীমণ্ডপ’টি সকলের নিকট একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।

১৯২৫ সালে আশালতা সেন নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের (A.I.S.A.) সদস্য হন এবং ব্যাপকভাবে খদ্দের-প্রচারে ব্রতী হন।

১৯২৭ সালে ঢাকায় মহিলা কর্মী তৈরী করার জন্য তিনি ‘কল্যাণ কুটির আশ্রম’ স্থাপন করেন। আশ্রম-গঠনে তাঁর স্বশ্রম এবং ‘বিদ্যাশ্রম’-এর প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই উভয়ের নিকট থেকে তিনি সহায়তা পান।

১৯২৯ সালে গেণ্ডারিয়ার নিকটবর্তী জুডান নামক একটি নমঃশূদ্রপ্রধান গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় তিনি ‘জুডান শিক্ষা-মন্দির’ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলে তাঁরা ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে অল্পমত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের চিত্ত আকৃষ্ট করতেন এবং গ্রামবাসীদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়াস পেতেন। তাদেরও যে শিক্ষা পাবার, উন্মোচিত হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার অধিকার আছে এইসব ছবি যখন তারা চোখের সামনে দেখত তখন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হ’ত। তারা এক অনাগত স্বথের স্বপ্ন দেখত যেদিন তাঁদের মতো দুঃস্থ এবং অবহেলিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও শিক্ষিতের সম্মানে সম্মানিত হবে, সকল মানুষের ভালবাসা পাবে। এর মধ্য দিয়ে তারা চিনে নিত গান্ধীজীকে, ভালবাসত তাঁর আদর্শকে এবং কংগ্রেসকে। ‘জুডান শিক্ষা-মন্দির’-এর ক্রমবিকাশের কাহিনী সবমো গুপ্তার জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ আশালতা সেন ও সবমো গুপ্তা তাঁদের সহ-কর্মীদের নিয়ে ঢাকায় ‘সত্যগ্রহী সেবিকাদল’ সংগঠন করেন। তাঁরা এইসব কর্মী দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ১৩ই এপ্রিল নোবাখালি গিয়ে আশালতা সেন, সরমা গুপ্তা, উষাবালা গুহ প্রভৃতি লবণ আইন অমান্য করেন। নোবাখালি থেকে বে-আইনী লবণজল তাঁরা ঢাকায় নিয়ে এলেন। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে কব্রোনেশন পার্কের বেদীর উপর উত্তন জালিয়ে তাঁরা যখন একটি মুংপাত্রে লবণ জাল দিতে থাকেন তখন হাজার হাজার লোকের সমুদ্র যেন প্রবল উৎসাহে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। লবণ তৈরীর পর কাডাকাড়ি পড়ে গেল কে কত তাড়াতাড়ি বে-আইনী লবণ কিনে আগেভাগে গ্রেপ্তার হ’তে পারবেন। এইভাবে তাঁরা লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হন সত্যগ্রহী সরযুবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু ও প্রতিভা সেন।

১৯৩০ সালের বিভিন্ন সময়ে আশালতা সেন ঢাকার বাইরে গিয়েও কংগ্রেস আন্দোলনের প্রচারকার্য পরিচালিত করেন। শ্রীহট্টের সরলাবালা দেবের আহ্বানে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীহট্টের বহু জায়গায় সত্যগ্রহ সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রচারকার্য করতে থাকেন। ঐ উদ্দেশ্যেই স্বধাময়ী দাশগুপ্তের আহ্বানে তিনি ময়মনসিংহ ও জামালপুরে যান এবং পঞ্চজিনী দেবীর আহ্বানে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী

চাঁদপুরে যান। তাঁর আঁহানে জনসাধারণ গান্ধীজী ও কংগ্রেসেব প্রতি একটা চুষ্বেব আকর্ষণ বোধ কবত, তাঁবা আন্দোলনে ঝাঁপ দিত দলে দলে।

১৯৩১ সালে আশালতা সেন ‘বিক্রমপুৰ বাঙ্গীয় মহিলা সংঘ’ সংগঠন কবেন। এই সংঘেব বড় শাখা তিনি বিক্রমপুৰেব নানা স্থানে পবিত্রমণ ক’বে স্থাপন কবেন। ফলে ১৯৩২ সালেব আইন অমান্ত আন্দোলনে বিক্রমপুৰেব মহিলাগণ বড় সংখ্যাব যোগদান কবাব প্রেরণা লাভ কবেন ও কাঁবাবণ কবেন। এই সমব গ্রানেব পব গ্রাম পবিত্রমণ ক’বে যেতে যেতে আশালতা সেন ও তাঁব সহকর্মিগণ দুপবে ও সন্ধ্যাব যেমন হিন্দুবাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ কবতেন তেমনি কখনো কখনো মুসলমান বাড়ীতেও আশ্রয়-গ্রহণ কবতেন। হিন্দু মুসলমান নবনাবী নির্বিশেষে সকলেবই কংগ্রেসেব প্রতি এত সহানুভূতি ছিল যে, সবদ্রই তাঁবা সমাদব ও সহযোগিতা পেযেছেন।

এইসময়কাব একটি কল্প কাহিনী আছে। একদিন দুপবে তাঁবা একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি মুসলমান তাঁতী-বাড়ীতে তাঁবা আশ্রয়গ্রহণ কবেন। আশালতা সেন দেখলেন একটি সত্ত্ববিধবা মুসলমান বধু তাঁতেব কাপড় বুনবাব জন্ত ‘তানা হাটছেন’। তাঁব বৃদ্ধা শান্তুড়ী বাড়ীব এককোণে বসে ১০।১২ দিন পূর্বে মৃত যুবকপুত্রেব জন্ত উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন কবছেন। বিধবা বৃটি আশালতা সেনকে দেখে তাঁব ‘তানা হাটা’ কিছুক্ষণেব জন্ত বন্ধ বেখে কাছে এসে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়ে তাঁর সত্ত্ববিধবেব কাহিনী বললেন। কিন্তু দবিজ্রেব শোক কববাব জন্তও সমব নাই। তিনি তখনি আবাব ‘তানা হাটতে’ উঠে গেলেন। কারণ ঐ ‘তানা হেটে’ তিনি যা উপার্জন কববেন তাই দিয়ে তাঁব ২০টি শিশু-সন্তানসহ নিজেব অন্নসংস্থান হবে। কাজেই সত্ত্বমৃত স্বামীব জন্ত বুক ভেঙে গেলেও কিছুক্ষণ বসে বুক হালকা কববাব অবসব তাঁব নাই। তাঁক দেহে একটি অনাগত শিশুব শীঘ্র আবির্ভাবেব সন্তাবনা স্পষ্ট। এই কল্প দৃশ্যটি আশালতা সেনেব মনে চিবদিনেব মতো গাঁথা হযে যায়।

১৯৩১ সালেব আগস্ট মাসে ঢাকাতে আশালতা সেন ‘নাবীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র’ স্থাপন কবেন। শিক্ষাকেন্দ্রেব শিক্ষাদাতার আসন গ্রহণ করেন মানভূমেব কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কর্মীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং এমন প্রেরণা

দিতেন যে, কর্মিগণ আন্দোলনের সময় প্রচারকার্যের সঙ্গে কর্মপ্রেরণা বিস্তার করতে করতে দলে দলে নতুন কর্মীসহ গ্রেপ্তার হতেন। এই শিক্ষা-শিবিরে এসে ঢাকা শহর ও বিক্রমপুরের প্রায় ৫০ জন কর্মী শিক্ষা-গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীহট্টেরও চারজন মহিলা ছিলেন।

প্রথমে মেদিনীপুরে কাঁথির একটি গ্রামে এরূপ নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। তা শুনে ঢাকার এবং পরে শ্রীহট্টের কর্মিগণও এরূপ শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। তিন জায়গারই শিক্ষাগুরু ছিলেন নিবারণ দাশগুপ্ত। পিতাকে ঘিরে বসে যেমন ক'রে মেয়েরা তন্ময় হয়ে গল্প শুনে শিক্ষাগ্রহণ করে ঠিক তেমনি ক'রে এই পিতাসম গুরু তাঁদের শিক্ষা দিতেন। মেদিনীপুরের শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি একবার এরূপ শিক্ষাদান-কালে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, মেয়েরা মন্তমুন্দের মতো ঋষিকল্প নিবারণ দাশগুপ্তের কথা শুনছেন,—কারো মাথার কাপড় সরে গেছে, কারো বেশবাস অসম্মত, কেউ সম্মানকে স্তম্ভপান করাচ্ছেন কিন্তু সেদিকে তাঁদের আক্ষেপও নেই—কেবল একাগ্রমনে গুরুর কথা শুনেই যাচ্ছেন। হঠাৎ সেসময়ে বাইরের লোক উপস্থিত হওয়ামাত্র কর্মীরা লজ্জা ও সঙ্কোচে বিব্রত ও সজাগ হয়ে উঠলেন। ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত ও সংসারী আগন্তকের মধ্যে এই ছিল পার্থক্য। যে কয়েকটি কারণে মেদিনীপুর, ঢাকা ও শ্রীহট্টের মহিলা-কর্মিগণ এত অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগদান করার ও কারাবরণ করার প্রেরণা লাভ করেন তার মধ্যে গুরু নিবারণ দাশগুপ্তের শিক্ষা ও প্রেরণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরে ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ব্যাপকভাবে সভা-সমিতি দ্বারা প্রচারকার্য চলতে থাকে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসেই 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি'কে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং 'কল্যাণ কুটির'-এর কর্মীদের আবাসগৃহও পুলিশ তালাবন্ধ ক'রে রাখে। সেই সময় আশালতা সেন শুধু ঢাকা শহরের নয়, বিক্রমপুরের অনেক মহিলাদেরও ঢাকায় এবং অগ্ন্যাত্ন স্থানে এনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন। তিনি বিক্রমপুরের নশ্বর গ্রামে গিয়ে স্থানীয় কর্মী কিরণবালা কুশারী ও প্রভাসলক্ষ্মী দেবীর সহায়তায় 'নশ্বর মহিলা শিবির' স্থাপন করেন, এবং তিনি বিক্রমপুরের মহিলাদের নিকট থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পান। গ্রেপ্তারের কিছু পূর্বে সরযুবালা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নাবী

সেনের উপর তিনি ‘নশঙ্কব মহিলা শিবিব’ পবিচালনাব ভার অর্পণ করেন।

এই গ্রাম পবিভ্রমণ-কালে তাঁবা গ্রাম্য দফাদাবদেব যথেষ্ট সহানুভূতি পেতেন। আশালতা সেন তখন বিক্রমপুবে দৈনিক ৪৫টি গ্রামে বক্তৃতা দিখে ঘূবতেন। গ্রামেব সবকাবী দফাদাবেবা মিটিং-এ ব’সে খুব আগ্রহেব সঙ্গে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনত। তাবপব ধীবে স্ত্রে উঠে থানাব গিয়ে এমন সময় সবাদ দিত যে, থানাব লোক আসবাব আগেই সভার কাজ শেষ হযে থেত। কংগ্রেস আন্দোলনেব প্রতি দফাদাবদেব একপ সহানুভূতি না পেলে তাঁদেব পক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিনেব পব দিন অজস্র মিটিং কবা অনেকসমবই দুঃসাধ্য হ’ত। দফাদাবদেব মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন।

তাবা বখন গ্রামেব পর গ্রাম এইভাবে শত শত লোকেব ভিতব বক্তৃতা দিখে অগ্রসব হ’তে থাকতেন তখন আশালতা সেন ও তাঁব সহকর্মিগণ শেষবাত্রে এক গ্রাম ছেড়ে বওনা হতেন এবং সন্ধ্যাব পব যে গ্রামে পৌছাতেন সেখানে সাবাদিনেব পব বিশ্রাম গ্রহণ কবতেন। মাঝখানে কেবল ছপুবে কোনো গ্রামে থেবে নিতেন। বাতেব বিশ্রামেব পব পুনবায় পবদিন প্রত্যষেব যাত্রা। তপুবেব থাবা এবং বাতেব বিশ্রাম ছাড়া তাঁদেব ছিল প্রায় অবিবাম যাত্রা। ১৯৩২ সালেব ৬ই জানুযাবি থেকে আবস্ত ক’বে ৭ই মার্চ গ্রেপ্তাব হওয়াব পূব পযন্ত তিনি ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬১টি গ্রামে ও শহবে ঝাডেব বেগে ঘূবে আন্দোলন পবিচালনা ক’বে গেছেন, কিন্তু তাতে তাঁব কখনো ক্লান্তি বা অবসাদ আসে নাই অথবা অস্থগও করে নাই। তাঁব ছিল অফবস্ত কর্মপ্রেবণ।

ঢাকা জেলাব যেসব সত্যাগ্রহী ১৯৩২ সালেব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কাবাববণ কবেন তাঁদেব মধ্যে অনেকেই আশালতা সেনেব প্রচেষ্টায় আন্দোলনে যোগদান কবেন।

‘সত্যাগ্রহী সেবিকাদল’-এর কর্মিগণ ঢাকা জেলার ১৩৫টি গ্রামে ঘূবে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। কারারুদ্ধ মহিলা ছাড়াও বহুসংখ্যক মহিলা আন্দোলনে যোগদান কবার ফলে পুলিশেব হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেন। পুলিশ অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার ক’বে বহুদূবেব গ্রামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। অনেকেকে গ্রেপ্তার না ক’রে তাঁদের পচাতে এমন-ভাবে ধাওয়া কবত যেন তাঁরা কোথাও আশ্রয় না পান। সুরবালা

সেনের পরিচালনায় শোভাযাত্রাকারী এমনি একদল মহিলাকে পুলিশ দুইদিন দুইরাত্রি ধবে সঙ্গে সঙ্গে থেকে অবিরাম মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে ঘোরাতে থাকে। অবশেষে তাঁদের একটা নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে মাঘ মাসেব শীতের মধ্যে বাত্রির গভীর অন্ধকারে এক নির্জন নদীর ধারে নামিয়ে রেখে পুলিশ নৌকা নিয়ে চলে যায়। বিপন্ন মহিলাগণ তখন মাইলের পর মাইল দুর্গম মাঠের পথ পায়ে হেঁটে পাব হয়ে, অনাহারে অনিদ্রায় প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় একটা গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সাহায্য পান। স্বরবালা সেন ৭ তাঁবু সহকর্মীগণ এবং পাবেও আন্দোলনে পুনরায় অংশগ্রহণ ক'রে কাবাদগে দণ্ডিত হন। এমনই গভীর ছিল তখন গান্ধীজীব ও কংগ্রেসের প্রভাব এবং স্বদেশসেবাব প্রেবণা।

আন্দোলনের সময় এই সত্যাগ্রহী সেবিকাদলেব মহিলাদের উপর প্রায়ই লাঠিচার্জ করা হ'ত। ফলে সতেবোজন মহিলা আহত হন। তার মধ্যে কমলা দেবী, হেমলিনী গাঙ্গুলী ও সুনীতি বসু আঘাত গুরুতর ছিল। লাঠিচার্জ এবং পুলিশেব জুলুম তাঁদের যতই নির্ধাতন কবেছে, বাঙালের জেদ ততই বেড়ে চলেছে। ১৭৪ খাবা ভঙ্গ ক'বে তাঁরা সভাসমিতি কবতেন ও চৌকিদারী ট্যান্ড বন্ধ আন্দোলন কবতেন, ফলে গ্রামবাসীদের মালপত্র ক্রোক করা হ'ত। মালপত্র ক্রোকেব দ্বারা সাধারণ গৃহস্থদের বহু ক্ষতি হ'লেও তাঁরা তাতে বিচলিত হ'তেন না। তা ছাড়া তাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করতেন, মদ গাঁজা ও বিলাতি দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং কবতেন এবং সাইক্লোস্টাইল ক'রে বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করতেন।

আশালতা সেন ১৯৩২ সালের ৭ই মার্চ গ্রেপ্তার হন এবং ছুটি মামলার শাস্তিভোগের পর ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হন। এই সময় থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন।

১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসকর্মী শশীবালা দেবীর অনুরোধে আশালতা সেন তাঁর সহকর্মী হেমলিনী দেবী এবং বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি যেমন কংগ্রেসের প্রচারকার্য করেন তেমনি 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনে স্থানীয় মহিলা-কর্মীদের সহায়তা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, নদীয়া, খুলনা ইত্যাদি জেলাতেও তিনি কংগ্রেসের কার্যের জ্ঞাত পরিভ্রমণ করেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। ঢাকার তালতলা অঞ্চলে পুলিশের গুলীতে নিহত তরুণ যুবকদের জ্ঞাত আহৃত এক শোকসভায় মশহুর সৈয়দ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি অত্যাগত কংগ্রেস-কর্মীসহ গ্রেপ্তার হন এবং ৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকা জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্তির পরেই এসে পড়লেন তিনি ছুঁড়ি-কবলিত দেশের মধ্যে। তিনি তখন ঢাকা শহর ও তার পাশে গ্রামগুলির মধ্যে তাদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন।

১৯৭৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সালের নভেম্বর মাসে তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সেখানে মহাস্বাভাবিক সঙ্গ দেখা ক'রে তিনি ঢাকা জেলার অবস্থা জ্ঞাপন করেন। ঢাকার অবস্থাও তখন শোচনীয় ছিল। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বিক্রমপুর অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন।

১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পর থেকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই অবস্থান করছেন এবং আজও সেখানে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। এই কাজে তিনি তাঁর দীর্ঘকালের সহকর্মী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহায়তা পাচ্ছেন।

নেত্রীস্থানীয়া নিরলস কর্মী আশালতা সেন আপন অন্তরে দেশসেবার অনির্বাক প্রেরণা জালিয়ে নিয়ে বাংলার, বিশেষ ক'রে পূর্ববাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে দেশপ্রেমের একটা প্রবল উদ্গাদনা জাগিয়েছিলেন, ঘরের মায়েদের কণ্ঠাদের সেদিন তিনি নিজের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে প্রবাহিত ক'রে নিয়ে চলেছিলেন বিপুল আকস্মে। যে স্বল্পসংখ্যক কর্মী ও নেত্রী প্রাণপণ প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আশালতা সেন তাদের অগ্রতম।

শশীবালা দেবী



১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন শশীবালা দেবী। পিতা চন্দ্রনাথ বাগচী। তিনি সমাজসেবী ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। শশীবালা দেবী পিতার নিকট থেকেই স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হন।

তাব বাবো বছর বয়সেব সময় বগুড়াব লোকনাথ মৈত্রেব সঙ্গে বিবাহ হয় এবং চাব বৎসব পবেই তিনি বিধব। হন। সাংসারিক অবলম্বন তাঁব এইভাবে ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৩০ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ কবেন। সমস্ত উত্তরবঙ্গে তিনি প্রবলভাবে প্রচাবকার্য ক'বে যান। ফলে সেখানে কংগ্রেসেব আন্দোলনে যোগদান করবাব জন্য নারীসমাজে বিপুল আলোড়ন ও উৎসাহ জাগে।

তাঁর প্রচাবকার্যের ধারা ছিল অভিনব। সফরকালে ট্রেনে যেতে যেতে যখন কোনো স্টেশনে একটু বেশীক্ষণ ট্রেন থামত, তিনি সেখানেই নেমে প'ড়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুলতেন। আবার ট্রেন ছাড়বার সময় হ'লেই ট্রেনে উঠে বসতেন। এইভাবে পথে যেতে যেতে অবিরাম চলত তাঁর আন্দোলনের প্রচাবকার্য।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তিনি জনসভায় দাঁড়িয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে আকৃষ্ট ও চঞ্চল ক'রে তুলতেন। সত্যাগ্রহীরূপে এক জনসভায় একপ বক্তৃতাদান-কালে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তিনি কারাদণ্ডের সময় উত্তীর্ণ হ'বাব পূর্বেই মুক্তিলাভ করেন এবং কবাচী কংগ্রেসে যোগদান কবেন। পুনবায তিনি ১৯৩২ সালে আইন অমান্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট চারবাব কারাধরু হন।

তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেব সদস্ত নির্বাচিত হন। নেলী সেনগুপ্তাব নেতৃত্বে কলিকাতায় যখন বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশন অগ্ৰষ্ঠিত হ'ব সেশময় নেলী সেনগুপ্তাব গ্রেপ্তারেব পরে শশীবালা 'দেবীব সভানেতৃত্বে কংগ্রেসেব অধিবেশন অগ্ৰষ্ঠিত হ'ব। এই স্মৃতিই সম্ভবতঃ তাব রাজনৈতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

টাব কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র রাজসাহী বিভাগেব আটটি জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না; ফরিদপুর, কচবিহাব, মেদিনীপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও তিনি সফর কবেছেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জনসাধাবণেব মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ এনেছেন।

উত্তববঙ্গে টাব বক্তৃতায় উদ্দীপিত হ'য়ে অনেক মহিলা কংগ্রেস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কাবাবরণ কবেন। পুলিশ সেখানকার অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তাব ক'বে ট্রেনে তুলে নিয়ে দূরবর্তী সাস্তাহাব স্টেশনে ছেড়ে দিত। এত উৎসীড়নেব পবেও মহিলাগণ ভীত বা নিকংসাহ হ'তেন না।

দেশবন্ধু চিত্তবজ্ঞন, নেতাজী স্বভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদাব প্রভৃতি বড় থেকে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সকলেই তাঁকে 'বডমা' ব'লে ডাকতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র উত্তববঙ্গেব নারী-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র-স্বকপ।

আজ এই ৭৫ বছর বয়সেও তিনি অক্ষুণ্ণ মনোবল নিয়ে কংগ্রেসের ও সমাজ-সেবামূলক কাজ ক'রে চলেছেন। সকলের কাছেই তিনি আজ 'কংগ্রেসী বুড়মা' নামে পরিচিত।

লাবণ্যলতা চন্দ



লাবণ্যলতা চন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ শহরে। পিতৃভূমিও সেখানেই। তাঁর পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীনাথ চন্দ, মাতা বামাহন্দরী চন্দ।

পিতা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দেশাত্মবোধ ছিল গভীর এবং ছাত্রদের উপর প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। কোথাও মহামারী বা ভূমিকম্প হ'লে ছাত্রদের নিয়ে তিনি চলে যেতেন সেবা করতে। তাঁর নীরব সেবাভাব কণ্ঠা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। মা সন্তানদের প্রকৃত মাহুষ করবার দিকে, ধর্মপরায়ণ করবার দিকে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

লাবণ্যলতা চন্দ লেখাপড়া শিখতে লাগলেন উৎসাহের সঙ্গে। বি.এ. পাস করেন তিনি কুমিল্লা ফেজয়েসা গার্লস স্কুলে কাজ করতে করতে। তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লা 'অভয় আশ্রম'-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মনে একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। তিনি ১৯৩১ সালে ঐ গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং অভয়-আশ্রমের তত্ত্বাবধানে কণ্ঠা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ক্ষণপ্রভা সিংহ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে গিরিডি হাইস্কুলের পদ ছেড়ে কুমিল্লায় চলে এসেছিলেন। তিনি লাবণ্যলতা চন্দ্রের সঙ্গে কত্কা-শিক্ষালয়ে যোগদান করলেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাবণ্যলতা চন্দ্র। রাউণ্ড টেবুল কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩২ সালের আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরই ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বোম্বাই থেকে কুমিল্লায় ফিরে আসেন এবং অভয়-অশ্রমেব বিভিন্ন কেন্দ্রেব ও নানা 'কংগ্রেস-কেন্দ্রেব কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনে কি ক'বে কাজ কবা যায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কত্কা-শিক্ষালয়েব সকল কর্মীই আন্দোলনে যোগদান কবেন। আন্দোলনের ফলে কত্কা-শিক্ষালয় ভেঙে যায়। সরকারি শিক্ষালয়টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'বে লাবণ্যলতা চন্দ্র ও তাঁর সঙ্গে শান্তশীলা পালিত, সবয় বসু, নবনীতকোমলা সিংহ, গিরিবালা ঘোষ, বিভা গুপ্ত, প্রিয়দা দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। তাঁদের অধিকাংশেরই ৬ মাস থেকে একবছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডেব আদেশ হয়। মুক্তিব পব পুনরায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবাব ফলে লাবণ্যলতা চন্দ্রের আবে ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। তাঁর সাথীরা অনেকেই আবাব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় থেকে গঠনমূলক কাজ করেন। এখানে তিনি একটি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। এই বয়স্ক মেয়েরা বিভিন্ন জেলায় আইন অমান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'বে কারাবরণ করেছিলেন। লাবণ্যলতা চন্দ্র নানা স্থান থেকে এঁদের সংগ্রহ ক'রে একত্র করেন। নানা বস্তীতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের তিনি গঠনমূলক কাজেরও শিক্ষা দেন। তারপর এই মেয়েদের দিয়ে তিনি বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র খোলেন।

এঁদের মধ্যে ননীবালা মাইতি মেদিনীপুরের 'আলোককেন্দ্রে' কাজ করেন। যশোহরের মনোরমা বসু আউটসাহীতে গঠনমূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিছু ডাক্তারী ও মিডওয়াইফারীর কাজও করতেন এবং এইসব কাজের জন্ত তিনি সেখানে সুনাম অর্জন করেন। প্রমোদা দাস ও নন্দরাণী দেবী নদীয়া

জেলায় তাঁদের ঘাট গ্রামে ঐরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। নির্ঝলা সরকার ও মণি দেব কুমিল্লা শহরে অল্পরূপ কেন্দ্র খোলেন। সাবিত্রী সিংহ বেথুয়া-ডহরীতে গিয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।

এঁদের গঠনমূলক কাজের মধ্যে প্রধান কাজ ছিল হবিজন-পল্লীতে অথবা দরিদ্র পল্লীতে গিয়ে শিশুদের লেখাপড়া শিক্ষা ও পবিত্রকার পবিচ্ছন্ন থাকতে শিক্ষা দেওয়া। তাঁরা বয়স্ক মহিলাদের লেখাপড়া অথবা শিল্প ও চবকা-কাটা শিক্ষা দিতেন।

১৯৪০ সালে জুন-জুলাই মাসে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লায় ফিবে আসেন। তখন কলিকাতার বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র কুমিল্লায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪১ সালে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯৪২ সালের 'ভাবত ছাড়' আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের চাই আগস্ট গান্ধীজীব বিখ্যাত 'ভাবত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করার পর লাবণ্যলতা চন্দ বঙ্গে থেকে কুমিল্লায় ফিবে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাবের সাবমর্ম প্রচার করতে থাকেন। পনেরো দিনের মধ্যেই তাঁর বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রটিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং তিনি গ্রেপ্তার হন। বয়স্ক মেয়েবাও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'বে কারাবদ্ধ হন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উষা গুহ বায়, তরুলতা পাল, স্বয়মা পাল, সবমা ভট্টাচার্য, মণি দেব, শৈলবালা দব, চিত্র দেব প্রভৃতি।

লাবণ্যলতা চন্দ একবছর নিবপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক থাকেন। ১৯৪৩ সালের শেষে মুক্তি পাবার পর ফিবে এসে তৃভিক্ষেব একটা ভীষণ চেহারা তিনি দেখতে পেলেন। প্রথমে তিনি সঙ্গীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলার, রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবারের সাহায্যেব জ্ঞাত চেষ্টা করেন। তাঁদের পরিবারেব অবস্থা দেখে তাঁদের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের প্রতিপালন ক্ষরবার আকাজ্জা তাঁর মনে জেগে ওঠে। ফলে তিনি মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, ঢাকার তাজপুরে এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে তিনটি শিশুসদন খোলেন।

পরে তিনি আশা আর্ষনায়কমকে প্রশ্ন করেন—এই শিশুদের নিয়ে কি করা যায়? আশা দেবী তাঁকে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন। আশা দেবী নিজে ঝাড়গ্রামে শিশুসদন কেন্দ্রে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করার ব্যবস্থা ক'রে দেন। সেই সময়ে গান্ধীজী অজ্ঞাত কর্মীদের সঙ্গে অভয়-আশ্রমের কর্মীদের ডেকে পাঠান। লাবণ্যলতা চন্দ এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত অভয়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। অত্যাশ্র কথাবার্তার পর লাবণ্যলতা চন্দ শিশুসদনের শিশুদের নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাই দিতে বলেন।

এই সঙ্গে তখন এখানে একটি টিচার্স ট্রেনিং ক্লাসও খোলা হয়। তিন মাসের একটি পাঠ্যক্রম ছিল। অবশ্য একবারই মাত্র এখানে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালে তাজপুর ও ঝাড়গ্রামের শিশুসদনের শিশুদের ঝাড়গ্রামে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার শিশুসদন তাঁরা 'সেভ দি চিলড্রেন কমিটি'র হাতে দিয়ে দেন।

১৯৪৫ সালে ব্রাহ্মসমাজের নিকট থেকে বলরামপুরের একটি স্থবিস্তীর্ণ জমি বে-আইনী অভয়-আশ্রমের পক্ষ থেকে লাবণ্যলতা চন্দ্র ও শিশির সেনের নামে লীজ নেওয়া হয়। বলরামপুরে তাঁরা ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির আরম্ভ করেন। জেল-ফেরত তরুণ সম্প্রদায়ের একদল এবং বাইরেরও কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিবিরে শিক্ষাগ্রহণ করবার জন্ত যোগদান করেন। প্রথমবার শিবিরে ৬ মাসের পাঠ্যক্রম ছিল। শিবিরের প্রথম-শিক্ষিত দলকে 'সেভ দি চিলড্রেন কমিটি' এবং 'হরিজন বোর্ড' কাজে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় শিবির খোলা হয় একবছরের পাঠ্যক্রমে। অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে দাঙ্গা ঘটে। লাবণ্যলতা চন্দ প্রভৃতি প্রধান কর্মীরা নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রিলিফের কাজ করতে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্রী ও ছাত্র শিক্ষার্থীরাও ঐ কাজে যোগদান করতে চলে যান। ফলে শিবির ভেঙে যায়। কিন্তু পরে তাঁদের এই অপূর্ণ শিক্ষা পূর্ণ করে দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালে 'ঝাড়গ্রাম শিশুসদন' বলরামপুরে চলে আসে।

নোয়াখালি দাঙ্গার পর ঐ অঞ্চলের ১৬।১৭ বছর বয়সের একশতটি মেয়ে নিয়ে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লায় একটি শিবির স্থাপন করেন একবৎসরের জন্ত। একবছর পরে এদের মধ্যে অনেক মেয়ের অভিভাবক নিরাপত্তার অভাব হেতু তাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভরসা পান নাই। তাদের জন্ত স্বাধীনতা-লাভের পর ঝাঁকুড়াতে বাড়ী ভাড়া করে আবার কল্যাণ-শিক্ষালয় নাম দিয়ে লাবণ্যলতা চন্দ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ক্রমে ঝাঁকুড়ার কল্যাণ-শিক্ষালয়কে বলরামপুরের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

লাবণ্যালতা চন্দ

১৯৪৫ সালে কস্তুরবা-ট্রাস্টের কাজ নদীয়া জেলার সাহেবনগর গ্রামে আরম্ভ হয়। নিরুপমা দেবী ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন; পবে ১৯৪৩ সালেব দুর্ভিক্ষেব সময় তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে রিলিফের কাজ করেন। সেই সময় তিনি লাবণ্যালতা চন্দ্রের সঙ্গে রিলিফের কাজে যুক্ত হন। বাংলাদেশেব কস্তুরবা-ট্রাস্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন লাবণ্যালতা চন্দ। তিনিই নিরুপমা দেবীকে সাহেবনগর গ্রামসেবিকা-শিক্ষণ-শিবিরেব সঞ্চালিকা নিযুক্ত কবেন। ১৯৪৮ সালে ঐ গ্রামসেবিকা-শিক্ষণ-শিবির বলরামপুরে নিয়ে আসা হয়। নিরুপমা দেবী সাহেবনগরে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন এবং ক্রমেতানে তিনি 'ভূদান যজ্ঞ'ব কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

ক্ষমতালোভহীন নেত্রী লাবণ্যালতা চন্দ অতাবধি গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে নীববে জাতিগঠনেব বুনিযাদ গেঁথে চলেছেন অক্লান্তভাবে। এই বয়সেও তাঁর বুনিযাদো শিক্ষাদানের কাজেব পরিধি দেখলে শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে।



সরলাবালা দেব



সরলাবালা দেব ১৮৯২ সালে শিলচরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃভূমি তাঁর সিলেট। তাঁর পিতা জগৎ চৌধুরী, মাতা মনোমোহিনী দেবী।

সেতাবো বছর বয়সের সময় তিনি বিবাহ হন। কিছু একটা কাজে নিজেকে সার্থক কবাব জ্ঞান তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। পিতামাতাও অসময়ে পরলোকগমন করেন।

স্বয়োগ এসে গেল। ১৯২১ সালে গান্ধীজী সিলেট যান। তাঁর কাছেই তিনি স্বদেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রথম প্রবেশ পান। নিজেকে সার্থক ক'বে তুলবাব একটা আলোব বেখা তিনি দেখতে পেলেন। মহা উৎসাহে চবকা ও খন্দর প্রচলনের কাজে তিনি গ্রাম ও শহরের লোকদের নিয়ে নেমে পড়লেন।

কিছুদিন পরে সিলেটে 'বিদ্যাশ্রম' নামে গান্ধীজীব আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সরলাবালা দেবের খন্দর-প্রচারের কাজের সঙ্গে 'বিদ্যাশ্রম'-এর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯২৬ সালে সরলাবালা দেবের মামা স্বতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও মামীমা স্বসঙ্গিনী

দত্ত সিলেটে একটি নারী-শিক্ষাবন গঠন করেন। সরলাবালা দেব এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এখানে সূতাকাটা ও খদ্দবের যাবতীয় জামা তৈরী করাই করা হ'ত। খদ্দবের জামা 'বিদ্যাশ্রম'-এর সহায়তায় বিক্রি হ'ত। তাঁরা এঁদের তৈরী সূতাব কাপড়ও বুনে দিতেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় সিলেটের মহিলাগণ দেশেব কাজে যোগ দেবাব জগু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। 'বিদ্যাশ্রম' তখন সবলাবালা দেবকে সিলেট শহরে এসে ঐ আন্দোলন পবিচালনা কবতে এবং মহিলাদেব সংগঠিত করতে আহ্বান কবেন। সে আহ্বানে সবলাবালা দেব গ্রাম থেকে সিলেট শহরে চলে আসেন এবং সেখানে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ' নামে একটি বাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি ছিলেন তাব সম্পাদিকা, সভানেত্রী ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী। মহিলা সংঘেব ছাত্রীসংঘ, স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ছিল।

১৯৩০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যখন দলে দলে ছেলেবা কাবাক্ক হন তখন 'বিদ্যাশ্রম' এব সহায়তায় মহিলা সংঘ বাজনৈতিক আন্দোলন পবিচালনা কবেন। গ্রামেব শত শত মেয়েবা ঘব থেকে বেবিযে এসে সভা ও শোভাযাত্রা কবতে লাগলেন এবং আইন অমান্ত কবতে নেমে পড়লেন।

১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে সবলাবালা দেবেব আহ্বানে ঢাকাব আশালতা সেন শ্রীহট্টে যান এবং তাঁব আন্দোলনমূলক ও গঠনমূলক কাজে সহায়তা কবেন।

১৯৩১ সালে সবলাবালা দেবেব উত্তোগে শ্রীহট্টে একটি 'নারীকর্মী শিক্ষাবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পুরুলিযাব কংগ্রেস-নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত প্রায ৫০টি নারীকর্মীকে কংগ্রেস ও গান্ধীজীব আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা মহিলাদের মধ্যে যে প্রেবণাব সৃষ্টি কবেছিল তাতে ১৯৩২ সালের আন্দোলনে শ্রীহট্টেব মহিলাগণ দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩২ সালেব আন্দোলনে তাঁবা বিলাতী কাপড় ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং কবতেন; একদল জেলে চলে গেলে, আব একদল তৎক্ষণাত্ সামনে এসে দাঁড়াতেন। বে-আইনী সভা ও শোভাযাত্রা তো ছিলই। ১৯৩২ সালের আন্দোলন পবিচালনা করতে গিয়ে সরলাবালা দেব দেড়বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। অন্তান্ত বহু মহিলা-কর্মী কারাক্ক হন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

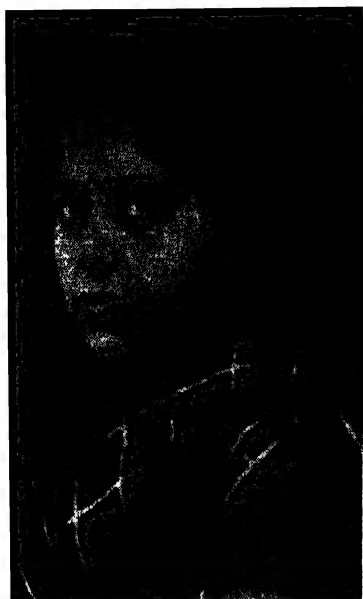
জেলা থেকে ফিরে আসার পর সরলাবালা দেবের পরিচালনায় মহিলা-কর্মিগণ তাঁত, চরকা, স্থল, শিল্পশিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, নার্সিং ও ধাত্মবিশ্ভা শিক্ষার ব্যবস্থা, হরিজন স্কুল প্রতিষ্ঠা গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। কাজ শুধুমাত্র শহরেই আবদ্ধ ছিল না, গ্রামে গ্রামেও তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভানুবিলা অঞ্চলে মণিপুরী কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে ‘শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ’-র মহিলাগণও যোগদান করেন। লীলাবতী দেবী ও সাবিত্রী সিং নামে দুইটি মণিপুরী নারীও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন ও জেলে প্রেরিত হন। অত্যাচারী ও শোষণপরায়ণ জমিদারের বিরুদ্ধে ছিল মণিপুরী কৃষকদের আন্দোলন।

১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করে সরলাবালা দেব, শশীপ্রভা দেব ও নরেশনন্দিনী দত্ত কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনে সরলাবালা দেব শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্টার নির্বাচিত হন। দলে দলে মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন। আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে সরলাবালা দেব কারাবরণ করেন; মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

শ্রীহট্টের মহিলা-আন্দোলন ও নারীজাগরণে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন সরলাবালা দেব।

সুখা ভ্যালি—অর্থাৎ শ্রীহট্ট জেলা ও কাছাড়া জেলা—ছিল তখন বাংলা-দেশের সঙ্গে যুক্ত। তাই বাংলার নারী-আন্দোলনের সঙ্গে আসে ঐখানকার আন্দোলনের কাহিনী। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর সুখা ভ্যালির কাছাড়া জেলা এবং করিমগঞ্জের একটা অংশ রইল আসামের সঙ্গে যুক্ত, শ্রীহট্ট জেলার অবশিষ্ট অংশ চলে যায় পাকিস্তানে।



শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

★

১৯১৭ সালের ২২শে মে (৯ই জ্যৈষ্ঠ) সুনীতি চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। পিতৃভূমি তাঁর ত্রিপুরা জেলাব নবীনগর থানার মধ্যে ইব্রাহিমপুর গ্রামে। তাঁর পিতা উমাচরণ চৌধুরী ও মাতা স্বরস্বন্দরী দেবী।

১২।১৩ বছর বয়স থেকেই সুনীতির মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল। কুমিল্লার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের যাবজ্জীবন স্বীপাস্তুর ও তাঁদের বিপ্লবী জীবনের মর্মস্বদ কাহিনী তিনি বিখ্যিত হ'য়ে উঠতেন এবং তাঁদের কথা আরো জানবার জন্য কোতূহলী হ'য়ে উঠতেন। তাঁর দাদারা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী।

১৯১৬ সালের ২২শে নভেম্বর শান্তি ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়। তাঁর পিতৃভূমি বরিশাল, কিন্তু তিনি মাহুস হয়েছিলেন কুমিল্লায়।

পিতা দেবেজনাথ ঘোষ ছিলেন কুমিল্লা কলেজের প্রফেসর। তাঁর সাতা সলিলাবালা ঘোষ। শান্তির পিতা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও আদর্শবাদী।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তঁার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সন্তানরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আত্মত্যাগ করতে শেখে। তিনি নিজেই তাদের স্বদেশী গান শেখাতেন। একবার সরোজিনী নাইডু কুমিল্লায় একটি সভায় বক্তৃতা দেন। সেই সভায় শান্তি গাইলেন—

“ভারত আমার, ভারত আমার

যেখানে মানব মেলিল নেত্র” ...

সভা থেকে ফিরে এসে বাবার কাছে শান্তি যখন মহা উৎসাহে সভার বর্ণনা করছিলেন, বাবা বললেন, “আজ তুমি যার সভায় গান গাইলে, একদিন যেন তুমি তাঁর মতো বড় হ'তে পার।”

১৯২৬ সালে শান্তির পিতার অকালমৃত্যু হয়।

১৯২৮ সালে সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে কুমিল্লায় যে তীব্র বিক্ষোভ জেগেছিল তাতে শান্তির অন্তর আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার কৈজরেন্দা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। শান্তির সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। প্রফুল্লনলিনী যুগান্তর নামে বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শান্তি ও সুনীতিব তেজস্বিতা প্রফুল্লকে আকৃষ্ট করে। প্রফুল্ল তাঁদের প্রভাবান্বিত করেন এবং দলেব নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শান্তি ও সুনীতি দলের উৎসাহী কর্মী হ'য়ে ওঠেন। নানা স্বদেশী বই পড়তে পড়তে তাঁদের মন আরো চঞ্চল ও প্রস্তুত হ'য়ে উঠতে থাকে।

১৯৩০ সালে কুমিল্লায় চলেছিল আইন অমান্ত আন্দোলন। জনতার উপরে ইংরেজের অত্যাচার কুমিল্লার সমস্ত কিশোর ও যুবমনকে প্রচণ্ড একটা ঘা দিয়ে ফিরছিল। তার চেউ এসে ধাক্কা দিতে লাগল শান্তি সুনীতি প্রফুল্ল প্রভৃতিকেও। তাঁদের মনে হ'ত ইংরেজ তাড়াতে পারলে তবেই অবশেষে আমাদের দেশের মঙ্গল। শোভাযাত্রার উপরে লাঠিচার্জের ফলে কর্মীদের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তাঁদের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠত।

তাঁরা চমৎকার লাঠি ও ছোঁরা খেলা শিখে নিলেন। তারপর অভ্যাস করতে লাগলেন রিভলভার ছুঁড়তে ময়নামতী পাহাড়ে গিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় লাঠি-ছোঁরা খেলা শেখাবার ও বিপ্লবাত্মক পুস্তক পড়াবার মধ্য দিয়ে তাঁরা সংগঠন ক'রে চলেছিলেন। উৎসাহের একটা নতুন জোয়ারে ছোট কুমিল্লা শহর তখন জীবন্ত।

১৯৩১ সালের প্রথমার্ধে কুমিল্লায় ছাত্র-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই

শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

কিশোরী বন্ধুবা গ'ড়ে তুলেছিলেন ছাত্রীসংঘ। প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম তার সভানেত্রী, শান্তি ঘোষ সম্পাদিকা এবং সুনীতি চৌধুরী ক্যাপ্টেন। ছাত্রী-সংঘের প্রায় ৫০।৬০টি ছাত্রীকে ক্যাপ্টেন সুনীতি শেখাতেন ড্রিল ও প্যারেড। এই ছাত্রীরা ছিলেন ছাত্র-কনফারেন্সের স্বেচ্ছাশ্রম ও নিয়মাহুগ স্বেচ্ছাসেবিকা।

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল, শান্তি, সুনীতি শুনেছেন বিপ্লবীদের অল্পজ্ঞিত গার্লিক হত্যা, সিম্পসন হত্যাব ঘটনাবলী। প্রফুল্ল ও শান্তি ভাবলেন তাঁবাও কেন কববেন না? দলের নেতাদের কাছে প্রফুল্ল ও শান্তি কিছু একটা বিপ্লবী কাজ কববাব জন্ত বাববাব তাগিদ দিতে থাকেন।

দলেব নেতাব। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন যে, শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লাব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'বে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে চবম আঘাত হানবেন। দলেব পুবা তন কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রদ্বল থাকবেন বাইবে। দবকাব হ'লে তিনি আত্মগোপন ক'বে কাজ ক'বে যাবেন। তাঁব বাইরে থাকা তখন বেশী প্রয়োজন ছিল। আবাে স্থিব হব বে, শান্তি সুনীতি একটা দবখাস্ত দেবার অজুহাতে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলাোতে গিয়ে কাজ হাসিল কববেন।

১৯৩১ সালেব ১৭ই ডিসেম্বর সকালে শান্তি সেজেগুজে বসে আছেন এমন সময় একটা ঘোড়াব গাড়ী এল দলেব দাদাদের নির্দেশমতো। শান্তি গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ীতে ছিলেন সুনীতি। তাঁদের গাড়ী গিয়ে ঢুকলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে।

চাপরাসীব হাতে তাঁবা ইন্টাবভিউ-কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স বেবিষে এলেন। দাবিত্ত পালনেব স্রযোগ সমাগত দেখে শান্তি সুনীতি গুলী ছ'ড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাণহীন দেহ ভূস্থিত হ'ল। শান্তি দেখলেন সমস্ত ঘবটাতে চলেছে ছুটোছুটি দাপাদাপি এবং বিকট চীৎকার। সুনীতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে হুজুন লোকে তাঁকে জাপটে ধরেছে রিভলভারটা কেড়ে নিতে। শান্তিকে পেছন থেকে একজন লোক শক্ত ক'রে ধ'রে রয়েছে, আরেকজন শান্তির রিভলভার-স্বত্ব হাতটা চেপে ধরেছে। অশ্রাব্য ভাষায় তারা পালাপালি করছে। চাপরাসীরা তাঁদের কিল, চড়, লাথি, ঘুবি মারছে। পুলিশ-লাইনের সামনে পাগলা-ঘটি বেজে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ এসে সব ঘিরে ফেলল; শান্তি-সুনীতির হাত পেছনে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বেঁধে দিখে তাঁদের বেদম প্রহার করতে লাগল। এমন সময় ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টর এসে প্রহারের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁদের দুজনকে দুই জায়গায় সবিয়ে দেয়। জেবা চলে আলাদা আলাদা ভাবে। গুপ্তকথা পুলিশ কিছুই আদায় কবতে পারেনি। তারপর নিষে ঘাষ তাঁদের কুমিল্লা জেলে।

পবদিন বন্দী হয়ে এলেন সেখানে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের ইন্দুমতী সিংহ। চট্টগ্রামেব অনন্ত সিংহেব ভগ্নী ইন্দুমতী সিংহ তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অর্থসংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পবে শাস্তি-স্বনীতিকে নিয়ে আসা হয় কলিকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। মামলা শুরু হয় ১৯৩২ সালের ১৮ই জানুয়ারি। মামলার সময় শাস্তি স্বনীতি তাঁদের হাসি, উচ্ছ্বাস ও তেজস্বিতার সমস্ত কোর্টকে মুগ্ধ ক'বে রেখেছিলেন। মামলাব দ্বিতীয় দিনে ডকে তাঁদের বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি ব'লে তাঁরা পিছন ফিরে দাড়িয়ে রইলেন। তাবপর থেকে শেষদিন পর্যন্ত ডকে তাঁদের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৭শে জানুয়ারি শাস্তি-স্বনীতি সমগ্র সত্তা কেন্দ্রীভূত ক'রে যখন অপেক্ষা করছিলেন ফাঁসীর আদেশ শুনবাব জন্য তখন তাঁরা দণ্ডদেশ শুনলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের। অফুরন্ত উৎসাহভরা প্রাণ তাঁদের সেই মুহূর্তে নিরাশাবোধই করেছিল। কিন্তু তাঁরা যে ১৪।১৫ বছরের কিশোরী নাবালিকা! স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী! ফাঁসী কি ক'রে হবে?

এই দুটি কিশোরী মেয়ের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের বুকে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা তখনকার দিনের লোক আজও হয়তো ভুলে যাননি। যে বাংলাদেশের নারী-সমাজ শত লাঞ্ছনাও মুখ বুজে সহ্য করেন, শত আঘাতেও নীরবে অশ্রুপাত করেন কিন্তু প্রত্যাঘাত করার কথা মনে আনেন না, সেই সমাজের দুটি কিশোরীর একি রণরঙ্গিণী মূর্তি! বিধাগ্রস্তের মনে সেদিন দৃঢ়তা জাগলো। যুবসমাজের চিন্তে জাগলো চমক, উৎসাহে উদ্দীপনায় তারা দুঃসাহসের পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত। ছোট্ট দুটি মেয়ে যেন ধুমকেতুর মতো সমগ্র দেশকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গোটা সমাজের হ'য়ে শাস্তি বহন করতে কারাস্তুরালে চলে গেলেন দেশবাসীকে চাক্ষুণ্যে ও বিশ্বাসে হতবাক ক'রে দিয়ে।

শাস্তিকে করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী, স্বনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর। বিবেচনা এনে শাসন করা হচ্ছে ইংরেজের নীতি। শাস্তি-স্বনীতিকে মাঝে মাঝে

শান্তি ঘোষ (দাস) ও স্বনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

একসঙ্গে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আলাদা আলাদা ক'রে প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর, রাজসাহী, হিজলী প্রভৃতি জেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্থানান্তরিত করা হ'ত।

যখন তাঁরা মেদিনীপুর জেলে ছিলেন তখন সেখানকাব জেলার ও মেট্রনের অনাচারেব বিকল্পে শান্তি, স্বনীতি ও বীণা দাস অনশন করেছিলেন সাতদিন। ফলে জেলারকে ওখান থেকে বদলি করা হয়। কিন্তু এই বন্দিদেবও পৃথক পৃথক জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। শান্তি ও বীণা গেলেন হিজলী জেলে, যেখানে ছিলেন বিনাবিচারে বন্দী রাজবন্দী মহিলাগণ। স্বনীতিকে নিষে যায রাজসাহী জেলে। শান্তি স্বনীতি যেখানেই যখন গেছেন, তাঁদেব চমৎকার কঠোরভাবে অগ্ন্যসফল বন্দীকে ও সাবা জেলখানাকে তাঁবা মাতিয়ে বাখতেন।

মেদিনীপুর জেলে থাকতেই স্বনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর কষেদী করা হয়। কাবাজীবনেব মর্যাস্তিক শান্তি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীব বন্দীব জীবন বাপন করা। তৃতীয় শ্রেণীব বন্দীব প্রতি ছিল সর্বপ্রকাব অসমানজনক ব্যবহার। কুর্তা ও শাডী যে একেভাবে চটেব মতো মোটা হ'তে পারে তা তখনকার দিনেব তৃতীয়শ্রেণীব কষেদী ভিন্ন অস্ত্রে জানে না। তৃতীয় শ্রেণীব খাওয়া সাধারণ লোকেব কল্পনাব বাইবে। কী শক্ত আব মোটা ভাত। সেগুলি চিবোতে না পাবলেও গিলতেই হবে। বালতি-ভর্তি হল্‌দে বড়ের জল— তাব নাম ডাল। কী ডাল সেটা বোঝা যায় না। তাতে আবাব এমন কাঁচা-কাঁচা গন্ধ যে, খেতে গিয়ে মনে হয় যেন সত্ত্ব ক্ষেত থেকে কাঁচা ডাল অসময়ে তুলে এনেছে। আব তবকাবী / বিশ্বাদ ঘ্যাঁটাটা গলা দিয়ে যাবার সময় গলাব মধ্যে একটা ঘ্যাঁডানিব কষ্ট হয়, কেমন খুসখুস করে। এই হচ্ছে ইংবেজ আমলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদেব জন্ত খাণ্ডেব রূপ। বাড়ীতে অতি-দরিদ্রের মুখের ডালভাতও এব কাছে অমৃত। তা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী পাবে একখানা মাত্র বই। কাবাজীবনে কখনো অল্পদিনের জন্ত অগ্ন্যন্ত রাজনৈতিক কষেদীদেব সঙ্গে স্বনীতি চৌধুরীকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময় শুধুই সাধারণ কষেদীরা ছিল তাঁব সঙ্গী, অর্থাৎ প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীজীবনে তাঁব উপর অপমানকব অগ্ন্যন্ত উৎপীড়নেবও অন্ত ছিল না।

ওদিকে স্বনীতিদেব বাড়ীটাকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাঁদেব পরিবারকে স্বত্বার মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। স্বনীতির বাবার পেনসান বন্ধ করে দিল। স্বনীতির দুই দাদাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তঁার পিতামাতা ছোট ছোট সম্ভানদের নিয়ে উপবাসের মুখে পড়ে গেলেন। আত্মীয়স্বজনরা সাহায্য করতে গেলে পুলিশ তঁাদের নির্ধাতন করতে আরম্ভ করে। তঁারা সাহায্য বন্ধ করলেন। স্বনীতির ছোট ভাই আর্থিক সঙ্গতির চেষ্টা করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লিষ্ট জীবন যাপন করার ফলে যক্ষ্মাতে মৃত্যুবরণ করেন। এর উপরেও বাড়ীতে পুলিশের অত্যাচারের অবধি ছিল না। বাড়ীর এই নিদারুণ দুঃখের কথা স্বনীতি জেলে সবই জানলেন, কিন্তু দুঃখের বজ্রাঘাতে মাথা নত করবেন স্বনীতি সে-মেয়ে ছিলেন না। অল্প ধাতু দিয়ে গড়া এ-মেয়ে। ভারতের উজ্জ্বল এক বহু তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে বাংলার কারাগারে সকলের অজ্ঞাতে ভ্রম্বে আত্মদিত রইলেন।

“দুঃখেবহুদ্বিগমনা স্বখেষু বিগতস্পৃহঃ” কাকে বলে জানি না, কিন্তু সাধারণ জীবন যে কত অসাধারণরূপে ফুটে উঠতে পাবে—কত ‘স্বিত্তরী’ হ’তে পারে তা দেখা যায় স্থনীতির মতো মেঘের মধ্যে।

কারাপ্রাচীরের দুর্ভেগ লোহবর্মের মধ্যে শান্তি স্থনীতি কাটিয়ে দিলেন সাতটা শীত ও বসন্ত। অবশেষে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় অনাসকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে তাঁদেরও মুক্তির আদেশ আসে ১৯৩৯ সালের এক প্রাতে।

মুক্তির পর শাস্তি স্থনীতি পড়াশুনা করতে থাকেন। তুজনেই ম্যাট্রিক পাস করলেন। তারপর শাস্তি পাস করেন আই.এ. ; স্থনীতি আই.এসসি। স্থনীতি এম্.বি. পাস করে ডাক্তার হন। ডাক্তাররূপে আজ তিনি নীরবে সেবা করে চলেছেন কত দুঃস্থ ও পীড়িত মানবের। ১৯৪৭ সালে স্থনীতির বিবাহ হয় চব্বিশ-পরগনার প্রাচ্যোতকুমার ঘোষের সঙ্গে।

শান্তির রুচি ফুটে উঠল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। আপন জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন তিনি ‘অরুণ-বহি’ নামক পুস্তকে। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মমুখব।

১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে শান্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান-সভার সদস্য।

বীণা দাস (ভৌমিক)

★



বীণা দাস ১৯১১ সালের ২৪শে আগস্ট কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব দাস ও মাতা সবলা দাস। পিতৃভূমি তাঁর চট্টগ্রাম। তাঁর দিদি কল্যাণী দাসের জীবনীতে পূর্বেই তাঁর শৈশবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

শৈশব থেকে বীণা সমগ্র পরিবারের নিবিড় স্নেহমমতা এবং অগাধ বিশ্বাস পেয়ে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছিলেন। বড় হবার সাথে সাথে বাইরের জগতের সঙ্গে যতই পরিচিত হ'তে লাগলেন ততোহি তিনি অমুগ্ধ কবলেন 'অসীম বেদনাভবা মানবজীবন'। তাঁর মানসিক স্বথশান্তির জগতে আলোড়ন দেখা দিল। দেশের দুঃখ দুর্গতি ও পরাধীনতার মানি তাঁর মনকে আকুল ক'রে তোলে।

অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রবল তরঙ্গ তখন দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বীণাদের পরিবারেও এই তরঙ্গের ধাক্কা লাগে। তাঁর মেজদাদা আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন। পিতা নিজেকে চরকা ও ধন্দর এনে দিতেন। তিনি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অল্পদিকে পিতার জীবন থেকে বীণা শিক্ষা পেয়েছিলেন, একটা আদর্শের জন্ত মানুষ কতবড় ত্যাগস্বীকার নিজের জীবনে করতে পারে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের আকুল আহ্বান এবং আদর্শবাদী পিতার আদর্শনিষ্ঠা বীণার মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথকে নিজের জীবনে বেছে নিতে।

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন। বেথুন কলেজেব ছাত্রী বীণা দাস অগ্রাগ্র কর্মীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। ঐ সালেই কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে বীণা ও কল্যাণী চুই ভগ্নী পরম উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীতে যোগদান করেন।

সেই সময়ে বীণা বেথুন কলেজে পড়তেন। তাঁর সহপাঠী স্ত্রীসহস্রী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্ত ছিলেন একটি ছোট বিপ্লবী দলের সভ্য। বীণার মতো আদর্শবাদী আধার পেয়ে তাঁরা বীণাকে তাঁদের বিপ্লবী দলে টেনে নেন।

১৯৩০ সালে আবিস্ত হযেছিল গান্ধীজীব লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। পাশাপাশি চলেছিল বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়—চট্টগ্রাম অঙ্গাগাব লুণ্ঠন দিয়ে যাব আরম্ভ। বীণা কান পেতে শোনে আব বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁদের গৌবগাথা নিবে মনে মনে ছবি আকেন।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ডালহাউসি স্কোয়াবে বাংলার অত্যাচারী পুলিশ-কমিশনার গ্রাব চার্লস্ টেগার্টকে বোমা ও বিভলভাব দিয়ে আক্রমণ কবাব অপরাধে গ্রেপ্তার হন দীনেশ মজুমদার এবং নিহত হন অহুজা সেন। ঢাকায় বিনয় বহু লোম্যানকে গুলী আঘাতে পরাজ্য-শাসনের চবম পুঙ্কাব দিয়ে পালিয়ে যান। ঐবই কিছুদিন পরে আবাব কলিকাতা বাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয় বহু আবিভাব হয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের সঙ্গে। তিনজনেই আক্রমণ করেন সিম্পসন ও অগ্রাগ্র উচ্চপদস্থ ইংবেজকে। বিনয় বহু ও বাদল গুপ্ত নিজ মস্তকে গুলী ক'রে ও সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা কবেন। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলেব দুটি কিশোরী ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টেডেনকে নিহত ক'রে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবে দণ্ডিত হন। এইভাবে একটাব পর একটা ঘটনা বাংলাদেশের সত্তাকে প্রবল ধাক্কা আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। ডালহাউসি স্কোয়াব বোমার আক্রমণের পর বীণাদের সেই ছোট দলের নেতা এবং তাঁদের আরো অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। তা ছাড়া নানা আভ্যন্তরীণ কারণে তাঁদের ছোট দলটি ভেঙে যায়। এদিকে চলেছে তখন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে

স্বাধীনতা-সংগ্রামের মরণ-উৎসব। বীণা উৎকর্ষিত হ'য়ে উঠলেন ওই সংগ্রাম-সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে।

একদিন তিনি যুগান্তর-দলের কর্মী কমলা দাশগুপ্তের কাছে নিজের আকাজক্ষা ব্যক্ত করলেন এবং 'ডিগ্রী' নেবার সময় কন্‌ভোকেশান-হলে অথবা কলিকাতার রেস-কোর্সে গভর্নরকে গুলী করবার জ্ঞান রিভলভার চাইলেন।

তখনকার দিনে গুপ্তদলগুলি একে অস্ত্রের কাছে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা অথবা কথাবার্তা বলতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না। তাই বীণাকে দিয়ে এ কাজ করাবাব এতবড় দায়িত্ব নেওয়া সম্বন্ধে কমলা প্রথমদিনই বীণাকে কথা দিলেন না।

বীণাকে তিনি চিনিতেন। তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু কল্যাণী দাসের ছোটবোন বীণা। বীণার স্বভাব ছিল মধুর ও আদর্শপ্রবণ, আর ছিল তাঁর আবেগপূর্ণ প্রাণ।

বীণার সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন এই কাজের বিপদের দিকটা আলোচনা ক'রে বোঝাতে লাগলেন যেন মুহূর্তের আবেগে তিনি কিছু কবতে না যান। বীণা বহিলেন দৃঢ় আপন সংকল্পে।

কমলা অগ্নিদিকে আলোচনা করতে থাকলেন নিজেদের দলেব মধ্যে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর পরম বিশ্বাসের পাত্র স্বধীর ঘোষকে। স্বধীরেব সঙ্গে তাঁর আলোচনার মূল কথাটা দাঁড়াল এইরকম : গভর্নর হচ্ছেন শাসন ও প্রভুত্বের পূর্ণ প্রতীক। এই পূর্ণ প্রতীককে আঘাত ক'রে বিপ্লবের বহুটাকে তীব্রতম শ্রোতে, উর্দম গতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের নিঃশেষে অবলুপ্ত ক'রে দেওয়াই ছিল তখন তাঁদের একমাত্র সাধনা ও লক্ষ্য। অতএব পরামর্শে স্থির হয়, কন্‌ভোকেশান-হলে গভর্নরকে গুলী করা হবে এবং গুলী করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। এই কাজের জ্ঞান চরম শাস্তির যে বিধান ছিল—সেই ফাঁসী, স্বীপাস্ত্র, বর্ষব অত্যাচার সবই বরণ ক'রে নেবার জ্ঞান প্রস্তুত হলেন তাঁরা।

কমলা দাশগুপ্ত ২৮০ টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে দিলেন স্বধীর ঘোষের হাতে রিভলভার কিনে আনতে।

কয়েকদিন পরেই এল অতিকষ্টে আগল-করা রিভলভার। সেদিনই বিকালে কমলা চলে গেলেন বীণার সঙ্গে দেখা করতে। আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিলেন তিনি বীণার হাতে, বুঝিয়ে দিলেন তার প্রতিটি অংশের ব্যবহার অস্ত্রের অলক্ষ্যে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট-হলে কন্ভোকেশান বসেছে। গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাক্সন অভিভাষণ পাঠ শুরু করেছেন। বীণা দাস নিজের আসন থেকে উঠে এসে গভর্নরের কয়েক হাত দূর থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে গুলী চলে গেল। সৈনিকের জাত, অতি সতর্ক কান, তৎক্ষণাৎ গভর্নর মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। কর্নেল স্ম্যাওয়ার্ডি ডায়াস থেকে ছুটে এসে বীণার গলা টিপে ধরে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করতে থাকেন। তবুও বীণার হাতেব বাকী গুলী কথটা ঐ অবস্থাতেও ছুটেছিল।

বীণা দাসকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। অপমানকর ভাষায় পুলিশ তাঁকে জেবা করে বিভলভার পাবার বহুস্ত জানতে। বীণা রইলেন নিরুত্তর।

কোটে বীণা একটি বিবৃতি দেন। একদিনেই বিচার শেষ ক'রে তাঁকে ৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পরাদীন ভারতে যেসব আত্মভোলা কর্মী স্বাধীন ভাবতের সোধমূল গেঁথে তুলবার জ্ঞান আত্মবিশ্বস্তি আকাজ্জব অধীর হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন— বীণা দাস তাঁদের অগ্রতম। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ, শক্তিদর গভর্নরের প্রতি গুলী-নিষ্ক্ষেপ সেদিন ভূমিকম্পের মতো ফাটল ধরিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমিতে।

যদিও এই ষড়যন্ত্রে মধ্য যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের পুলিশ জানেনি, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কমলা দাশগুপ্ত এবং স্বধীর ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে জেলে নিয়ে যায় এবং রাজবন্দী ক'রে রাখে তাঁদের ছয়বৎসরেরও বেশী।

বীণা দাসকে নিয়ে যায় প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুর জেলে। সেখানে ছিলেন শাস্তি ঘোষ ও স্বনীতি চৌধুরী। মেদিনীপুরে কিছুদিন তাঁদের আনন্দেই কেটেছিল। কিন্তু জেলখানা আনন্দের জায়গা নয়। ঐ জেলের জেলারের অনাচারের প্রতিবাদে এঁরা তিনজন অনশন আরম্ভ করেন। উপবাসের সপ্তম দিনে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবী মেনে নিলেন। তারপর বীণা দাস ও শাস্তি ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয় হিজলী জেলে,

* এই ঘটনার বিশদ বিবরণ লেখিকার 'রক্তের অক্ষরে' পুস্তকে আছে।

যেখানে রাজবন্দিনীরা ছিলেন। স্থনীতি চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজসাহী জেলে।

বাংলাদেশের নানা জেলে স্থানান্তরিত হ'য়ে থাকার পর গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় সকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে বীণাও মুক্তি পান। পুরো সাতবছর জেলে কাটিয়ে বীণা বেবিষে আসেন ১৯৩৯ সালে।

গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় শুধু রাজনৈতিক বন্দী নন, বিনাবিচারে বন্দীরাও সকলেই মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের মধ্যে। বেবিষে আসার পর সব দলই নতুন পরিস্থিতিতে আত্মচিন্তা করতে লাগলেন। যুগান্তর-দলের নেতারা নিজেদের 'কর্মপদ্ধতি ও গুপ্তদল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে স্থির কবেন যে, তাঁদের আব গুপ্তদল এবং পৃথক কর্মপদ্ধতি বাখবাব প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁরা নিজেদের দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন। 'ফবওয়ার্ড' সাপ্তাহিক কাগজ তখন তাঁরাই পরিচালনা কবেন। 'মন্দিবা' নামে একটি রাজনৈতিক মাসিকপত্রিকাও তাবা পরিচালনা কবেন। মুক্তিব পব বীণা দাস এসে এদের সঙ্গে কাজে যুক্ত হলেন। 'মন্দিবা'এ সম্পাদিকা তখন কমলা দাশগুপ্ত। কঠিন পরিশ্রম ছিল এই কাগজ পরিচালনা কবা। মনের মধ্যে অদ্ভুত আশা নিয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে ক'রে কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, মাখা ঘোষ, বেবা ঘোষ, কমলা সেন, হুগ্ৰীতি মজুমদাব, প্রভাবতী বসু, শান্তা বসু, স্নেহলতা সেন, ছলু দত্ত ও অত্রান্ত সহকর্মীগণ 'মন্দিবা'এ জ্ঞাত খাটতেন। লেখা সংগ্রহ করা, ডালহাউসি স্কোখাবের বিবাট দালানগুলি ঘুবে ঘুবে বিজ্ঞাপন যোগাড করা প্রভৃতি কোনো কাজকেই তাঁদের নীবস বা একঘেষে মনে হ'ত না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ যে। বীণা দাস ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁব লেখাগুলি আজও পুবাতন 'মন্দিবা'এ আন্তবিকতা ও নিষ্ঠাব পরিচয় দেয়।

'মন্দিবা' মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন :

কমলা চ্যাটার্জী—বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে কাতিক ১৩৪৫ পর্যন্ত।

কমলা দাশগুপ্ত—অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ থেকে শ্রাবণ ১৩৪৯,

পৌষ ১৩৫২ থেকে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত।

স্নেহলতা সেন—ভাদ্র ১৩৪৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ পর্যন্ত। (এইসময়

কমলা দাশগুপ্ত জেলে ছিলেন।)

বীণা দাস ওদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে গণসংযোগের

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

কাজও করতে থাকেন। কংগ্রেসের এক প্রধান কর্মসূচী ছিল গণসংযোগ করা। তিনি টালিগঞ্জের চালের কলের বস্তীতে গিয়ে বস্তীবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তাদের চরম দুর্গতি নিজের হৃদয়ে অনুভব করতেন। দারিদ্র্যের লাহুনা তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলত।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম। বীণা দাস ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি ছিলেন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা। তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন হাজরা পার্কে। বে-আইনী সভা। একটি সহকর্মীকে ব্যাটন দিয়ে প্রহাররত সার্জেন্টেব হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরতেই পুলিশ বীণা দাসকে গ্রেপ্তার করে। এবাবে তিনি নিরাপত্তা বন্দী হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে রইলেন প্রায় তিন বছর। জেল থেকে মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সদস্য ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কর্মচারীদের ইউনিয়নের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঐ ইউনিয়নের কর্মীদের অভিযোগ ও বিক্ষোভ জমা হ'য়ে ছিল বহুদিনের। অভিযোগের প্রতিকারের জন্ত এক দারুণ প্রতিকূল অবস্থাব মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুই সহকর্মী ও সহায়ক ছিলেন তারা দাস ভট্টাচার্য এবং বীরেশ্বর ঘোষ। এ-ছাড়া আরে! কতকগুলি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীণা।

নোষাখালির দাঙ্গার পর তিনি সেখানে দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে চলে যান। গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল গ্রামে গ্রামে গিয়ে দু-একটি কর্মী মিলে এক-একটি কেন্দ্র ক'রে বসবেন। কর্মীদের কর্তব্য ছিল গ্রামের ভয়াবহ লোকদেব মধ্যে সাহস সঞ্চার করা, পুনর্বাসতি স্থাপন করা, সাম্প্রদায়িক সম্ভাব ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি। বীণা দাসের উপর ভার ছিল রামগঞ্জ থানার নোষাখোলা গ্রামে কেন্দ্র ক'রে বসার।

স্বাধীনতা আসার মুখে সাহিত্যিক বীণা লিখেছিলেন আপন জীবন-কাহিনী 'শৃঙ্খল-বন্ধন' নামক পুস্তকে।

১৯৪৭ সালে তাঁর বিবাহ হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে।

প্রীতিলতা ওয়াদাদার



১৯১১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদাদার। দেশও চট্টগ্রামেই। তাঁর পিতা জগদ্বন্ধু ওয়াদাদার ও মা প্রতিভাময়ী দেবী।

প্রীতিলতার শৈশবে চট্টগ্রামের মেয়েদের লেখাপড়ার প্রচলন বিশেষ ছিল না। প্রীতির পিতাও মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে প্রথমে উদাসীন ছিলেন। ছেলেদের জন্য তিনি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। প্রীতিলতা তার দাদার পড়ার ঘরের পিছনে বই হাতে লুকিয়ে থাকত। যে মুহূর্তে দাদার পড়া হয়ে যেতো, প্রীতিলতা ছুটে গিয়ে মাস্টারমশাইর কাছে বসত। ওর ঋত আগ্রহ দেখে তিনিও পড়াতেন। মায়ের ঐকান্তিক আকাজক্ষায় ও সাহায্যে এবং প্রীতিলতার নিজের উৎসাহে সাতবছর বয়সে প্রীতি স্কুলে ভর্তি হয়।

বড় হয়ে ছাত্রীজীবনে প্রীতিলতা ঢাকায় লীলা নাগের 'দীপালী সংঘ' এবং কলিকাতায় কল্যাণী দাসের 'ছাত্রীসংঘ'-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এই মেলামেশা তাঁকে রাজনৈতিক প্রেরণা দেয়। ওদিকে বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারও তাঁর মধ্যে বিপ্লবী বীজ বপন করবার চেষ্টা করেন। পরে তিনি অর্ধ সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

স্কুলের ছাত্রী প্রীতিলতা তাঁর কৃতিত্বে সকলের প্রিয়পাত্রী হন। তখন থেকেই তিনি নানা বিপ্লবাত্মক বই পড়তেন। রাত জেগে ইংরিজিতে ডায়েরী লিখতেন। বাংলায় নানা প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখে তিনি সকলকে চমৎকৃত করতেন। শ্রীকৃষ্ণের বীষবান পার্থসারথির রূপ তাঁর উপাস্ত ছিল।

আই.এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৩০ সালে। বেথুন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি পারিতোষিক পান। তারপর বিপ্লবী কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, ১৯৩২ সালে বি.এ. পরীক্ষার সময় ইংরাজি অনার্স তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় এবং তিনি ডিস্টংশনে বি.এ. পাস করেন।

১৯৩০ সালে মাস্টারদা স্যু সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কত বিপ্লবী প্রাণ আহুতি দিলেন, কতজন বন্দী হলেন এবং অনেকে আত্মগোপন করে বিপ্লবী কাজ পরিচালিত করতে থাকলেন। এই সময় প্রীতিলতা বিপ্লবীদের গোপন খবর আদানপ্রদান করতেন এবং চট্টগ্রাম ও কলিকাতাবিভিন্ন সংযোগ রক্ষা করতেন। চাঁদপুরে পুলিশ-ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করার অপবাধে ফাঁসার আদেশপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রীতিলতা আদেশ পেলেন মাস্টারদার কাছ থেকে। যদিও তখনো পর্যন্ত প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদার সাক্ষাৎ হয় নাই। তারপর প্রীতিলতা প্রায়ই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেখা করেছেন। কতৃপক্ষ তাঁকে রামকৃষ্ণের বোন বলে জানত। একদিন সকাল আটটায় প্রীতিলতা যথারীতি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হঠাৎ শোনেন যে, সেদিন ভোর চারটায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয়ে গেছে। শোনামাত্র তিনি এমন একটা মানসিক আঘাত পেলেন যে, তিনি যেন দিশা হারিয়ে ফেললেন। জেলের দরজায় একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে তাঁর কপালটা অনেকখানি ফুলে উঠল। অথচ সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালও হ'ল না। "সেই থেকে কিছুদিন পর্যন্ত তিনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন না, কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলেন, ভাবতেন পড়াশুনা করে কি আর হবে?"

১৯৩২ সালে বি.এ. পাস করার পর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে নন্দনকানন গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

সেই সময় ধলঘাট গ্রামে জনবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর

বাড়ীতে স্বর্ধ সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন ক'বে ছিলেন। শ্রীতিলতা ধলঘাট গ্রামে লুকিয়ে পুরুষের বেশে গিয়ে স্বর্ধ সেনের সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন। কল্পনা দত্ত তাঁকে মাস্টারদার সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দিলেন। এই তাঁর সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা।

গবীর বিধবা মা সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এই পলাতক বিপ্লবীদের সেবায়ত্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ কবতেন। ধলঘাট মিলিটারী ক্যাম্প অদূরে অবস্থিত ছিল। শ্রীতিলতা এখানে মাঝে মাঝে এসে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতেন।

একদিন ঐ বাড়ীর উপর পুলিশের নজর পড়ে। ১৯৩২ সালের ১২ই জুন বাত ৮টায় মিলিটারী ও পুলিশ বাড়ী বেঁটন কবে। বাড়ীতে আছেন তখন মাস্টারদা স্বর্ধ সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও শ্রীতিলতা ওয়াদাদার।

তাঁরা সবাই নীচের ঘরে খেতে বসেছিলেন। পাখের শব্দে সবাই উৎকর্ষ হ'য়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি ভিতরের বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা দোতলায় চলে যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেবন ধাক্কা দিবে নীচের ঘরের দরজা খুলে ফেলে। কাউকে না দেখে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে সবাই তৈরী হ'য়েই ছিলেন। দোতলায় ঢুকবার মুখেই নির্মল সেনের গুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামেবন নিহত হয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। কিছুসময় কোনো সাড়াশব্দ নেই। সব নিস্তব্ধ। বিপ্লবীরা অন্ধকারে বেবিঘে যাবার জ্ঞান তৈরী হলেন। নির্মল সেন মিলিটারী বেটনীর অবস্থান লক্ষ্য কববার জ্ঞান সম্বর্পণে বাবান্দার টিনের উপরে উঠতে গেলে শব্দ হ'ব। শব্দ শুনেই গুলীবা গুলী চালায়। নির্মল সেন নিহত হন। মাস্টারদা, শ্রীতিলতা ও অপূর্ব সেন তখন উপর থেকে অন্ধকারে নেমে আসেন। আন্তে আন্তে পূর্বদিকের গড পাব হয়ে পাটিপাতার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা অগ্রসর হন। সন্সন্ শব্দ লক্ষ্য ক'বে গুলী সৈন্তরা গুলী ছুঁড়তে থাকে। অপূর্ব সেন গুলীবিক্র হয়ে নিহত হন। মাস্টারদা ও শ্রীতিলতা বেটনী ভেদ ক'বে অগ্নি গ্রামে ভিন্ন আশ্রয়ে উপনীত হন। সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র বামকৃষ্ণকে ভোবরাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। ধলঘাট গ্রামে ধরপাকডের হিড়িক পড়ে যায়। 'বামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ' নামে একটি লেখা শ্রীতিলতা মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন। লেখাটি এবং অগ্নি কিছু দলিলপত্র এই সময়ে তাঁরা ভোবাতে ফেলে দিয়ে চলে যান। লেখাটি পুলিশের হাতে পড়ে যায়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পরের দিন প্রীতিলতা যখন নিজের বাড়ীতে ভালো মেয়েটির মতো ব'সে আছেন তখন সদলবলে পুলিশ গিয়ে হাজির। বাড়ী খানাতল্লাসী ও নানা প্রশ্নের পর তারা সেদিন চলে যায়। প্রীতিলতা পড়লেন পুলিশের কড়া নজরে। ঘন ঘন বাড়ী তল্লাসী হ'তে লাগল। প্রীতিলতা তখন কাজ করবাব সুবিধার জন্য মাস্টারদার কাছে আত্মগোপন করবার নির্দেশ চাইলেন। মাস্টারদার নির্দেশে তিনি তাঁর কাছেই চলে গেলেন। বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সময় শেষবারের মতো গাইলেন “শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও— জননী এসেছে দ্বাবে”।

প্রায় তিনমাস তিনি মাস্টারদার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের নানা স্থান থেকে ঘন ঘন বিপ্লবাত্মক কাজের সংবাদ আসতে থাকে। ইংবেজ সরকার গ্রামের ভিতরও তোলপাড় ক'বে তোলে। মিলিটারী ও পুলিশ গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সমস্ত জায়গা ছেয়ে ফেলে এবং অত্যাচারের নির্মম চাকা চালিয়ে দেয়। একটা গ্রাম তো জালিয়েই দিয়েছিল। তখন কিসের পড়াশুনা? যুবশক্তি পড়াশুনার কথা ভাবতে পারত না। মিলিটারী ও পুলিশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করা। স্বয়ং সেনের জন্য ঘোষণা করা ছিল দশহাজার টাকা পুরস্কার, প্রীতিলতা ও খাদ্যদারের জন্য পাঁচশত টাকা।

প্রীতিলতা ক্রমে মরিষা হ'য়ে উঠলেন। তিনি মাস্টারদার নিকট থেকে বিশেষ কোনো বিপ্লবী কাজ করবাব আদেশ চাইলেন। অবশেষে অল্পমতি মিললো।

১৯৩৩ সালেব ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ও খাদ্যদারের নেতৃত্বে দশ-বারোজন কর্মী গিয়ে পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন কোয়া ও বিভলভার দিয়ে। ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। কর্মীরা সকলেই অক্ষতদেহে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান। কিন্তু সফলকাম প্রীতিলতা আব ফিরলেন না! তিনি পটাসিয়াম সাই-নাইড খেয়ে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পাহাড়তলী পুলিশ ঘিরে ফেলে। অত্যাচারের অন্ত রইল না।

পুলিসের নির্ধাতনের মুখে প্রীতিলতাকে প্রকাশ্যে প্রহ্লা জানাতে কেউ সেদিন আসতে পারেনি। শহীদ প্রীতিলতার নখর তল্ল সেদিন অজ্ঞাত

অখ্যাত ভাবে ভ্রমীভূত হয়ে গেল। মৃত্যুকালে বয়স ছিল তাঁর মাত্র একুশ বছর।

পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আগের দিন, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন তিনি তাঁর মাকে যে চিঠিখানি লিখে গিয়েছিলেন তা নীচে দিলাম :

“মাগো ! তুমি আমায় ডাকছিলে ? আমাব যেন মনে হ’ল তুমি আমাব শিয়রে ব’সে কেবলি আমার নাম ধ’বে ডাকছ, আব তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা ! স্বতাই কি তুমি এত কাঁদছ ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হযবান হ’য়ে চলে গেলে। স্বপ্নে একবার তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমাব বড় আবদারের মেয়েব আবদাব বক্ষা কবতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমাব সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমাব চোখের জল মুছাতে এতটুকু চেষ্টা কবলাম না। মা ! আমায় তুমি ক্ষমা কব—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিবদিন আমাব বকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমাব ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশজননীর চোখেব জল মুছাবার জন্ত বকেব বক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কবো নইলে আমাব মনোবাহু পূর্ণ হবে না।

“একটিবার তোমায় দেখে যেতে পাবলাম না। সেজন্ত আমাব হৃদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। তোমাব কথা আমি এক মুহূর্তের জন্তও ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা কবি। আমাব অভাব তোমাকে যে পাগল ক’রে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো ! আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছ—‘ওগো, তোমরা দেখে যাও—আমার রাণীশ্রু রাজ্য দেখে যাও।’ তোমাব সেই ছবি আমার চোখের উপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার হ্রস্ব বাজায়। মাগো, তুমি অমন ক’রে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্ত, স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না ? কি করবে মা ! দেশ বে পরাধীন ! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে অর্জরিত, দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভায়ে অবনতা, লাজিতা, উৎসীড়িতা ! তুমি কি সবই নীরবে সহ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

করবে মা? একটি সম্ভাবনাকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে? আর কেঁদোনা মা! তুমি আর চোখের জল ফেলো না। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জাহ্নু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! তোমার সঙ্গে আমি যে দুর্ব্যবহার ক'রে এসেছি সে কথা নিয়তই আজ আমার বুকে শেলের মতো বিঁধে। ইচ্ছা হয় ছুটে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আমায় আদর ক'রে বুকে টেনে নিতে চেয়েছ—আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি—খাবারের থালা নিয়ে আমাকে কত সাধাসাধিই না করেছ—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

“না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দু'দিন ধ'বে সমানে কাঁদিয়েছি—তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে একটুকু টলাতে পারেনি। কি আশ্চর্য মা! তোমার রাগী এত নিষ্ঠুর হ'তে পাবল কি ক'রে? ক্ষমা কবো মা! আমায় তুমি ক্ষমা করো!”

এঁদেরই স্বরণ ক'রে স্বাধীন ভারতের কবি গাইলেন :

“মুক্তির মন্দির-সোপান-তলে

কত প্রাণ হ'ল বলিদান

লেখা আছে অশ্রুজলে।”

কল্পনা দত্ত (যোশী)



চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে কল্পনা দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই। তাঁর পিতা বিনোদবিহারী দত্ত ও মাতা শোভনাবালা দত্ত। পিতৃভূমি চট্টগ্রামেই।

কল্পনা দত্তের ঠাকুদা ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইংবেজ সরকার তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিকে অনেকখানি সম্মান দিত। ফলে তাঁদের বাড়ীটা পুলিশের নজর থেকে বহুদিন নিবাপদ ছিল।

শৈশব থেকেই কল্পনার মনের গঠন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। তাঁর স্পর্শকাতর মন যখন দেখত, কোনো ভিখারী তার দুঃখে বোঝা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, অথবা কোনো দুঃখী এসে তার দুঃখকাহিনী বর্ণনা ক'বে গেল তখন বালিকা কল্পনার মনে এই কামনা জাগত—সংসাবে যেন দাবিদ্র্য না থাকে, দুঃখ না থাকে, সকলেই যেন একসঙ্গে সুখে দিন যাপন করতে পারে। রূপকথাব কল্পনার রাজ্য তাঁর মনে সত্য হয়ে দেখা দিত।

আর একটু বড় হবার পূর্বে প্রায় বাবো বছর বয়স থেকেই তাঁর হাতে এসে পড়ে ক্ষুদিবাম-কানাইলালের জীবনী, ‘পথেব দাবী’ প্রভৃতি স্বদেশী বই। এগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মনে হ’ত ইংবেজ গভর্নমেন্টকে যদি আমরা সবিয়ে দিতে পাবি, যদি আমরা স্বাধীন হ’তে পাবি, তবেই আমাদের দেশের দুঃখ দূর হবে। তাঁর ছোটকাকা তাঁকে আদর্শ দেশসেবিকারূপে গ’ড়ে উঠবার প্রেরণা দিতেন। ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসিক কাজের দিকে তাঁর প্রবণতা জাগে। তিনি তখন নিজেকে ফাঁসীর জ্ঞান মনে মনে প্রস্তুত ক’বে তুলছিলেন।

১৯২৯ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। লেখাপড়া অথবা জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রেই তিনি সর্বদা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক’রে থাকতেন। তাঁর চোখে মুখে ও চেহারায এমন একটা ঐজ্জল্য ছিল যা লোকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করত।

তিনি যখন কলিকাতা এসে বেথুন কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রথম বার্ষিক

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

শ্রেণীতে পড়ছিলেন তখন বাঙ্গনৈতিক ধারাগুলি একে একে তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। কল্যাণী দাসেব 'ছাত্রীসংঘে' তিনি যোগদান করেন। ফলে বেথুন কলেজে হরতাল পালন এবং অগ্নি আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ওদিকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনেব অল্পগামী পূর্ণেন্দু দস্তিদার কল্লনাব মতো একটি প্রস্তুত ক্ষেত্র পেয়ে বিপ্লবের বীজ বপন করবাব চেষ্টা করেন। এইভাবে কল্লনা বিপ্লবীদের প্রথম সংস্পর্শে আসেন।

এমন সময় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অগ্নিগাব লুণ্ঠন হয়—নেতা সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে। তখনো সূর্য সেন অর্থাৎ মাস্টারদার সঙ্গে কল্লনা দস্তেব যোগাযোগ হয় নাই। ঐ অগ্নিগাব লুণ্ঠনের পব কল্লনা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিপ্লবী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবাব জন্য। তাব কয়েকদিন পবেই তিনি চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বিপ্লবী মনোবজ্ঞন বাঘেব মাঝফত সূর্য সেনেব সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মাস্টারদা তখন নিজেই কল্লনাব সঙ্গে যোগাযোগেব ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রশস্ত্র ও গোপন জিনিস তিনি নিজেব বাড়ীতে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন।

১৯৩০ সালেব শেষেব দিকে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি চট্টগ্রাম অগ্নিগাব লুণ্ঠনেব অনেক পলাতকই গ্রেপ্তার হয়ে চট্টগ্রাম জেলেব হাজতে ছিলেন। তাঁরা জেলেব ভিতবে ও বাইবে বহু স্থানে ডিনামাইট বসিয়ে নানা জায়গা উড়িয়ে দিয়ে জেলেব বন্দীদের মুক্ত করতে এবং চট্টগ্রামেব পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও ট্রাইবুনালেব প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে আক্রমণেব ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে মাস্টারদাব সঙ্গে ১৯৩১ সালেব মে মাসে কল্লনা দস্তেব দেখা হয় এবং মাস্টারদার নির্দেশমতো তিনি কাজ করতে থাকেন। ফলে তিনি এই ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কল্লনা দস্ত কালিকাতা থেকে বোমা তৈরী করবার মালমশলা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান এবং চট্টগ্রামের বাড়ীতে বসে গান্-কটন্ তৈরী করতে থাকেন। সেগুলি চলে যেতো জেলেব ভিতবে। এই সময় চট্টগ্রাম জেলেব অনন্ত সিং প্রভৃতির সঙ্গে মাস্টারদাব যোগাযোগ রক্ষা হ'ত কল্লনা দস্তেব মাধ্যমে। ১৯৩১ সালে ঐ ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রেব পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার আগের দিনই পুলিশ সেটা আবিষ্কার ক'বে ফেলে। যদিও পুলিশ কল্লনা দস্তেব বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পায় নাই, কিন্তু তারা তাঁকে সন্দেহ ক'রে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার আদেশ দেয়, অর্থাৎ তাঁকে শুধু চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে বি.এসসি. পড়বার

অল্পমতি দেয় এবং কলেজ থেকে বাড়ী যাতায়াত ছাড়া অল্প যাতায়াত বন্ধ ক'রে দেয়।

সেই সময় তিনি অনেকদিন বাত্রে পালিয়ে গ্রামে চলে যেতেন এবং স্বর্ষসেন, নির্মল সেন প্রভৃতির সঙ্গে দেখা কবতেন, বিভলভাব ছুঁতে অভ্যাস করতেন। তিনি একদিন মাস্টারদার সঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদাবের পবিচয় কবিষে দিলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্তকে দিয়ে মাস্টারদা কিছু দাবিত্তপূর্ণ কাজ কবাবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। পাহাড়তলী ইথোবোপীযান ক্লাব আক্রমণ, কববার জ্ঞাত এইদেব দুজনের যাবাব কথা ছিল। ঐ কাজেব এক সপ্তাহ পূর্বে কল্পনা গ্রেপ্তার হযে যান। পাহাড়তলী ইথোরোপীযান ক্লাব আক্রমণেব প্রস্তুতিব জ্ঞাত কল্পনাকে মাস্টারদা ডেকে পাঠিষেছিলেন। যে পথ দিয়ে তাঁব কাছে যেতে হবে সেই এলাকাব একটি মেযেব পক্ষে একা যাওয়া তখন নিবাপদ ছিল না। সেজ্ঞাত কল্পনা পুরুষেব বেশে মাস্টারদাব সঙ্গে দেখা কবতে রওনা হন। বিস্তৃত পথে ঐ বেশেই তিনি গ্রেপ্তার হ'যে যান। একমাস পরে পুলিস কোনো কিছু প্রমাণ না পেযে তাকে জামীনে পালাস দেয়। মামলা ছিল '১০২ ধারাব' 'ভ্যাগাবণ্ড কেস'। তখন তিনি মাস্টারদাব নিদেশে আত্মগোপন কবেন।

তিনি যখন মাস্টারদাব সঙ্গে গৈবালাতে ক্ষীবোদপ্রভা বিশ্বাসেব বাড়ীতে পলাতক ছিলেন তখন ১৯৩৩ সালেব ১৬ই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ মিলিটারী এসে বাত্রে সেই বাড়ী ঘেরাও ক'রে ফেলে। মাস্টারদার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে আত্মগোপন ক'বে ছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণীন্দ্র দত্ত, স্বশীল দাশগুপ্ত ও ব্রজেন সেনগুপ্ত। মিলিটারী বাড়ী ঘেরাও কবেছে টেব পেয়েই বিপ্লবীবাব পালিয়ে যাবাব জ্ঞাত সন্তর্পণে এগিয়ে যান। একপাশে খাদ, অন্যপাশে পুকুর—মাঝখানে বাঁধেব উপর বাঁশঝাড়ের সংকীর্ণ পথে অগ্রসব হন তাঁরা। মিলিটারী ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে সংগ্রাম চলে। মিলিটারীব লোকেরা ইলুমিনেটিং বোমা ছুঁড়ে দিবালোকের মতো আলো ক'বে ফেলে বিপ্লবীদের দেখতে পায়। বেয়নেট চার্জ ক'রে বাঁশঝোপের মধ্যে অবস্থানকারী বিপ্লবী-বীর স্বর্ষসেন ও ব্রজেন সেনকে তারা ধবে ফেলে। শান্তি চক্রবর্তী ও স্বশীল দাশগুপ্ত গুলী করতে করতে অস্ত্রধীন হন। কল্পনা দত্ত মাস্টারদার সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তিনি পড়লেন সিনে ডোবায়। ডোবায় ছিলেন মণীন্দ্র দত্ত। ডোবা থেকে দুজনেই উঠে একটা বাঁশঝোপে আশ্রয় নিয়ে পুনরায় তাঁরা গুলী চালাতে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

লাগলেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার একটা পুকুরের মধ্যে তাঁরা প্রায় একঘণ্টা ডুবে রইলেন শুধু নাকটুকু বের ক'রে। সেখান থেকে বহুকষ্টে তাঁরা মিলিটারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

ওদিকে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে হাতে ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে সিপাহীরা টেনে নিয়ে যায় পটিয়া থানার দিকে। মাস্টারদা দড়ির টান সামলাতে না পেরে পথিমধ্যে কষিত জমির মাটিব ঢেলার উপর প'ড়ে যান।

সন্ধ্যায় মিলিটারী রিজার্ভ-ট্রেনে উঠিয়ে তাঁদের বোলোশহর স্টেশনে আনা হয়। সেখানে ট্রেনের কামরায উঠে গোয়েন্দা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক সার্জেন্টরা মাস্টারদার নাকে মুখে নির্মমভাবে ঘুষি মাবতে থাকে। তাঁর নাক থেকে বক্তশ্রোত বয়ে চলে, মাস্টারদা মুর্ছিত হয়ে পড়েন। জল দিয়ে তাঁকে কিছু স্নান ক'বে আই.বি. অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখালে পিঠ লাগিয়ে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে দাঁড করিয়ে রাখা হয়। তারপর এস.পি. হিন্ড এবং এ.এস.পি. স্প্রিংফিল্ড এসে ক্ষিপ্তকুকুরের মতো তাঁদের মারতে আরম্ভ করে। বোলোশহরের ঘটনাব কথা বলার পর প্রহার বন্ধ হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

মাস্টারদাকে জেল থেকে বের ক'রে আনবার জন্ম বাইরে অবস্থিত বিপ্লবীরা একটা প্রস্তুতি করতে লাগলেন। প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ তখন একদিন হঠাৎ তাঁদের একটি কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজ-পত্র ও রিভলভার পাওয়া যায়। ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ফলে মাস্টারদাকে নির্জন কক্ষে মিলিটারী প্রহরায় রাখা হয় এবং বৈদ্যাতিক তার দিয়ে জেলপ্রাচীর ঘিবে দেওয়া হয়।

এই সময়ে গ্রামে গ্রামে মিলিটারীর অত্যাচারের অবধি ছিল না। চট্টগ্রামকে 'মিলিটারী এরিয়া' ঘোষণা করা ছিল। প্রতি গ্রামেই ছিল মিলিটারী ক্যাম্প। আত্মগোপন ক'রে থাকা তখন অতি কঠিন কাজ। সেজন্ম অবিরাম আশ্রয়স্থান পরিবর্তন করতে করতে কল্লনা দত্ত, তারকেশ্বর দত্তদার, মনোরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দে এবং অর্ধেন্দু সমুদ্রের কাছে গাহিরা নামে একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে কয়েকদিন আত্মগোপন ক'রে থাকার পর ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে তারিখে অতিভোরে মিলিটারী এসে অবিশ্রান্ত গুলীবৃষ্টি করতে থাকে। বিপ্লবীপক্ষেরও গুলী চলে। যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবী মনোরঞ্জন দত্ত নিহত হন। আশ্রয়দাতা পূর্ণ ডালুকদারও

নিহত হন, তাঁর ভাই নিশি তালুকদার আহত হন মারাত্মকভাবে। বিপ্লবীদের গুলী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবার পরে সকলেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। মিলিটারী স্ববাদার কল্পনা দত্তকে ভীষণ এক চপেটাঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মিলিটারী সৈনিকরা তীব্র প্রতিবাদ করে। বিপ্লবী তাবকেশ্বর দস্তিদারের চোখে লোহার কাঁটাওলা মিলিটারী বুট দিয়ে তারা এমন লাথি মাবে যে, তাঁর চোখ থেকে দবদব ধাবায় বক্ত বের হ'তে থাকে। পরে বাস্তা দিয়ে বেঁধে নিষে যাবার সময় আবাব তাঁকে হাণ্টাব দিয়ে মারতে থাকে। তাঁদের গ্রেপ্তার ক'বে হাটিয়ে নিয়ে যাবার পথে অগ্র ছেলেদের মতো কল্পনা দত্তকেও হাতে হাতকড়া লাগিয়ে এবং কোমবে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়।

এই মামলাব নাম ছিল 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেন্ড সান্টিমেন্টাবী কেস'। এব চাজ ছিল বাঙ্গদ্রোহ, ষডযন্ত্র, বিস্ফোবক আইন, অস্ত্র আইন, ইত্য প্রভৃতি। এই মামলাব আসামী ছিলেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনেব সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, তাবকেশ্বর দস্তিদাব এবং কল্পনা দত্ত। মামলার রায়ে সূর্য সেন ও তাবকেশ্বর দস্তিদাবেব ফাঁসীর আদেশ এবং কল্পনা দত্তেব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবেব আদেশ হয়।

১৯৩৭ সালেব ১২ই জানুযাবি বাত্রি ১২টাব সময় বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সূর্য সেন ও তাঁব যোগ্য শিষ্য তাবকেশ্বর দস্তিদাবেব ফাঁসী হয়ে যায়। সেই সাধনাপূত মৃতদেহ দুটি কোথায় গেল আজও তা কেউ জানে না।

কল্পনা দত্ত প্রায় ৬ বছর জেলে থাকাব পর মুক্তি পান ১৯৩৯ সালেব মে মাসে। বি.এস্.সি. পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে তিনি গ্রেপ্তার হন, মুক্তির পর ১৯৪০ সালে তিনি বি এ পাস কবেন।

১৯৪০ সালেব নভেম্বর থেকে ১৯৪১ সালেব ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে।

বিপ্লবীব দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা যেন সেদিন বিপদকে প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান ক'রে ফিরছিল। বিপ্লব জীবনকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে করতে ছুটে চলেছিলেন আত্মাহুতি দিতে উন্মুখ বিপ্লবীরা। বরেন্য বিপ্লবী মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদাবেব সঙ্গে কল্পনা দত্তের নামও বিপ্লবেব ইতিহাসে একসঙ্গে লিখিত হবার দাবী রাখে।

১৯৪৩ সালেব ১৪ই আগস্ট কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।



উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়)



১৯১৪ সালের ২১শে নভেম্বর ঢাকা শহরে উজ্জ্বলা মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্ববেশচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা জেলায় কুসুমহাটির স্ববেশচন্দ্র মজুমদারদের জমিদার-পরিবার সাহসে ও দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ ব'লে পরিচিত ছিল।

আট বছর বয়সে উজ্জ্বলার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা ছিলেন বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত। ১৯২৮ সালে উজ্জ্বলার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর বাবা কলিকাতা থেকে ঢাকা শহরে দু-একটি অস্ত্র নিয়ে যাবার প্রয়োজনে নিজেই কলার কোমরে ঐ অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে ঢাকা চলে যান। মুখে বিপ্লবের কথা বলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই সেখানে ছিল না। তাঁকে দিয়ে এই বিপ্লবী কাজ করানোর অর্থ ই ছিল তাঁকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। উজ্জ্বলা বুঝলেন ইংরেজের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তি পাবার এই প্রকৃষ্ট পথ। তিনি 'বি.ডি.' নামক বিপ্লবীদলে যোগদান করেন।

১৯৩০—৩২ সাল বাংলার ইতিহাসে তথা ভারতের ইতিহাসে এনেছিল মহা কর্মসাধনার কাল। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ক'রে তুলেছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজ-বিরোধী, অণ্ডদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাইটার্স বিন্ডিংসে বিপ্লবীদের কাণ্ড, লোম্যান-সিম্প্‌সন-পেডি-গার্লিক-স্টিভেন্স-ক্যামেরন-

ডগলাস-বার্জ হত্যা; এবং হডসন-নেলসন-ভিলিয়ার্স-ক্যাসেল-গ্রামবি-ডুনো-জ্যাক্সন প্রমুখের রক্তাক্ত রূপ ভারতবাসীকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে ভয়ভঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল।

এদেশের নারী তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ। শাস্তি, স্বনীতি ম্যাজি-স্ট্রেট স্টিভেন্সকে নিহত করেছেন। বীণা দাস কলিকাতা সেনেট-হলে গভর্নর জ্যাক্সনকে গুলী করেছেন, প্রীতিলতা ওবাদাদার শহীদ হয়েছেন। ওদিকে 'বেণু', 'স্বাধীনতা' পত্রিকা এবং 'চলার পথে' প্রভৃতি পুস্তক বিপ্লবের পথে আত্মাহুতি দেবার জন্ত যুব-বাংলাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেই আহ্বান সেই যুগে তরুণ-তরুণীদের চিত্তে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল। উজ্জ্বলাও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উজ্জ্বলা ছাত্রীদের মধ্যে ও তরুণীদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত ক'বে চলেছিলেন। তাঁদেব বাড়ীটা তখন ছিল বিপ্লবীদের একটা আড্ডা। নির্বিরোধ বিমাতা এবং স্নেহশীল। ঠাকুরমা কোনোদিকেই নজব দিতে পারতেন না। পিতাও অধিকাংশ সময় ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কলিকাতা থাকতেন।

১৯৩৭ সালের মে মাসে পুলিশের সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা ক'রে কয়েকটি তরুণ ও একটি তরুণী দার্জিলিং এসে পৌঁছলেন একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

দার্জিলিং-এর স্নো-ভিউ হোটলে উঠলেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী এবং জুবিলি স্নানাটোরিয়ামে উঠলেন ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী। একটি হারমোনিয়ামের মধ্যে উজ্জ্বলা মজুমদার এনেছিলেন দুটি আগ্নেয়াস্ত্র দুর্ধর্ষ গভর্নর এণ্ডারসানের উপর আক্রমণের জন্ত।

প্রথমজীবনে গ্রামে থাকায় উজ্জ্বলার পাঠ্যজীবন দেরীতে আরম্ভ হয়। প্রায় কুড়িবছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ঠাকুরমাদের জানালেন পরীক্ষার পর বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছেন কয়েকদিনের জন্ত। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে একবস্ত্রে চলে আসেন তিনি কলিকাতা, তারপর দার্জিলিং।

দার্জিলিং পৌঁছে তাঁরা শুনলেন গভর্নর একটি 'ফ্লাওয়ার শো'-তে আসছেন। কৌশলে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলেন কিন্তু কাজ সমাধা করা সম্ভব হ'ল না। তবু তাঁরা উৎসাহ হারালেন না।

সেদিন ৮ই মে ১৯৩৪ সাল। দার্জিলিং সহরে লেবং-এর মাঠে ঘোড়দৌড়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

হচ্ছে। গভর্নর এগারসন উপস্থিত থাকবেন। স্ত্রীনাটোরিয়াম থেকে দামী ইওরোপীয় পোশাক প'রে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে লুক্কায়িত আছে গুলীভরা রিভলভার। তাঁদের দূর থেকে অন্তসরণ ক'বে চললেন উজ্জলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। উজ্জলা মজুমদারের পরনে একটি রঙীন শাড়ী, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী পরিধান করেছেন স্বদেশী পরিচ্ছদ।

ঘোড়দৌড়ে মাঠে সকলেই উপস্থিত হলেন। গভর্নর তাঁর আসনে উপবিষ্ট। ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী গভর্নরের কাছাকাছি রিভলভারের তাক-মতো জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছেন। এখন প্রার্থিত লগ্নের অপেক্ষা।

এদিকে দলের নির্দেশমতো উজ্জলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর কাজ হয়ে গেছে। তাঁরা লেবং ত্যাগ কবলেন। দার্জিলিং স্টেশনে এসে অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁরা ট্রেনে উঠে বসলেন। টিকিট কবাই ছিল। ততক্ষণে লেবং-এর মাঠে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছে।

সফ্যার একটি আগে শিলিগুড়িতে ট্রেন এসে পৌছালে পুলিশ-বাহিনী হস্তদস্ত হয়ে ট্রেন ঘেবাও করল। টেলিফোন-কলে তাঁরা আদেশ পেয়েছে ট্রেন তল্লাসী ক'বে একটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে। তার চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, পরনে গোলাপী রঙের শাড়ী ও গায়ের রং গৌর। পুলিশের দৃষ্টি উজ্জলা মজুমদারের উপরেও পড়ল। কিন্তু তাঁর চোখেও চশমা নেই, পবনেও সাদা শাড়ী।

তাঁরা দুজনে কলিকাতা এসে পৌছালেন। অবশেষে পুলিশ উজ্জলা মজুমদারকে খুঁজে বের করল ভবানীপুরে শোভারানী দত্তের বাসায়। শোভারানী 'যুগান্তর'-দলের কর্মী। রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে তখনকার দিনে যেকয়েকটি মহিলা অগ্রসর হয়েছিলেন শোভারানী দত্ত তাঁদের অগ্রতম। শোভারানী দত্তের বাসা থেকে ১৮ই মে উজ্জলা মজুমদার ও শোভারানী দত্তকে গ্রেপ্তার ক'বে পুলিশ নিয়ে যায়। শোভারানী অবশ্য লেবং যডযন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু এই স্বত্রে তাঁর দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না।

উজ্জলাকে আনা হয় প্রথমে কার্দিয়াং জেলে এবং পরে দার্জিলিং জেলে। তাঁর বিপ্লবী বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী দার্জিলিং জেলে ছিলেন আগে থেকেই। কলিকাতা থেকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছিল মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী, স্কুমার ঘোষ প্রভৃতিকে।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের মামলা শুরু হয়েছে। সকলেই মৃত্যুদণ্ডাঙ্ক শুনবাব জ্ঞাত প্রস্তুত। বিচারে ভবানী ভট্টাচার্য, ববি ব্যানার্জী ও মনোবঞ্জন ব্যানার্জীর ফাঁসীও হকুম হয়, উজ্জ্বলা মজুমদারের সাজা হয় বিশ বৎসরের সশ্রম কাবাদণ্ড, অপব বন্দীদের সাজা হয় দ্বীপান্তবেব। হাইকোর্টের আপীলের বায়ে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসীও হকুম বহাল বইল। মনোবঞ্জন ব্যানার্জী ও ববি ব্যানার্জীর বিশ বৎসব এবং উজ্জ্বলা মজুমদারের চৌদ্দ বৎসব সশ্রম কাবাদণ্ডের আদেশ হ'ল। দণ্ডিত বন্দীরা অন্তর্যামনে দ্বীপান্তবিত হন। উজ্জ্বলা মজুমদারকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে।

১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ছিল ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসীও তারিখ। বেথেছিল তাঁকে বাজসাহী সেনট্রাল জেলে। অতীদিকে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলের করুকক্ষে আবদ্ধ উজ্জ্বলা মজুমদার। দুর্গম পথেব সহযাত্রী, বন্ধু ও সতীর্থ ভবানীর কথা তাঁব বিনন্দ্র বজনীতে বাব বাব মনে পড়ে। সে-বাতের স্মৃতিবাহিনী উজ্জ্বলা প্রায় এক যুগ পাবে নিজেই লিখেছিলেন—“তাবপব বাজসাহী জেলের এক অসহ্য বাত। . দূবাস্তব অপব এক জেলে বসে শুন, বাত্রিব গভীরে কিশোর বন্ধুব কণ্ঠে তুলে দিযেছে ফাঁসীও বজ্র বিদেশী শাসক। মুহূর্তে ধূলায় গড়িযেছে তাব সোনার শবীব। সে ভঃসহ বজ্রনীব ব্যথাবিশুব ইতিহাস জীবনে ভুলবাব নব। কিন্তু তাবো মধ্যে ছিল এক পবম বাণী। সাবাবাত সেই বাণীকে স্পশ কবতে চেখেছিলাম ভবানীবই কণ্ঠে বাবে বাবে শোনা ববীন্দ্রনাথের একটি গানে—

‘কাপিবো না ক্লাস্ত কব

টুটিবে না বাণী,

নবীন প্রভাত লাগি

দীর্ঘ বাত্রি বব জাগি

দীপ নিবাবে না।’ ”

তাবপব বাংলাদেশেব নানা জেলে কেটে গেল উজ্জ্বলাব বন্দীজীবনের পাঁচটি বছব।

অবশেষে মহাত্মা গান্ধীব প্রচেষ্টায় অন্ত্যান্ত বন্দীদের সঙ্গে ঢাকা জেল থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে উজ্জ্বলা মজুমদার মুক্তি পান।

চলে আসেন তিনি কলিকাতায়। ১৯৪২ সালে আরম্ভ হয় শেষ জাতীয় সংগ্রাম ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক’রে উজ্জ্বলা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পুনবায় গ্রেপ্তার হন। পুলিশ তাঁকে নিবাপত্তা আইনে বন্দী ক'বে রেখে দেয় প্রেসিডেন্সি জেলে।

১৯৪৬ সালেব ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর বন্ধুদের সঙ্গে তিনি 'ফবওয়ার্ড ব্লক' দল গঠনে অগ্রসর হন।

নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয়ে যাবাব পর সেখানে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়ে তিনি সেবাব কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭৭ সালে এল স্বাধীনতা। তখন শবৎচন্দ্র বসু'র নেতৃত্বে গঠিত সোশ্যালিস্ট বিপ্লবিকান পার্টির সঙ্গে তিনি যুক্ত হ'ন। জেলেব মধ্যে তিনি বিএ এবং মুক্তির পর বিএটি পাস করেন।

বাবাস'তে বাজাবহাট থানাব অল্পমত শ্রেণী অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে 'পল্লী নিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি ও তাঁব বন্ধুবা মিলে সংগঠন করেন এবং এই সমিতিব মধ্য দিয়ে তিনি বর্তমানে সমাজসেবাব কাজে সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৪৮ সালেব ১১ই মার্চ বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ভূপেন্দ্রকিশোর বসু'র বায়েব সঙ্গে তাঁব বিবাহ হয়।

জ্যোতিকণা দত্ত (বেরা)



জ্যোতিকণা দত্ত জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লায় মামাবাড়ীতে। তাঁদের দেশ কুমিল্লা জেলাব কালিকছে। তাঁব পিতা মোহিনীমোহন দত্ত ও মাতা চাকনলিনী দত্ত।

স্বাধীনচেতা নির্ভীক পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন জ্যোতিকণাব পিতামহ। তিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ধর্মের সমন্বয় কববাব জ্ঞাত আববী, ফার্সী, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা শিখে গীতা, কোবান, বাইবেল অন্তবাদ ক'বে জ্যোতিকণা প্রভৃতি নাতনী ও নাতিদেব শোনাতেন। জ্যোতিকণাব কাকা হচ্ছেন স্বনামধন্য বিপ্লবী উল্লাসকব দত্ত।

ছোটবেলা থেকেই জ্যোতিকণা লেখাপড়ায় ভালো ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রীজীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম স্থান অধিকাব কবেছেন। কিন্তু তখনকাব দিনেব বিক্ষুব্ধ হাওয়া অনেক ভালো ছাত্রীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আকর্ষণ ক'বে নিত। বিপ্লবেব আহ্বান নিয়ে বন্ধু বনলতা দাশগুপ্ত যখন তাঁব সামনে এসে দাঁডালেন তখন তিনি তাঁকে ফিবিযে দেন নাই।

জ্যোতিকণা দত্ত বিপ্লবীদলেব সভ্য ছিলেন না, কিন্তু বৈপ্লবিক কাজেব প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁব মনে ছাপ ফেলেছে, এমন সময় একদিন বনলতা দাশগুপ্ত কয়েকটি পিস্তল এনে তাঁকে দিলেন লুকিয়ে বাখতে। দায়িত্ব তিনি গ্রহণ কবলেন। ডায়োসেসান কলেজেব বোর্ডিং-এ তিনি থাকতেন। ঐ কলেজেব তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীব ছাত্রী ছিলেন তিনি ও বনুলতা ১৯৩৩ সালে।

হঠাৎ একদিন বোর্ডিং-এব কোনো ছাত্রীব টাকা চুবিব জ্ঞাত তল্লাসী হয় বোর্ডিং-এর সমস্ত মেয়েদের বাক্স এবং বিছানা। টাকাব জ্ঞাত তল্লাসী করতে গিয়ে জ্যোতিকণাব জিনিসপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত পিস্তলগুলি ধরা পড়ে যায়। কলেজের কতৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেন এবং জ্যোতিকণা গ্রেপ্তার হয়ে যান। অস্ত্র-আইনে তাঁর চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

জেলের মধ্যে যেসব বন্দিনী আপন স্বভাবমাধুর্যে সকলকে মুগ্ধ ক'রে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

রেখেছিলেন, জ্যোতিকাণা তাঁদের অত্যন্ত। এমন স্নিগ্ধ মধুর স্বভাব, এমন শিশুর মতো সরলতা, এমন আত্মবিশ্লেষণ ক'রে ক'রে নিজেকে বিচার করা এ যেন জ্যোতিকাণার মতো মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

মুক্তির পব তিনি ডাক্তারী পাস করেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মতিরাম বেরা নামে একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে তিনি লণ্ডনে আছেন। সেখানেই তাঁর স্বামী স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

পারুল মুখার্জী

ও

উষা মুখার্জী

★



পারুল মুখার্জী

পারুল মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায় ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁর ছোট ভগ্নী উষা মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে। তাঁদের পিতা গুরুপ্রসন্ন মুখার্জী, মাতা মনোরমা দেবী। অতুলীন-দলেব বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অমূল্য মুখার্জী ছিলেন তাঁদের বড় ভাই। পিতৃভূমি তাঁদের ঢাক। বিক্রমপুরের বাহেরক গ্রামে। কিন্তু মাহুষ হন তাঁরা কুমিল্লায়।

দাদা অমূল্য মুখার্জীর গভীর প্রভাব ছিল এই পরিবারের প্রত্যেকটি মাহুষের উপর। দুই ভগ্নী পারুল ও উষা ছোটবেলা থেকে দেখেছেন বাড়ীতে দাদার জন্ত পুলিশের অত্যাচার ও হামলা এবং বিপ্লবী ভাইয়ের অনমনীয় দৃঢ় মনোভাব। এই পারিপার্শ্বিকে মাহুষ হবার ফলে একটু বড় হয়েই তাঁরা দাদার অঙ্গগামী হন।

১৯২৯ সালে কুমিল্লায় একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পারুল ১৪ বছর বয়সে এই সম্মেলনে মেয়েদের নিয়ে কলিকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেন। উষা ছিলেন এই বাহিনীর একটি উৎসাহী কর্মী। ক্রমে পারুল ও উষা দুই ভগ্নীই ‘অতুলীন সমিতি’তে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ছোট বোন উষা মুখার্জী ছিলেন যেমন ডানপিটে তেমনি বেসরোয়া। তাঁর সাহস ও সদাহাসি মুখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। লাঠি-ছোরা খেলতে, কুচকাওয়াজ করতে তিনি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৪ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে হিজলী জেলে রাজবন্দীরূপে আটকে রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

বড ভগ্নী পারুল মুখার্জী ১৯৩২ সালে কুমিল্লায় স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৩ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুলিশ তাঁর নামে ওষারেন্ট বার ক'বে খোঁজ করতে থাকে। সেই সময়ে তিনি পলাতক হন। তিনি রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানে অন্তরীণ-দলের সংগঠন গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছিলেন।

এই সময়ে টিটাগড়ের একটি পল্লীর মধ্যে বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কাজের এক বিরাট আয়োজন চলেছিল। তাঁদের এখানকার বাসাটিকে সন্দেহমুক্ত বাথবার জন্য পলাতক পারুল মুখার্জীকে খুলনা থেকে টিটাগড়ের বাসায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর উপস্থিতিতে বাসাটি সাধারণ গৃহস্থের বাসার রূপ ধারণ করে। সেখানে থেকে অন্তরীণ-দলের বিপ্লবীরা বোমা বারুদ প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা করছিলেন। ডিনামাইট এবং অগ্নাশ্রয়ী সংগ্রহের ব্যবস্থাও চলেছিল।

১৯৩৫ সালের ২০শে জানুয়ারি ভোর চারটার অসংখ্য পুলিশ টিটাগড়ের বাসাটা ঘিরে ফেলে। টের পেয়েই বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্রামবিনোদ পাল ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে একতুলার ছাদ থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন। লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন।

পারুল মুখার্জীও তাঁদের সঙ্গে ছাদে উঠেছিলেন। কিন্তু কি যেন মনে ক'রে তিনি উঠোদিকে লাফ দিয়ে উঠানে প'ড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে এক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পারুল মুখার্জী। তিনি কাগজপত্রগুলি নিশ্চিহ্ন করবার আশায় তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ অর্ধদগ্ধ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করে। সেই বাসাতে পুলিশ পায় পিস্তল, বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা-তৈরীর ফরমুলা প্রভৃতি। পারুল মুখার্জী গ্রেপ্তার হলেন।

পারুল মুখার্জীকে পুলিশ-হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে ইতর ভাষায় গালাগালি করেও যখন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি তখন গোয়েন্দা-অফিসার উৎপীড়নের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পারুল মুখার্জীর দিকে ছুটে যায়। পারুল

চীৎকার ক'রে জুতো ছুঁড়তে থাকেন—কিন্তু কথতে পারছিলেন না। এমন সময় চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আর-একটি গোয়েন্দা-অফিসার ছুটে এসে এই অফিসারকে ধমকাতে থাকেন—“আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছেন না—আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।”—পশুটা নিরস্ত হ'ল।

রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুক্তোত্তমের প্রচেষ্টার মামলা আলিপুর কোর্টে একটি ট্রাইবুনালের অধীনে আরম্ভ হয়। এর নাম ছিল ‘টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা’। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে এই মামলার রায় বেরোয়। মোট ১৭ জনের সাজা হয়। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রফুল্ল সেনের চৌদ্দ বৎসর, শ্যামবিনোদ পালের দশ বৎসর এবং অন্যান্য অনেকেরই কঠিন শাস্তি হয়। পারুল মুখার্জীও তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তাকে নানা জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ত। ১৯৩৬ সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তখনকাব একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জেলের নিয়ম হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের ওয়ার্ডের ভিতবে তালাবন্ধ হ'তে হবে। একদিন তিনি বিকালবেলা প্রেসিডেন্সি জেলের ক্ষুদ্র ফিমেল-ইয়ার্ডের চত্বরে পায়চাৰি করছিলেন। তখনো লক-আপ হবার প্রায় আধঘণ্টা-পয়তাল্লিশ মিনিট বাকী ছিল। এমন সময় মেট্রন তাব ডিউটি তাড়াতাড়ি সমাধা করতে গিয়ে পারুল মুখার্জীকে তখনই লক-আপ হ'তে বলে। পারুল মুখার্জী অসময়ে ওয়ার্ডে ঢুকতে অস্বীকার করাতে মেট্রন জোর ক'রে তাঁকে ওয়ার্ডে ঢোকাতে চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ পারুল মেট্রনকে করলেন এক চপোটাঘাত। মেট্রন মাটিতে পড়ে গেল। মেট্রনকে মারা? জেলের জমাদারনী ও লাল-কালো-বিজ্ঞাধারী কয়েদীরা ছুটে এসে পারুল মুখার্জীকে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে উত্তত হ'ল। গোলমাল শুনে অন্যান্য রাজবন্দী মেয়েরা তখনি এসে পড়লেন। তাঁকে আর মারা হ'ল না। মেট্রনের গায়ে আঘাত করায় অপরাধে পারুল মুখার্জীর শাস্তি হ'ল জেল-কোড অনুসারে। বেপরোয়া পারুল এসব শাস্তি হেসেই উড়িয়ে দিতেন।

১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় পারুল মুখার্জী অন্যান্য মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পান।

সাবিত্রী দেবী



চট্টগ্রামে ধলঘাট নামক গ্রামে ৬নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আশ্রয় দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা বিপ্লবী সূর্য সেনকে অর্থাৎ মাস্টারদাকে। মাস্টারদার অন্তর্গত কর্মী নির্মল সেন, অপূর্ব সেন এবং প্রীতিলতা ওষাদ্দার তখন সেখানেই আত্মগোপন ক'রে ছিলেন।

১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাতে মিলিটারী এসে হঠাৎ সেই বাড়ী ঘিরে ফেলে। মিলিটারী ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে বেধেছিল তুমুল সংগ্রাম। বিপ্লবীদের গুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের প্রাণহীন দেহ ভুলুষ্ঠিত হয়। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন মিলিটারীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। সেই দারুণ গোলমালের মধ্যে মাস্টারদা প্রীতিলতাকে নিয়ে অন্তর্ধান হন।

বিপ্লবীবীর সূর্য সেন ও তাঁর অণুবর্তীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে সাবিত্রী দেবীর এবং তাঁর একমাত্র ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর প্রতি চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে জেলে রেখে দেওয়া হয়।

নিষে গেল তাঁদের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তখন কাটারিয়া—যেন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার একটা প্রতিমূর্তি। রামকৃষ্ণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'য়ে জেল-হাসপাতালে নামমাত্র চিকিৎসাধীন রইলেন। তাঁর শীর্ণ দুর্বল পা-দুখানিতে লোহার ডাঙাবেড়ি পরিয়ে দেওয়া আছে। লোহার ডাঙা বহন করছেন যক্ষ্মারোগী শুয়ে-শুয়েও। রোগের অসহ্য যাতনা ও কাশির যন্ত্রণার সঙ্গে বেজে চলেছে পায়ের শৃঙ্খল। বোধকরি ইংরেজ শাসনের চরম বর্বরতার এক পৈশাচিক পরিচয় পেয়েছিল সেদিন মেদিনীপুর জেলের হাসপাতাল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাটারিয়া ছিলেন ডাক্তারও। তিনি ডাক্তারি কতখানি করেছেন সে-পরিচয় জানি না, কিন্তু তাঁর নির্ধাতনের এক চরম রূপ ছাপ রেখে গেছে হাসপাতালের যক্ষ্মারোগীর প্রতিটি নিশ্বাসে। ঐ জেলেরই ফিমেল-ইয়ার্ডে মা সাবিত্রী দেবী অসুস্থ পুত্রকে একবার দেখবার

জন্ম কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বুখাই মাথা কুটে মবেছেন, অন্তমতি মেলেনি।

একদিন মেদিনীপুর জেলের সিপাইদল কোনো ছুতোয় বিপ্লবীদের একদলকে আক্রমণ কবে। প্রতিবোধ কবতে গিয়ে বিপ্লবী অমূল্য সেন ছ'চাবজন সিপাইকে এবাশায়ী কবেন। তখন সিপাইদল তাঁব উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁব মাথা ও হাত ভেঙে দেব। সংকটাপন্ন ও অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে আনা হয় জেল-হাসপাতালে। বহুক্ষণ পবে যখন তাব জ্ঞান ফিবে এল, তিনি দেখলেন তাব পাশে স্নেহকাতর উদ্বেগাকুল দৃষ্টি নিখে বসে আছেন দুর্বল কম্ব বানরুক্ষ। ডাঙাবেডিব ভাবে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাবছেন না। অতিক্ষণ স্ববে মমতাব সঙ্গে তাকে সাশ্বনা বাক্য ব'লে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিখে, পাত্বেব ডাঙা অতিকষ্টে টেনে নিয়ে নিজেব শয্যাখ চলে গেলেন মৃত্যুপথবায়। বানরুক্ষ। অমূল্য সেন বেঁচে উঠেছিলেন। কিন্তু বানরুক্ষের দিন ফবিবে এসেছিল। দোপ নিবে গেল কিন্তু ডাঙাবেডি তাঁব দেহ থেকে অপস্থত হ'ল না। জীবিতকালে মাবেব সঙ্গে শেষ দেখা তাঁব হয়নি একই জেলে থাকা সস্বৈও। মৃত পুত্রকে দেখাবাব জন্ম বিধবা মা সাবিত্রী দেবীকে মেবেদেব 'ডিগ্রী' থেকে এবাব নিয়ে আসা হ'ল। যক্ষ্মাবোগাক্রান্ত একমাত্র পুত্রের শবদেহে তখনো বাঁধা ববেছে ইংবেভেব প্রবল পবাক্রমের চিহ্ন ডাঙাবেডি। বুঝি এমনসব দুর্লভ বস্তুদেব মনে ক'রেই কবি লিখেছিলেন—

“তোমাব শস্ব ধুলায় প'ড়ে
কেমন ক'বে সইব,
পাতাস আলো গেল মবে
একি বে তুঁদেব!”

মুক্তি পাবাব পবও সাবিত্রী দেবীকে পুলিস রেহাই দেয়নি। অনেক কষ্ট ও নির্ধাতন তাঁকে প্রতি পদে সইতে হয়। মাস্টাবদার প্রতি সাবিত্রী দেবীর অটুট শ্রদ্ধাই ছিল তাঁব মনোবলেব পাথের। তাবই পবিচয় দিয়েছিলেন তিনি বাকীজীবনে তাঁব অনমনীয় দৃঢ়তাব মধ্য দিয়ে। সমস্ত পীডন তিনি নীববে সহ্য ক'বে গেছেন।

স্বাধীন ভারতের ভিত্তি ধারা একদিন আপন জীবন বলি দিয়ে গেঁথে গেছেন তাঁদের পশ্চাতে ছিলেন এইসব সাবিত্রী দেবী ও বানরুক্ষ চক্রবর্তীর

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মতো কত নীরব ও সর্বসহা সেবিকা ও সেবক। তাঁরাও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবেননি, দুঃখকে চিরজীবনের পাথেয় ক'রে নিয়ে শহীদদের এগিয়ে চলার রাস্তা তৈরী ক'রে চলেছিলেন।

জাতির জীবন-সমুদ্রের তলায় কত অমূল্য মণিমাণিক্য এমনি ক'রে ছড়িয়ে আছে, আমরা তার কতটুকু খবর রাখি !

ইন্দুমতী সিংহ



চট্টগ্রাম অঙ্গাগাব লুণ্ঠনেব অগ্রতম বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহেব বড়ভগ্নী ইন্দুমতী সিংহ। তাঁদেব পিতা গোলাপ সিংহ। এঁদেব পূর্বপুরুষ বাজপুত ছিলেন।

চট্টগ্রামেব বিপ্লবী অধিনায়ক সূর্য সেনেব বিপ্লবীদলেব কর্মী ছিলেন ইন্দুমতী সিংহ। ভাই অনন্ত সিংহ যখন অঙ্গাগাব-লুণ্ঠনেব পব পলাতক হন এবং পবে গ্রেপ্তার হন, তখন আত্মীয়-স্বজনেবা তাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পর্যন্ত বন্ধ ক'বে দিলেন। পুলিশেব পৌডনেব তো কথাই ছিল না।

সেই সময় চট্টগ্রাম অঙ্গাগার লুণ্ঠনেব দ্বিত বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনাব জ্ঞাত অর্থ সংগ্রহ কবাবাব সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইন্দুমতী সিংহ। মহিলা হয়েও এবং ইংবাজী না জানা সত্ত্বেও তিনি যে কর্মক্ষমতা দেখিয়েছিলেন তা বিশ্বযেব সঞ্চাব কবে। কোথাও হিন্দীতে, কোথাও বাংলায় কথা ব'লে তিনি অদ্ভুত প্রেরণা এনে ফেলতেন দাতাব হৃদয়ে। আবার অগ্রদিকে পবপদলেহী গোলাম-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকেবা তাঁকে লাঞ্ছনা ও গল্পনা দিতে অবধি বাথেনি। তাবা তাঁর কথাব জবাবও দেয়নি, অস্পৃশ্যের মতো দূব থেকে তাঁকে বজন কবেছে। কিন্তু ইন্দুমতী সিংহ তাতে দমে যাবাব পাত্রী ছিলেন না। সিংহেব বাচ্চা, একাই ঝোপ-কাঁটা পাব হয়ে চলে গেছেন। স্নান আহাৰ ভুলে গিয়ে, দ্বাবে দ্বাবে ঘূবে তিনি মামলাব অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ, এমনকি ভারতবর্ষেব অগ্রা বহু জায়গায় পরিভ্রমণ ক'রে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই দুঃসাহসী নারী, পুলিশের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতার লালবাজারে গিয়েও, পুলিশের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চাব ক'রে তাদেব নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তিনি যখন ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ কাজের জ্ঞাত কুমিল্লায় যান তখন ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তার আগেব দিনই শাস্তি ঘোষ ও স্থনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসকে ঐ কুমিল্লা শহরে গুলী ক'রে নিহত করেন।

ইন্দুমতী সিংহ ডেটিনিউ অর্থাৎ রাজবন্দী রূপে হিজলী জেলে থাকেন প্রায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী

ছয় বৎসর। ঐ মামলার অর্থসংগ্রহেব কঠিন দায়িত্ব কে নেবে এই চিন্তায় তিনি জেলের মধ্যে বাতে ঘুমাতে পাবতেন না—সাবাবাত ছট্‌ফট্‌ ক'বে কাটাতেন। অল্পমনা থাকবাব জন্ত, কার্যাস্তরে নিজেকে ডুবিয়ে দেবাব জন্ত তিনি জেলেব মধ্যে লীলা নাগেব কাছে পড়াশুনা কবতে থাকেন—এবং ম্যাট্রিক পাস কবেন।

ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাব বাব বেব হ'ল। দেখা গেল অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বণ, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরেব আদেশ হবেছে। ফাঁসীব আদেশ এদের প্রতি যে হয়নি তাই ছিল যথেষ্ট সেদিন।

১৯৩৭ সালে ইন্দ্ৰমতী সিংহ জেল থেকে মুক্তি পান।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী



সুহাসিনী গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনায। দেশ তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে বাঘিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও মাতা সরলাসুন্দরী দেবী।

সুহাসিনী দেবী ১৯২৪ সালে ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে ইডেন কলেজেই আই.এ. পড়তেন। পরে তিনি কলিকাতা চলে আসেন এবং ডেফ অ্যাণ্ড ডাঞ্চ স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। তিনি যখনই যেখানে যেতেন তাঁর প্রাণ-মাতানো হাসি এবং উচ্ছল সজীবতা মানুষকে আকৃষ্ট করত। 'আলাপে-প্রলাপে-হাসি-উচ্ছ্বাসে' মানুষকে মাতিয়ে তোলত তাঁর স্বভাব।

১৯২৯ সালে 'ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে সাতার কাটা শেখানো হ'ত কলিকাতায় শ্রীশ নন্দীর বাগানে। কল্যাণী দাস এবং কমলা দাশগুপ্ত সেখানে যেতেন দেখাশুনা করতে। কমলা দাশগুপ্ত ছিলেন যুগান্তর নামে বিপ্লবী দলেরও কর্মী। মেয়েদের বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে সংঘবদ্ধ করা তাঁর একটা প্রধান কাজ ছিল। সুহাসিনী গাঙ্গুলীর মধ্যে যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য ছিল এবং একটা বেপরোয়া ভাব ছিল সেটা কমলা দাশগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

করে। স্হাসিনী গাঙ্গুলীকে বিপ্লবীদলে আনবার জন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমে আলোচনা করেন। পরে দলের একজন নেতা রসিকলাল দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা ছিল ১৯২৯ সাল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজের সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘটে খণ্ডযুদ্ধ। সমস্ত চট্টগ্রামে বিপ্লবের বহি ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল একে একে চলে আসেন আশ্রয়ের জন্ত বিপ্লবী-নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কাছে কলিকাতায়। কলিকাতায় এঁদের রাখা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। তাই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তখনকার ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরকে বেছে নেন আশ্রয়দানের স্থান হিসাবে। রসিকলাল দাসের উপর ভার ছিল ব্যবস্থা করবাব। ১৯৩০ সালের মে মাসে রসিকলাল দাস স্হাসিনী দেবীকে চন্দননগর পাঠিয়ে দিলেন আশ্রয়দাত্রীরূপে। শশধর আচার্য নামে আরেকজন বিপ্লবীকে সেখানে পাঠানো হয় আশ্রয়দাতা হিসেবে। ব্যবস্থা এইভাবে করা হয় যেন লোকে জানে শশধরবাবু হচ্ছেন স্হাসিনী গাঙ্গুলীর স্বামী। এই দুঃসাহসিক পরিচয় ও কাজের জন্ত যে মানসিক শক্তি, সংস্কারমুক্ত মন ও বেপরোয়া হবার প্রয়োজনীয়তা ছিল তার প্রত্যেকটি গুণ স্হাসিনী গাঙ্গুলীর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। একদিকে তিনি দিনে চন্দননগরের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন, অন্ডদিকে বাড়ীর অতগুলি লোকের জন্ত রান্না ও অগ্নাগ্ন গৃহকর্ম অকাতরে ক'রে যেতেন।

হেমন্ত তরফদার নামে বছর কুড়ি বয়সের আরেকটি বিপ্লবী ছেলেকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল স্হাসিনী দেবীর ছোট ভাই পরিচয়ে। হেমন্ত তরফদার হচ্ছেন সেইজাতীয় মানুষ যাদের পার্থিব কোনো কিছুই যেন খুব কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে না। পৃথিবীর স্বখঃখকে যেন তাঁরা কিছুটা দূর থেকে দেখতে পান। এমনকি দুঃখ যখন তাঁদের সামনে এসে একেবারে নগ্নমূর্তিতে চেপে ধরতে যায় তখনো নিজেকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরা দুঃখটাকে তেমনি ক'রে পড়ে নিতে চান যেমন ক'রে আমরা গল্পের বই পড়ি। এমন আপনভোলা দার্শনিক একটি ছোট ভাই পেয়ে স্হাসিনী দেবীর চন্দননগরের জীবন অনেখানি হালকা হয়ে এসেছিল।

কি ক'রে যেন পুলিশ এই পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডার খবর পেয়ে যায়। ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোররাত্রি ২টার সময় পুলিশ-কমিশনার স্মার

সুহাসিনী গাঙ্গুলী

চার্লস্ টেগার্ট নিজে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলে চন্দননগরের সেই গোন্দলপাড়ার বাড়ীটা। বিপ্লবীরা টের পেয়েই রিভলবার নিয়ে সংগ্রামের জ্ঞা প্রস্তুত হয়ে চলে যান বাড়ীর বাগানে। গভীর নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে পুলিশের অগ্ন্যস্ফারী আলোর মুখে অজস্র গুলী বিনিময় চলে উভয়পক্ষে। জীবন ঘোষাল গুলীবিক্ষ হয়ে গাছ থেকে পুকুরের মধ্যে পড়ে যান। পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। অন্তরা মাটিতে শুয়ে প'ড়ে সংগ্রাম করতে করতে গ্রেপ্তার হন। অনন্ত সিং কয়েকদিন আগেই নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এরই কয়েকদিন আগে হেমন্ত তরফদার কোনো কাজের প্রয়োজনে কলিকাতায় এসে সেখানেই গ্রেপ্তার হন।

ওদিকে সুহাসিনী দেবী এবং তাঁর সাজানো স্বামী শশধর আচার্যকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দান করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করার সময় স্বয়ং টেগার্ট তাঁকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। শশধর আচার্যকে এমন মেরেছিল যে তাঁর চোখ ও পাখের যন্ত্রণা সারতে বহুদিন সময় লেগেছিল। তারপর শশধর আচার্য ও হেমন্ত তরফদার ডেটিনিউ হয়ে বন্দী ছিলেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। সুহাসিনীকে সেসময়ে মামলা থেকে মুক্তি দিলেও, পরে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে ডেটিনিউ ক'বে হিজলী জেলে আটকে রেখে দেয় প্রায় ছয় বছর। মুক্তি পান তিনি ১৯৩৮ সালে।

১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলনের সময় হেমন্ত তরফদার পলাতক অবস্থায় সুহাসিনী দেবীর বাড়ীতে থাকতে পারেন কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। সুহাসিনী দেবী অগাস্ট আন্দোলনের সমর্থক না হ'লেও স্নেহের অমঘাদা করতে পারেননি। তিনি রাজী হলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর যে রাতে হেমন্ত তরফদার ওখান থেকে অল্প আশ্রয়ে চলে যান সেই রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে সুহাসিনী দেবীর বাড়ী ঘিরে ফেলে। পলাতক হেমন্তকে পুলিশ পায়নি কিন্তু সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী ক'রে রেখে দেয় প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় তিন বৎসর, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। হেমন্ত তরফদার সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ধানবাদের এক আশ্রমে এসে থেকে যান সন্ন্যাসীরূপে। ঐ সন্ন্যাসীর জীবনই হেমন্তের অন্তরের আসল রূপ।

মমতাময়ী সুহাসিনী পলাতক হেমন্তকে স্নেহবশতঃ আশ্রয় দিয়ে বন্দীজীবন যাপন করতেও কুণ্ঠিত হননি। সদাহাস্যময়ী সুহাসিনী ছুটে উঠেছেন দুঃসাহসী ও স্নেহময়ীরূপে।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম



১৯১৭ সালের ১২শে ফেব্রুয়ারি প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুমিল্লায়। দেশেও সেখানে। তাঁর পিতা রজনীকান্ত ব্রহ্ম এবং মাতা রঙ্গবাসী ব্রহ্ম।

ফৈজব্রহ্ম গার্লস হাইস্কুলে তিনি লেখাপড়া করতেন। তাঁর পিতা মোক্তার ছিলেন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি কোর্ট বর্জন করেন। এই আবহাওয়াতে মানুষ হবাব ফলে তাঁদের বাড়ীটা স্বদেশীভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। প্রফুল্লনলিনী তাঁর পিতার নিকট থেকেই এপথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পান। ছেলেমানুষ মেখে প্রফুল্ল অতি অল্প বয়সেই বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কুমিল্লাব যুগান্তব-দলের সঙ্গে তিনি ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন।

যখন তিনি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তখন সহপাঠী শান্তি ঘোষকে তিনি বিপ্লবীদলে আনেন। স্বনীতি চৌধুরীকেও তিনিই প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান। কিশোরী এই তিন বন্ধু মিলে মহা উৎসাহে ছাত্রীসংঘ সংগঠন ক'রে মেয়েদের মধ্যে একটা কর্মের প্রেরণা এনে ফেলেন। তারপর গুরুতর কোনো বৈপ্লবিক কাজে আত্মোৎসর্গ করবার আকাজক্ষায় প্রফুল্ল ব্রহ্ম ও শান্তি ঘোষ দলের নেতাদের বার বার তাগিদ দিতে থাকেন এবং তাঁরা দুজনে মিলে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করবার জন্ত প্রস্তুত হন। কিন্তু পরে দলের নেতারা মনে করলেন যে, প্রতিষ্ঠানব প্রয়োজনে পুরাতন কর্মী হিসাবে প্রফুল্লনলিনীর তখন বাইরে থাকা একান্ত দরকার। সেজন্ত তাঁকে সামনে এগিবে যেতে দেওয়া হ'ল না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি গুলী করতে না গেলেও শান্তি ঘোষ, স্বনীতি চৌধুরী যখন ১৪ই ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করলেন তখন পুলিশ প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মকেও বাইরে থাকতে দিল না। পরদিনই ১৯৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ডেটিনিউ ক'রে রেখে দেয় কুমিল্লা জেলে। পরে নিয়ে যায় তাঁকে হিজলী বন্দীশালায়।

১৯৩৬ সালে প্রথমে তাঁকে কুমিল্লার কাকসার গ্রামে স্বগৃহে এবং পরে কুমিল্লা শহরে অন্তরীণ রাখে। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হয়।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম

কিন্তু স্থানীয় ডাক্তারগণ প্রথমে রোগ ধরতে পারেন নাই। অবশেষে প্রকৃত রোগ যখন ধরা পড়ে তখন আর অস্ত্রোপচার করবার সময় ছিল না। কলিকাতা নিয়ে যাবার জন্ত তাঁর পিতার আকুল প্রচেষ্টা পুলিশ ব্যর্থ করে দেয়। ফলে বিনা চিকিৎসায় অশ্রুট মুকুলটি অকালে ঝরে গেল। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৯৩৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শুধু যে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল তাই নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাদের আক্রোশ মেটে নাই। মৃত্যুর পর শ্মশানে যারা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন, পুলিশ তাঁদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবধি রাখে নাই। এই ছিল পরাধীন ভাবতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিহত দীর সৈনিকদের শেষ পুরস্কার।

একেবারে পরপারে গিয়ে প্রফুল্লনলিনী চিরমুক্তি পেয়েছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে মৃত্যু পযন্ত ও মুক্তি দিতে সাহস করে নাই।



প্রতিভা ভদ্র (রায়)



প্রতিভা ভদ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই কুমিল্লা শহরে। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলায় শ্রীনিবি গ্রামে। কিন্তু মানুষ হয়েছিলেন তিনি কুমিল্লাতেই, কখনো দেশে যান নাই। তাঁর পিতা অশ্বিনীকুমার ভদ্র, মা মৃণালিনী ভদ্র। ১৯৪০ সালে হবিকুমার বাবচৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভা ভদ্রের বিবাহ হয়।

প্রতিভা ভদ্র কুমিল্লা ফেজলিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে এ বি এস এ ছাত্র-সমিতির মাধ্যমে কুমিল্লায় অনুশীলন নামক বিপ্লবী-দলের কর্মীদের সঙ্গে প্রতিভা ভদ্রের যোগাযোগ ঘটে। তিনি ১৯২৯ সালের শেষভাগে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। তাঁর উপর দল সংগঠনের ভাব ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে আছে দায়িত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা। তিনি ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পাডায় পাডায় ছোট ছোট সংঘ, লাঠি ছোঁবা খেলা শিক্ষার ও কুচকাণ্ডাজের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সংগঠন করেন। মহিলাদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজে সহায়ত্বীতি স্থাপ্তি করা, ফেরাবী বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া, অর্থ সংগ্রহ করা, অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি কাগজপত্র নিবাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা, নিবাপদ ঠিকানাখ খবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভাব তাঁর

উপর ছিল। তিনি কুমিল্লার নানাহানে, আগরতলা ও চাঁদপুরে গেছেন এই সংগঠনের কাজ করতে। সেসময়ে যতগুলি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল—যেমন ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন, ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন (এ.বি.এস.এ.), চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলন—প্রত্যেকটিতেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এসবেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে দৃঢ় এবং বিস্তৃত করা।

১৯৩০ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনে কুমিল্লায় সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল ও পিকেটিং প্রত্যেকটিতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সংগঠন নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় জেলে যাবার ঝুঁকি সতর্কতার সঙ্গে তিনি এড়িয়ে গেছেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় তিনি প্রকাশ্য ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। কারণ, সেই সময়ের কাজ তাঁর পুরোপুরিভাবে বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৩২ সালে যখন তিনি কুমিল্লায় কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন তখন তাঁকে ডেটিনিউ ক'বে হিজলী জেলে বন্দী রাখে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তারপর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৯ সালে স্বভাষচন্দ্র বসু যখন মূল কংগ্রেস থেকে সরে গিয়ে আলাদা-ভাবে কংগ্রেস পরিচালিত করেন তখন প্রতিভা ভদ্র সেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং সেই বি.পি.সি.সি.-র সভ্য থাকেন ও তারই মহিলা-সাব-কমিটির সহকারী সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

১৯৩৮ সালে বনলতা সেন প্রভৃতি ছাত্রী-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বনলতা সেন, কল্যাণী মুখার্জী, কিরণ চক্রবর্তী, কিরণ দুগড, নির্মালা রায়, সুষমা রায়, উমা চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে কাজে জড়িত হন। তাঁরা সকলে মিলে প্রতিভা ভদ্রের নেতৃত্বে ছাত্রী-কমিটি গঠন করেন। ছাত্রী-কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রী-সাধারণের মধ্যে সাত্ত্বাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তারই মধ্য থেকে সংগ্রামী দল তৈরী করা।

এই ছাত্রী-সংগঠনের এক বিশিষ্ট অংশ ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করে। প্রতিভা ভদ্র ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে থাকেন ১৯৪৫ সালের অগাস্ট পর্যন্ত।

১৯৪৬ সালে দাঙ্গার পর তিনি ত্রিপুরা জেলায় দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

রিলিফের কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রাদেশিক কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন।

বর্তমানে তিনি ‘অঙ্গনা’ নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা।

জেলে থাকতেই তাঁর সাহিত্যিক মনের পরিচয় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত এবং বন্দীদের শুদ্ধজীবনকে তা আনন্দের চকিত স্পর্শে সরস ক’বে দিত। ‘অঙ্গনা’র মাধ্যমে এখন তাঁর সাহিত্যানুভাগ সার্থকতার পথ খুঁজে পাবে, তাঁর জেলের সতীর্থরা এই আশাই কবেন।

শোভারাগী দত্ত



১৯০৬ সালেব জ্যৈষ্ঠ মাসে শোভারাগী দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা শহরে। দেশ তাঁর খুলনায়। তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ দত্ত। ছোটবেলায়ই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মাতা স্বনামধন্য ও একনিষ্ঠ দেশসেবিকা লাবণ্যপ্রভা দত্ত। লাবণ্যপ্রভা দত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী ছিলেন ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

মাযের কাছেই শোভারাগীর দেশপ্রেমেব প্রথম শিক্ষা। ছোটবয়স থেকেই তিনি যেমন তেজস্বী তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর একটি দুর্লভ বস্তু নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে হৃদয়ের প্রাচুর্য।

১৬।১৭ বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ট্রেনিং পাস করেন। তারপর বৃন্দাবন চলে যান বিপ্লবীবীর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ‘প্রেম মহাবিদ্যালয়ে’ পড়াশুনা করতে। ওখান থেকে পাঞ্জাবের নানা স্থানে তিনি ভ্রমণ করতে থাকেন। এই সময় পাঞ্জাব-কেশরী লাল লাজপৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তিনি মুক্ত ও প্রভাবান্বিত হন এবং বিপ্লবের দিকে তাঁর অন্তরের প্রেরণা জাগে।

১৯৩০ সালে বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে কলিকাতায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

শোভারাগীর পরিচয় হয় এবং তিনি দেশসেবার কাজে গভীরতরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। এই সালেই তিনি এবং তাঁর মা দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ‘আনন্দমঠ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ’ড়ে তোলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদিকাদের আহ্বানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শোভারাগী দত্ত আন্দোলন পরিচালনা ক’রে যান। নিজে চলে যেতেন তিনি পিকেটিং করতে ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে। তাছাড়া ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’তে যোগ দিয়ে সত্যাগ্রহ করবার জন্ত তিনি ও তাঁর মা বহু কর্মী সংগ্রহ ক’রে দিতেন। পরে তাঁর মা লাভণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন দক্ষতার সঙ্গে।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে যাবার পর অনেক বিপ্লবী পলাতক হয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁদের প্রথম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনেককে বেশীদিন একসঙ্গে রাখা নিরাপদ নয় ব’লে মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে অস্ত্র রাখা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। শোভারাগী এই দুইজনকে কয়েকদিনের জন্ত আশ্রয় দিলেন তাঁরই নির্বাচিত বাড়ীতে টালিগঞ্জের পুটুরিয়াতে। সেটা ছিল তাঁর পরিচিত কর্মী লক্ষ্মীমণি দেবী ও সারদামণি দেবীর বাড়ী। শোভারাগীর নির্দেশ তাঁরা নতমস্তকে সানন্দে মেনে চলতেন। পরে জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে সেখান থেকে চন্দননগরে যেখানে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা ছিলেন সেখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট ডালহাউসি স্কোয়ারে পুলিশ-কমিশনার টেগার্টকে দীনেশ মজুমদার ও অরুণা সেন বোমা ও রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করেন। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার একজন পলাতক আসামী ছিলেন মনোরঞ্জন রায়। ২৬শে অগাস্ট শোভারাগী দত্ত তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তাঁরই গাড়ীতে ক’রে তাঁকে পাঠিয়ে দেন পুটুরিয়ার সেই আশ্রয়ে। শোভারাগী দত্তের বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী ও তাঁর শান্তী সারদামণি দেবী।

২৮শে অগাস্ট মনোরঞ্জন রায় পুটুরিয়ার সেই বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। ২৯শে অগাস্ট শোভারাগী দত্ত ও লক্ষ্মীমণি দেবী বেহালা থানায় যান যেখানে পুলিশ মনোরঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার ক’রে নিয়ে রেখেছিল।

সেখান থেকে ফিরবার পথে রাস্তায় ২২শে অগাস্টই শোভারাগী দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে। তাঁর গাড়ীও পুলিশ আটকে রাখে। কিছুদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালে ৮ই মে দার্জিলিং-এ লেবং-এব মাঠে গভর্নর অ্যাণ্ডারসনের উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর উজ্জ্বলা মজুমদার চলে আসেন কলিকাতায় পলাতক অবস্থায়। আশ্রয় নেন তিনি শোভারাগী দত্তের বাড়ীতে। প্রায় তিনদিন সেখানে থাকার পর ১৮ই মে উজ্জ্বলা ও শোভারাগী দুজনে সেই বাড়ী থেকেই গ্রেপ্তার হন। লেবং কেস থেকে মুক্তি পেলেও শোভারাগীকে ডেটিনিউ হিসাবে জেলে বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া হয়। হাজতে থাকা অবস্থায় খবর পাওয়া যায় শোভারাগী পাগল হয়ে গেছেন। গভর্নমেন্ট পাঠিয়ে দেয় তাঁকে বাঁচীর পাগলা-গারদে। প্রায় বছরখানেক সেখানে থাকার পর তিনি স্বস্থ হন। তখন তাঁকে নিয়ে আসা হয় আবার প্রেসিডেন্সি জেলে। অবশেষে বছর দেড়েক আলমোডায় অন্তবীণ ক'রে রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৩৭ সালে।

শোভারাগীর মতো এমন একটা দরদী ও পরদুঃখকাতর প্রাণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক তাঁর তেজস্বিতা। নিজের তেজস্বিতায় যেন তিনি অন্তের হৃদয়ে আগুন জালিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা চোখে না-পড়েই পারত না। তাঁর কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, গ্রীবাভঙ্গিমায় প্রকাশ পেত যেন সিংহিনীর বিক্রম। সব সময় রয়েছে মুখে একটি মধুর হাসি। সেই হাসির মধ্য দিয়ে সহজেই মানুষকে আপন ক'রে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর অতিথি-পরিচর্যার স্নেহকোমল স্পর্শ পাননি এমন লোক বোধ হয় শোভারাগীর পরিচিত কেউ ছিলেন না।

অকাতরে কত অর্থসাহায্য যে তিনি বিপ্লবীদের করেছেন তার হিসাব কেউ জানে না। সেজেগুজে ছদ্মবেশে গড়ের মাঠে গিয়েও তিনি বহু অর্থ দিয়ে এসেছেন পলাতক বিপ্লবীকে। তাঁর কাছে অর্থ এবং খাদ্য চেয়ে কেউ কোনোদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাননি। নিজের কাছে না থাকলে, নিজে ঋণ করবেন, তবু না দিয়ে থাকতে পারবেন না—এই ছিলেন শোভারাগী দত্ত।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তাঁর রক্তশয্যায় যেসকল স্বনামধন্য মানুষ এসে তাঁকে স্নেহ ও আশীর্বাদ বর্ষণ ক'বে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিপ্লবীবীর রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ।

দীর্ঘদিন বোগযন্ত্রণা ভোগেব পর শোভাবাগীব ক্লান্তদেহেব মর্ত্যযাতনাব অবসান হয় ১৯৫০ সালেব ৯ই নভেম্বর ।

বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)



১৯১৫ সালে ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের মধ্যে বিদগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)। পিতৃভূমি তাঁব সেখানেই। তাঁর পিতা হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, মাতা নির্মলাসুন্দরী দাশগুপ্ত।

পিতা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এমনকি বেনামীতে কংগ্রেসকে অনেক সময় অর্থ-সাহায্যও করতেন।

বাড়ীর ভাই-ভগ্নীদের সকলকেই লেখাপড়া করতে দেখে, ছোটবেলা থেকে বনলতা লেখাপড়ায় মনোযোগী হন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি ভালো ছাত্রী হয়েছিলেন। নির্ভা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোটবেলায় তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসায়ও তা আরোগ্য হয়নি। তাঁর ১১।১২ বছর বয়সের সময় নাইডু নামে একজন শরীরচর্চাবিদ তাঁকে হাঁপানির প্রতিষেধক হিসাবে ব্যায়ামের একটি বিশেষ প্রণালী শিখিয়ে দেন। পরিবারের অগ্রাঙ্ক ছেলেমেয়েরাও নাইডুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে ব্যায়াম করা বন্ধ করেন। কিন্তু বনলতা সে-অভ্যাসটি পরম নির্ভার সঙ্গে বজায় রাখেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর আর হাঁপানী রোগ ছিল না এবং ব্যায়ামের দ্বারা তিনি একটি সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গড়ে তুলেছিলেন।

নূতন কিছু করবার ও শিখবার দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। একুটু বড় হবার পর তিনি সাইকেল ও মোটর চালাতে শিখেছিলেন। এমনকি এরোপ্লেন-চালনা শিক্ষাও আরম্ভ করেছিলেন।

তাদের পরিবারের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পরিচয় ঘটে। তাঁরা একটি ছোট বিপ্লবীদের সদস্য ছিলেন। জীবন-বিস্তারের ও জীবন-বিকাশের সর্বাপেক্ষা প্রধান অস্তুরায় ছিল দেশের পরাধীনতা। সেইজন্য যখন বিপ্লবের ডাক এসে ঐ গৃহের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছাল, তাঁরা সাড়া দিয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হ'ল ঐ ডাকের জগুই যেন তাঁরা অপেক্ষা ক'রে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ছিলেন। বিপ্লব দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ক'রে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করবে, এই কথা তাঁরা সহজ দৃঢ়তায় বিশ্বাস ক'রে নিলেন। বিপদকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ ক'রে জীবনযাপনে একটা তীব্র আনন্দ আছে। বিপদের পথে মানুষকে ডেকে নেওয়াও কম আনন্দের নয়। জীবনদানের প্রতিজ্ঞা নিয়েই প্রবলভাবে বাঁচবার পথ বাড়ীর ছেলেমেয়েবা বেছে নিলেন। এই জীবনের আদর্শ ও কর্ম তাঁর দিদি চারু দাশগুপ্ত ও শান্তি দাশগুপ্তের নিকট থেকে বনলতাও গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের শেষের দিকে দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর নানা কারণে দলটি ভেঙে যায়। গভীর চিন্তা ও আত্মসমালোচনা'র পর দলের কয়েকজন কর্মী সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণ করেন। মেবেদেব মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করবার পুরোভাগে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বনলতা ছিলেন অন্যতম।

বনলতা ডায়োসেসান স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলেন। স্কুলে থাকতে তিনি সপ্তাহে একদিন জর্জেট পরবার নিয়ম মানতেন না, এবং সকল ছাত্রীকেই বিলিভী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ কবতেন।

তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব থেকে একটি স্মার্ট বাঙালী মেয়ে চেয়েছিল। বনলতাকে উপযুক্ত মেয়ে মনে ক'রে কল্যাণী দাস তাঁকে এইখানে এরোপ্লেন-চালনা শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দেন।

এরপরে ১৯৩৩ সালে একটি ঘটনা ঘটে যায় যাতে বনলতা দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হন। এই সময় কয়েকটি পিস্তল রাখার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। সেগুলি তিনি ডায়োসেসান কলেজে তাঁর এক সহপাঠী ও বন্ধু জ্যোতিকণা দত্তর কাছে রেখে দেন। তাঁরা তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। জ্যোতিকণা বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন না—কিন্তু বৈপ্লবিক কাজে তাঁর সহানুভূতি ছিল বলেই পিস্তলগুলি রাখতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। জ্যোতিকণা দত্ত ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডিং-এ থাকতেন। হঠাৎ বোর্ডিং-এ ঢাকা চুরি যাবার ব্যাপারে সমস্ত মেয়েদের বাক্স ও বিছানা তল্লাসী করা হয়। তখন পিস্তলগুলি ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা পুলিশে খবর দেন।

পুলিস এসে জ্যোতিকণাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। বনলতাকেও পুলিশ পরদিন গ্রেপ্তার করে। পুলিশ বনলতা দাশগুপ্তের বাড়ী তল্লাসীর সময় তাঁর নামীয় মোটর-লাইসেন্স এবং এরোপ্লেন-চালনা-শিক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র হস্তগত

বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)

করে। গ্রেপ্তারের পর বহু চেষ্টা ক'রেও তাঁর কাছ থেকে পুলিশ কোনো কথা আদায় করতে পারে নাই।

বে-আইনী পিস্তল রাখার অভিযোগে জ্যোতিকণার প্রতি আদালত কর্তৃক চাব বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বনলতার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকতে তাঁকে মামলায় জড়াতে পারে নাই। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দী ক'রে ডেটিনিউ রূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রেখে দেয় তাঁকে তিন বছরেরও অধিক।

কারাজীবনের অধ্যায়টি বনলতার জীবনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বাধা-নিষেধ, নির্যাতন ও নিপীড়নের উর্ধ্বে তাঁর দুর্দম তারুণ্য সেদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে বহুমূল্য নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁর কারাজীবনেই ঘটে।

শেষ পর্যন্ত কারাগারে বনলতা অসুস্থ হয়ে পড়েন উল্লিখিত গয়টার রোগে। রোগ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল। পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইল এই শর্তে যে, তিনি আর রাজনৈতিক কাজ করবেন না এমনি একটি মুচলেকা লিখে দেবেন। বনলতা সম্মত হলেন না। রাজবন্দীর মৃত্যুর দায়িত্ব নেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে অস্ববিধাজনক। তাই বনলতাকে তাঁর দিদির বাড়ীতে কলিকাতায় অন্তরীণ করা হয় ১৯৩৬ সালে। তখন তাঁর শেষ অবস্থা।

অস্বোপচার সম্বন্ধে যখন সংশয়ের অন্ত নাই, অথচ না করলেও ভালো হবার সম্ভাবনা খুবই কম—তখন বনলতা অস্বোপচারের সপক্ষে রায় দিলেন। বাঁচতে হ'লে ভালোভাবেই বাঁচবেন। মরণেই বা কি ভয় আছে!

মেডিকেল কলেজের প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ ওয়ার্ডে তিনি ভর্তি হন। ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন তাঁর গলায় অস্বোপ্রচাব করেন। অস্বোপ্রচারের ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই ১৯৩৬ সালের ১লা জুলাই তাঁর জীবনপ্রদীপ নির্বাণিত হয়। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর মাত্র।

মুক্তি-সংগ্রামের একটি নির্ভীক সৈনিক সেদিন জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন।



বেণু সেন (বসু)



১৯০৯ সালের ১৮শে ডিসেম্বর বেণু সেন মুন্সিগঞ্জে তাঁব মামাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁব দাছ উমাচরণ সেন ছিলেন মুন্সিগঞ্জেব স্বনামধন্য উকিল। তাঁব পিতা বিনোদবিহারী সেন এবং মাতা কুম্মকণা সেন। তাঁব পিতৃভূমি ঢাকার বিক্রমপুরেব মধ্য সোনাবাং গ্রামে। বেণুব মা-বাবা মুন্সিগঞ্জের অগ্র বাড়ীতে থাকতেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি আদবে লালিত-পালিত হন তাঁর মামাবাড়ীতেই।

দাছ উমাচরণ সেন নিজে ছিলেন বিদ্বান, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল। তাঁব বিবাট পবিবারের সকলকে নিয়ে তিনি সন্ধ্যাবেলায় বসতেন সাক্ষ্যবৈঠকে। বৈঠকে শুধু যে গান, বাজনা ও কাব্য-আলোচনা হ'ত তাই নয়, তিনি নিজে শোনাতেন তাঁদের পৃথিবী ইতিহাস, নানাদেশেব ও নানাজাতির উত্থান-পতনেব কাহিনী। উৎস্ক শ্রোতার কান খাড়া ক'বে শুনতেন। নিজেদের দেশেব কলঙ্কিত ইতিহাস ও তাব দুঃখময় কাহিনী দাছ উমাচরণ সেন এমনভাবে বর্ণনা কবতেন যে, শ্রোতাদের মনে দেশের অধঃপতনের জ্ঞান একটা গভীর দুঃখবোধ জেগে উঠত। আবার দেশের অতীত-গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের তেমনি বড় হ'তে তিনি উৎসাহ দিতেন। ভূগোল শেখাতেন

তিনি ম্যাপ সামনে নিয়ে ব'সে খেলাচ্ছিলে। শ্রোতা রেণু ঐসব কথা যেন নিঃশেষে গ্রহণ করতে চাইতেন। তাঁর অহুসঙ্কিত মন যত প্রবল করত, দাত্ত সব উত্তর দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করতেন।

রেণু সেনের দিদিমার ছিল করুণার্দ্ৰ হৃদয়। তাঁর গোপন দানের অস্ত ছিল না। নাতনী রেণুর হাত দিয়ে তাঁর অনেক দান সবার অগোচরে নিঃশব্দে চলে যেতো।

এইভাবে দাত্তর জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও দিদিমার সেবাস্পৃহা দুটোই রেণু সেনের মধ্যে দেশাত্মবোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৪।১৫ বছর বয়সে মুন্সিগঞ্জের স্কুলের পাঠ সমাধা ক'বে রেণু ঢাকা গিয়ে লীলা নাগের নতুন প্রতিষ্ঠিত দীপালী স্কুলে ভর্তি হন অষ্টম শ্রেণীতে। বি.এ. পাস করেন তিনি ১৯৩০ সালে এবং পরে জেলে গিয়ে এম.এ. পাস করেন।

দীপালী স্কুলে পড়তে পড়তে তিনি লীলা নাগের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রভাবিত হন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

রেণু সেন যখন কলিকাতায় বি.এ. পড়তে আসেন তখন ঝাঁরা দেশের কাজ করতে চান সেরূপ কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল কম ছিল। ১৯৩০ সালে লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে 'দীপালী'র কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য রেণু সেন কলিকাতায় 'ছাত্রীভবন' নামে একটি আবাসিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'দীপালী ছাত্রীসংঘ'র একটি কেন্দ্রও তিনি কলিকাতায় স্থাপন করেন।

১৯৩০ সালে 'জয়ন্তী' পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় লীলা নাগের সম্পাদনায়। রেণু সেনের উদ্যম ও সংগঠন ক্ষমতা এই পত্রিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক প্রধান স্থান অধিকার করে।

১৯৩০ সালে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সময় ১৬ই সেপ্টেম্বর রেণু সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। ১৬ দিন লালবাজার ও কয়েকদিন প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতে রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে বন্দী রাখে হিজলী প্রতিষ্ঠা নানা জেলে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মুন্সিগঞ্জে অন্তরীণ হন। সেই সময় অন্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা উপার্জনের সুযোগের দাবী গভর্নমেন্টের নিকট রেণু সেন জানান। উত্তর না পেয়ে তিনি অন্তরীণ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

আইন ভঙ্গ করেন। এই মামলায় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রেণু সেনের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

মুক্তির পর তিনি কলিকাতা থেকে 'জয়শ্রী' পত্রিকা (প্রায় দেড়বছর বন্ধ ছিল) প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে 'জয়শ্রী' কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ সালের ২৫শে জাহুয়ারি খ্যাতনামা বিপ্লবী ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রেণু সেনের বিবাহ হয়।

১৯৪১ সালের ২রা জুলাই প্রাতে অকালমৃত্যু এসে রেণুর মতো একটি জীবন্ত কর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হেলেনা দত্ত



এক ভাদ্রমাসেব জন্মাষ্টমীব বাতে হেলেনা দত্ত জন্মগ্রহণ কবেন ঢাকা জেলাব কালীগঞ্জ গ্রামে। তাঁব পৈতৃক দেশও সেখানেই। তাঁব পিতা মুকুন্দলাল গুণ ও মাতা শৈলবালা গুণ।

১৯২২ সালে তাঁব পিতাব মৃত্যু হয়। ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা ইন্ডেন হাইস্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলেব বোর্ডিং-এ তিনি থাকতেন। ১৯২৮ সালে বিপ্লবীনেত্রী লীলা নাগের পবিচালিত ‘দীপালী ছাত্রীসংঘ’ব তিনি সভ্য হন। তিনি খুব গোপনে লাঠি ও ছোবা খেলা শিখতে থাকেন এবং ঐ স্কুলে ‘দীপালী ছাত্রীসংঘ’ পবিচালনা করেন। সংঘেব মেম্বেরেবও তিনি লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন।

১৯৩০ সালে দীপালী-সংঘেব একটি বার্ষিক সম্মেলনে লীলা নাগের সঙ্গে তাঁর পবিচয় ঘটে। তাবপব তিনি ‘শ্রীসংঘ’ নামক বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। এই সময় তাঁব কার্ধকলাপ লক্ষ্য ক’বে বোর্ডিং এর কর্তৃপক্ষ তাঁকে বার বাব সতর্ক করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় একদিন সমগ্র ঢাকা শহবব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয়। সেদিন ইন্ডেন হাইস্কুলের বোর্ডিং-এর

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ছাত্রীদের স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা হেলেনা স্কুলে যোগদান করেন নাই।

১৯৩১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। হেলেনা ও তাঁর সঙ্গীদের প্রচেষ্টায় এই সময় বোর্ডিং-এ একটা জাগরণ ও চাঞ্চল্যের জোয়ার দেখা দেয়। নানাপ্রকার বিপ্লবাত্মক পুস্তক যোগাড ক'রে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। রিভলভার প্রভৃতি বে-আইনী জিনিস তাঁরা লুকিয়ে রাখতেন।

শাস্তি ঘোষ ও স্থনীতি চৌধুরী কুমিল্লাতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'রে নিহত করার পর জাতীয় চেতনার আর একটা প্রবল ঢেউ ঢাকা ইডেন বোর্ডিং-এর মেয়েদের মধ্যে এসে ধাক্কা দেয়। “রক্তে আমার লেগেছে আজিকে সর্বনাশের নেশা” প্রভৃতি পোস্টার এইসব কর্মিগণ স্কুল ও বোর্ডিং-এর দেওয়ালে লাগিয়ে দিতেন এবং কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতেন।

১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটা হরতালের দিনে বোর্ডিং-এর মেয়েদের যখন স্কুল ও কলেজে যেতে বাধ্য করা হয় তখন হেলেনা ও লীলা সেনকে কেউ নত করতে পারে নাই। তাঁরা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। তখন হেলেনা ও তাঁর বন্ধু লীলাকে বোর্ডিং থেকে ডি.পি.আই.-র আদেশ অনুযায়ী বহিস্কার ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ডেরুলকার তাঁদের এত ভালবাতেন এবং তাঁর এতখানি সহৃদয়তা ছিল যে, তিনি তাঁর ছাত্রী হেলেনা ও লীলাকে ‘আনন্দ আশ্রম’-এ, অথবা সেখানেও জায়গা না হ'লে, তাঁর নিজের গৃহে থাকবার জন্ম ব্যবস্থা করবেন কথা দেন। কিন্তু ছাত্রী দুজনের সে প্রয়োজন হয় নাই। এ কাজের জন্ম হেলেনা বাড়ীর দিক থেকে বাধা পান নাই, বরং উৎসাহই পেয়েছেন।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে একবার তিনি কলিকাতা থেকে রিভলভার নিয়ে ঢাকা চলে যান। ঢাকাতে নিজেকে তিনি নিরাপদ মনে করেন নাই। তা ছাড়া পলাতক বিপ্লবী কর্মীরা কেউ কেউ এসে সেইসময় তাঁর মায়ের কাছে থাকতেন। এইসব নানা কারণে তিনি কলিকাতার বরানগরে তাঁর মামাবাড়ীতে চলে আসেন ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর সঙ্গে তাঁর মামাবাড়ীর সকলকেই গ্রেপ্তার করে এবং বাড়ী পুলিশের হেপাজতে থাকে। তাঁকে ২৮ দিন

হেলেনা দত্ত

লালবাজার হাজতে রাখার পর, ডেটিনিউ ক'রে বন্দী রাখে হিজলী প্রভৃতি জেলে প্রায় পাঁচ বছর। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৯ সালে বিপ্লবীকর্মী স্বকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঐ সালেই তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন।

পুনরায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করাতে তাঁকে অসুস্থতার কারণে প্রথমে মাস দুয়েক স্বগৃহে অস্তরীণ রাখে, পরে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা বন্দীরূপে তাঁকে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। জেলের মধ্যেই তিনি আই.এ. এবং বি.এ. পাস করেন।

বর্তমানে তিনি পি.এস.পি.-ব সঙ্গে যুক্ত আছেন।

লাবণ্য দাশগুপ্ত



বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে লাবণ্য দাশগুপ্তের জন্ম। তাঁর পিতা বসন্তকুমার মজুমদার ও মাতা শরৎকামিনী দেবী।

এই পরিবার বদান্ততার জন্ম জনপ্রিয় ছিল। শিশু লাবণ্য জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছিলেন যে তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা ক’রে দুঃস্থ ছেলেরা রাত্রে শুয়ে থাকে, তাঁর বাবা তাদের খাওয়া ও পড়াশুনার সম্পূর্ণ খবচ বহন করেন। মা সারাদিন প্রায় রান্নাঘরে কাটাতেন, অবিরাম সেবায় কখনো মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠত না। তাদের কারও অস্থখ করলে তিনি নিজে তো সাধ্যমতো সেবা করতেনই আবার সন্তানদের একটু বড হলে বলতেন, “যাও, বসে বসে বাতাস কর।” এইভাবেই ছেলেমানুষ লাবণ্যকে ছেলেবেলা থেকে রোগীর পরিচর্যা করবার যে আস্তরিকতা মা শিক্ষা দেন তা তাঁর হৃদয়ে গভীর ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। বড হয়ে তিনি কতরকম রোগীর যে সেবা করেছেন, কত কলেরা-রোগীর পাশে থেকে রাত ভোর করেছেন তার ঠিক নেই।

তাঁদের পাশের বাড়ীটা ছিল দেশগৌরব সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। এঁদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অনেকখানি। সতীন সেনকে তিনি দেবতার মতো ভক্তি করতেন, তাঁর কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছিলেন তিনি।

“লাবণ্য দাশগুপ্তের পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের বলধরা গ্রামে মামাবাড়ী চলে যান। তাঁর মাতামহের অবস্থা সচ্ছল ছিল। সেখানে পাড়ার কয়েকজনের সহায়তায় তিনি ঢাকার লীলা নাগের ‘শ্রীসংঘ’ নামক বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

তাঁর দাছ ছিলেন বড কবিবাজ। তাঁর সাথে সাথে নাতনী লাবণ্যও যেতেন রোগীর বাড়ী। ‘দাছ’র ছিল দরদী প্রাণ। গরীব রোগীর পথ্য দাছর বাড়ীতে তৈরী করতেন মামীমা এবং সেই পথ্য নিয়ে রোগীর বাড়ীতে গিয়ে খাইয়ে আসতেন কিশোরী লাবণ্য।

ষোলোবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় সূর্যাপুরের এক ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে বীরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে ; বিবাহের দুইমাস পরেই তিনি বিধবা হন।

তিনি পুনরায় বলধরা ফিরে আসেন। নেত্রী লীলা নাগকে তিনি পড়াশুনা করবার ইচ্ছা জানানেন। লীলা নাগ তাঁর স্থলে বড় মেয়েদের জন্ম বিশেষ ক্লাস খুলে তাঁকে ভর্তি ক'রে নেন ১৯২৮ সালে। পড়াশুনা ও দেশের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দিনগুলি তখন আনন্দে কেটে যেতে লাগল। স্নেহপ্রবণ নেত্রী লীলা নাগের স্নেহ ও কর্ম-নির্দেশ তাঁর জীবনে নতুন প্রেরণা এনে দিল। জীবনে নতুন আনন্দের পথ খুলে গেল। লাবণ্য দাশগুপ্তকে সকলেই 'বডদি' ব'লে ডাকত। আজও পাকিস্তানের সকল হিন্দু-মুসলমানের কাছে তিনি 'বডদি'।

দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়ে তিনি ১৯৩৪ সালে দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে রাজবন্দী ক'রে প্রথমে দিনাজপুর জেলে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো হয়। এই সময় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। কিছুদিন গ্রামে অন্তরীণ থাকার পর সাড়ে চার বছর বাদে তিনি মুক্তি পান। তখন তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।

পুনরায় ১৯৪১ সালের আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে ঢাকা, দিনাজপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার পর ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান।

দেশ-বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে যান। সেখানে ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনারের আফিসে 'ইণ্ডিয়ান ট্রানজিট হোম'-এর কাজ গ্রহণ করেন। দুঃখী মেয়েদের উদ্ধারের এবং সেবার কাজের মধ্য দিয়ে বালবিধবা লাবণ্য দাশগুপ্তের ব্যথাভরা জীবন সার্থকতা খুঁজে চলেছে। চিরদিনই দুঃখীর পাশে থেকে তাঁর সেবাপরায়ণ হৃদয় নীরবে পরিচর্যা ক'রে যাবে—এই হাঁছে তাঁর কোমল হৃদয়ের প্রকৃত প্রকাশ।



প্রমীলা গুপ্ত

৬

সুশীলা দাশগুপ্ত

★

প্রমীলা গুপ্ত

প্রমীলা গুপ্তের জন্ম হয় ১৯১২ সালে লাকসামে। তাব দেশ ঢাকা জেলাব বিক্রমপুরেব মধ্যপাড়া গ্রামে। তাঁব পিতা কুমুদিনী গুপ্ত ও মাতা কাদম্বিনী দেবী।

তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুল ও কলেজে পড়াশুনা কবেন এবং ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পাস কবেন। কলিকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বাব সময় তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৩২ সালে।

সুশীলা দাশগুপ্তেব জন্ম হয় ১৯১২ সালে। তাঁদেব দেশ বিক্রমপুরেব টঙ্গীবাড়ী গ্রামে। তাঁর পিতা হবকুমার দাশগুপ্ত এবং মাতা নির্মলা দেবী।

তিনি ময়মনসিংহ বিজ্ঞানময়ী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস কবেন ১৯২৯ সালে। তাবপব ঢাকা ইডেন কলেজে ও কলিকাতাব স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়েন তিনি প্রমীলা গুপ্তেব সঙ্গে। গ্রেপ্তারও হন প্রমীলা গুপ্তেব সঙ্গেই। তাঁরা দুজনে মাসতুতো বোন।

ঢাকা ইডেন কলেজে পড়বার সময় ইংরেজের উৎপীড়ন ও অত্যাচার তাঁদের বিচলিত ক'বে তোলে। আরেকদিকে ছিল ইংবেজেব বিরুদ্ধে গান্ধীজীর

প্রমীলা গুপ্ত ও স্মীলা দাশগুপ্ত

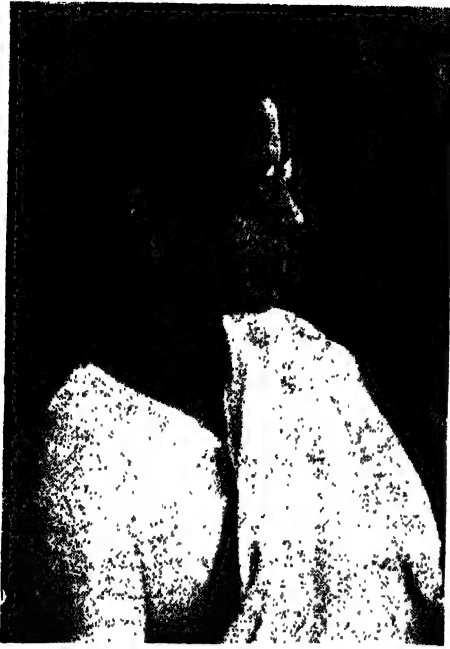
সংগ্রামের আহ্বান ও তার প্রভাব। ক্রমে তাঁরা 'ত্রিসংঘ' নামক বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন।

তাঁরা অন্য কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন, টাকা তুলে কংগ্রেসকে দিতেন। ইডেন হোস্টেলের মতো গভর্নমেন্ট হোস্টেলের মধ্যেও পিস্তল লুকিয়ে রাখতেন এবং সেগুলি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

যাঁরা 'জয়শ্রী' পত্রিকা পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে স্মীলা দাশগুপ্ত ও প্রমীলা গুপ্ত ছিলেন অন্যতম।

১৯৩২ সালে স্মীলা দাশগুপ্ত ও প্রমীলা গুপ্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এ. পড়বার সময় গ্রেপ্তার হন। তাঁরা ডেটিনিউ রূপে বন্দী থাকেন প্রেসিডেন্সি, তিঁজলী প্রভৃতি জেলে। জেলের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা বি.এ. পাস করেন।

১৯৩৭ সালে তাঁরা মুক্তি পান।



ইন্দুসুধা ঘোষ



ইন্দুসুধা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহে। তাঁর দেশ ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনীতে। তাঁর পিতা সতীশচন্দ্র ঘোষ ও মাতা প্রিয়কুমারী দেবী।

ময়মনসিংহ বিজ্ঞানময়ী স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি শান্তি-নিকেতনের কলাভবনে আচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্রীরূপে ১৯২৬ সাল থেকে চার বছর কলাশিল্পে শিক্ষালাভ করেন।

১৯২৬ সালে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর-দলের কর্মীদের প্রভাবে এসে রাজনৈতিক কর্মে অল্পপ্রাণিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা, রিভলভার রাখা, এবং সংগঠন করার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। শান্তিনিকেতন তাঁর পক্ষে নিরাপদ স্থান ছিল।

১৯৩২ সালে ওয়াটসন হত্যাকাণ্ডের মামলার পলাতক কর্মীদের তিনি চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়দান করেন। পরে পুলিশ তাঁর সম্বন্ধেও এত তৎপর হয়ে ওঠে যে, অবশেষে ইন্দুসুধা ঘোষকেই পলাতক হয়ে জলপাইগুড়ির সামসিং নামে এক চা-বাগানে চলে যেতে হয়। পুলিশ সেখান থেকে খুঁজে বার করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি

মামলা থেকে মুক্তি পান। তারপর তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে প্রেসিডেন্সি ও হিজলী জেলে আটক রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

হিজলী জেলের কঠিন নীরস দিনগুলি যখন বন্দীদের কাছে দুর্বল হয়ে উঠত তাঁরা ইন্দুসুধা ঘোষের ছোট্ট সেলটির কাছে গেলে যেন একটি শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর পবিত্র লাভ করতেন। ছবি সকলে আঁকতে জানে না, বুঝতেও পারে না। কিন্তু ইন্দুসুধা ঘোষের ছবি আঁকবার ঘরখানিতে যে-কেউ যেতেন তাঁর মনটা যেন একটা বসন্তাশ্রিত ও নৃতনত্বের স্বাদ পেত। যে শুষ্ক মন সেই ঘরে ঢুকেছিল সে-মনটা ফিবে আসবাব সময় স্নিগ্ধ রসস্রোত হয়ে বেরিয়ে আসত। ইন্দুসুধা জেলে গিয়েছিলেন যেন অল্প বন্দীদের কঠিন জীবনযাত্রায় আনন্দস্পর্শ দান করতে। বন্দীরা ভাবতেন, আচার্য নন্দলালের ছাত্রীই যদি এমন তবে রসের উৎস সেই আচার্য না জানি কি।

শুধু ছবি আঁকা নয়। ইন্দুসুধা ঘোষের ছিল একটি ছোট্ট বাগান। তাঁর রজনীগন্ধার ঝাড় কঠিন লাল মাটিতে তেমন কিছু ঝোপে ঝাড়ে বেড়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু কাবাগাবে সেদিন দুটি রজনীগন্ধা এবং চারটি বেলফুল ফুটলেও মনে হ'ত স্বর্গের সুষমা যেন বাগানটিতে ছড়িয়ে আছে। তারি মাঝে বসে ইন্দুসুধা ছোট্ট একটি খুবপি হাতে নীরস কঠিন মাটি খুঁড়ছেন, বুঝি ওইখানে পাবেন তিনি অজানা বহুশ্রের সন্ধান। বন্দী ছাড়া ঐ দৃশ্যের নাধূর্ষ অস্ত্রের বুঝবাব সাধ্য নেই।

ইন্দুসুধা ঘোষের 'এপ্রিল ফুল' করবার কাহিনীটুকু না বললে তাঁর কথা অপূর্ণ থেকে যাবে। ময়দা আব রং দিয়ে প্রকাণ্ড এক সাপ বানিয়ে রেখে এলেন তিনি চট্টগ্রামের বীরাজনা ইন্দুমতী সিংহের খাটের তলায়। রাতে শুতে গিয়ে সেটা দেখে সকলে মিলে তারস্বরে চীৎকার—“সাপ! সাপ!” বাইরে থেকে ছুটে এল জমাদার, সিপাই। খাটের ডাঙা দিয়ে সিপাইরা ছাতু-ছাতু ক'রে ফেলল সাপটা। ইন্দুসুধা ঘোষ হেসে গড়াগড়ি। জেলের মধ্যে রসের আধার ছিলেন তিনি।

আভা দে



১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে আইন অমান্ত আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলেছিল। বাংলার নারীশক্তি সেই স্রোতে তীব্র গতি এনে দিয়েছিল। যেসব দুর্ধর্ষ বীরাক্ষরী সেসময়ে ইংরেজের আইন অবজ্ঞা ক'বে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'বে বীরত্বের পবিচয় দিয়ে গেছেন, আভা দে তাঁদের মধ্য একজন।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বে আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান ক'বে আভা দে দণ্ডিত হন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকেন। ইংবেজেব জেলের মধ্যে ভাবতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা ছিল অপরাধ। সেখানে থাকবে ইংবেজদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। কিন্তু আইন-অমান্তকারী বন্দিনীরা প্রেসিডেন্সি জেলে একদিন কেমন ক'বে যেন তৈরী ক'রে ফেলেন একটি ভারতীয় জাতীয় পতাকা। বেপেরোয়া আভা দে ফিমেল ইয়ার্ডের বিবাট অস্থগাছটাব আগায় উঠে উড়িয়ে দিয়ে এলেন সেই জাতীয় পতাকা। বন্দিনীরা সম্মুখে উল্লাসে ধ্বনি ক'রে উঠলেন—'বন্দেমাতরম্', 'জাতীয় পতাকা কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'। কোথায় ছিল জেলের জমাদাবনী, মেট্রন সব ছুটে এল। বাইবে থেকে ছুটে এল জেলাব, জমাদাব, সিপাই। টেনে ছিঁড়ে ফেললো তাবা সেই জাতীয় পতাকা। জেলখানা তোলপাড়। অবিবাম জয়ধ্বনি চলেছে—'জাতীয় পতাকা কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'—কে কাব তোয়াক্কা বাথে। শাস্তি পবোয়া করা আভা দে-র কর্ম ছিল না। আভা জেলের এই নিয়ম ভঙ্গ কবাব সাজা ও সম্পূর্ণ কাবাদগু ভোগ কবাব পর মুক্তি পান ১৯৩০ সালের নভেম্বরের শেষে।

১৯৩২ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় ২৬শে জাছুয়াবি মহুমেন্টের তলায় গিয়েছিলেন আভা দে স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবতে। সভা ভাঙবার জন্য জনতাব উপর দিয়ে পুলিশ ঘোড়-সোয়ার চালিয়ে দেয় তাঁদের নিশ্চিষ্ট ক'রে দিতে। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে মরিয়া হয়ে আভা যখন ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে প্রতিরোধ করছেন ঠিক সেই

সময় একটা ঘোড়ার পায়ের নীচে একটি মহিলা প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে তিনি ছুটে গিয়ে তাঁকে রক্ষা ক'রে বাইরে নিয়ে এলেন। সেদিনের বহু গ্রেপ্তারের মধ্যে আভা দে ছিলেন অন্যতম।

অদ্ভুত সাহস ও অটুট স্বাস্থ্য ছিল আভা দে-র। শুধু শরীর নয়, মনও ছিল তাঁর অপর্ঘ্যাপ্ত উৎসাহ ও আনন্দে ঝলমল। অগ্নায় সহ্য করার মেয়ে তিনি ছিলেন না। অথচ প্রাণ চেলে লোকের উপকার করতে ভালবাসতেন।

শরীরের শক্তি? টাগ্-অব্-ওয়ার জিততে, হাডুডু খেলতে, গাছে চড়তে, দৌড়ে পাল্লা দিতে, জেলখানা জমিয়ে গরম রাখতে আভা দে-র সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।

এবারে অনেকদিন ছিলেন তিনি বহরমপুর জেলে। একটা কাঁঠালগাছ ছিল সেখানে। একদিন আভা দে গাছে উঠে পেড়ে আনলেন মস্ত একটা কাঁঠাল। বন্দিনীরা হৈ হৈ ক'রে কাঁচা কাঁঠালটি রান্না ক'রে ভোজন সমাধা করলেন। হঠাৎ জেল-কর্তৃপক্ষ তেড়ে এল। গাছে চড়া এবং কাঁঠাল-পাড়া জেলে নিষিদ্ধ। কে এমন কাজ করেছে? আভা এগিয়ে এলেন সামনে। তাঁকে বলা হ'ল—“বলুন, এমন কাজ আপনি আর করবেন না। নইলে শাস্তি পেতে হবে।” আভা দে-র সোজা মাথাটা কিছুতেই নত হ'ল না। শাস্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেব তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে।

ঐ বহরমপুরে থাকতেই একদিন আভা দে দেখলেন, ঘরের ভিতর একটা কাকডা-বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা-মাত্রই পায়ের চটি দিয়ে তাকে তিনি শেষ করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি মহিলা তাঁর পিঠে সজোরে এক মুঠোঘাত বসিয়ে দিলেন বিছার উপর হিংসার অপরাধে। আরেকদিন ঐ মহিলাটিই ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা সাপ দেখতে পেয়ে কাতরভাবে চোঁচাতে লাগলেন—“আভা দেবী, শীগ্গীর আসুন, সাপ!” আভা দেবী একমুহূর্ত ভাবলেন, সাপ মারলে বুঝি হিংসা হয় না? কামডাক সাপ আমাদের। পরমুহূর্তেই আভা দেবী ছুটলেন সাপ মারতে।

ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর এবার তিনি মুক্তি পান।

জেলে ছিলেন তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাস। বাইরে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। ‘ছাত্রীসংঘ’র পক্ষ থেকে একবার সাইকেল-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দশজনের মধ্যে, কলিকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত। আভা দে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী

বিপ্লবী কাজ করবার সময় বহু বে-আইনী জিনিস ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। সেগুলি লুকিয়ে রাখবার বিরাট দায়িত্ব তিনি সগর্বে বহন করেছেন।

কিন্তু সেই সময় ভিতবে ভিতবে তিনি দাবিদ্র্যের পীড়নে কতখানি পীড়িত ছিলেন নে-কথা কেউ জানত না। এমন অনেক দিন গেছে যখন তিনি শুধু দু'চাব পয়সার তেলেভাজ খাবার খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। তাবই ফলে তিনি বেবিবেবি রোগে আক্রান্ত হন। লোহার মতো স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে যায়। চেষ্টা গেলেন দেওয়াবে। সেখানেই এই বীর নাবীর জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে যায় সকলের অজ্ঞাতে, সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সালে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপ্রাচুর্য্যবশা একটি দুঃসাহসিক সৈনিকের মৃত্যুতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেদিন কেউ সেখানে ছিল না।

শান্তিসুধা ঘোষ



বরিশাল শহরে ১৯০৭ সালে ২৭শে জুন শান্তিসুধা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বরিশালের গাভা গ্রামে হ'লেও শান্তিসুধা বরিশাল শহরেই মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও মাতা অন্নদাসুন্দরী দেবী। স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ছোটবেলা থেকে তিনি যেমনই মেধাবী ছাত্রী তেমনই ৬মাস্ত্য ছিলেন। ছাত্রীজীবনে উচ্চতম বৃত্তির অধিকারী হয়ে তিনি ম্যাট্রিক ও আইএ পাস করেন। অঙ্কে অনার্স নিয়ে তিনি ১৯২৮ সালে বিএ পবীক্ষায় 'ঈশান স্কলার' হয়ে পুরুষ ও নারী সমাজকে চমৎকৃত করেন। সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্বাধিক নম্বর তিনিই পেয়েছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশ্র-গণিত নিয়ে এম.এ. পড়তে যান। ১৯৩০ সালে অসুস্থ শরীরেও পবীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বরিশাল বি. এম. কলেজে তিনি এবং আবো তিনটি ছাত্রী সহশিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। পরে ঐ কলেজেই শান্তিসুধা ঘোষ অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন।

শান্তিসুধা ঘোষ ছাত্রীজীবনে রাজনীতির জটিল পথে নামেন নাই। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর রাজনৈতিক চেতনার

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

উদ্বোধন হয়। ধীরে ধীরে সেটি ক্রমবিকাশ লাভ করে। সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী তাঁকে প্রবুদ্ধ করে। এককথায় মনে হয়, অরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব ও পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় তাঁকে আকৃষ্ট করে।

এম.এ. পাস কবার পর যখন ববিশাল ফিরে যান তখন তিনি রাজনৈতিক কাজে যোগদান করেন। তাঁর ছোট ভাই রুণু ও বোন অপবাজিতা ঘোষের মারফত স্থানীয় তরুণসংঘের কর্মীদের তিনি কিছু কিছু সাহায্য করতে থাকেন। সেই সময় বরিশালে যুগান্তর-দলের শঙ্করমঠ, তরুণসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিপ্লবাত্মক কাজে ব্রতী ছিল। তাদের নীতিনিষ্ঠ আচরণ তাঁকে আকৃষ্ট করে।

তরুণসংঘে যোগদানের ফলে শাস্তিস্থধা ঘোষ, রুণু ও অপবাজিতা একত্রে বিপ্লবীকর্মে সহযোগী হন। বন্দুক, বিভলভার প্রভৃতি দ্রব্যাদি জিনিস রাখার দায়িত্ব নিলেন শাস্তিস্থধা ও অপবাজিতা ঘোষ।

১৯৩১ সালে শাস্তিস্থধা ঘোষ ববিশালের মেয়েদের নিয়ে ‘শক্তিবাহিনী’ নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘের কর্মী ছিলেন লীলা চ্যাটার্জী, অনিলা চ্যাটার্জী, মুকুল সেন, নির্মলা ঘোষ, অপবাজিতা ঘোষ প্রভৃতি। এখানে লাঠি চোর। খেলা, সাইকেল ও নৌ-চালনা শিক্ষা দেওয়া হ’ত। নানাবিধ শবীষচর্চাও ব্যাবস্থাও ছিল। কাজেই পুলিশের কড়া নজর এসে পড়তে দেবী হ’ল না। শাসানি, ধমকানি ও জুলুম চলে কর্মীদের উপর এবং প্রতিষ্ঠাত্রীর উপর। ছেলে-কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার ক’রে আটক রাখতে থাকে।

পুলিশের কড়া দৃষ্টিকে একটু নরম করার প্রচেষ্টায় তাঁরা নির্দোষ একটি ‘হরিজন বিদ্যামন্দির’ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন শক্তিসংঘের কাষকলাপ যথা- সম্ভব এই বিদ্যামন্দিরের ঘবে বসেই পরিচালিত হ’ত।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে অহিংসপন্থী ও বিপ্লবপন্থী সক্রিয় পুঙ্খ কন্নিগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে যান। স্বতবাং মহিলা-কর্মীদের মধ্যে শাস্তিস্থধা ঘোষ প্রভৃতি ঝারা তখন বাইবে ছিলেন তাদের উপরই অনেকখানি কাজের ভার এসে পড়ে। কর্মনির্দেশও তাঁরাই দিতেন। নতুন অনেক কর্মী এগিয়ে এলেন। এইভাবে শাস্তিস্থধা ঘোষের কিছুদিন বরিশালে কেটে গেল।

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের অধ্যাপনার কাজ নিয়ে শাস্তিস্থধা ঘোষ কলিকাতা চলে আসেন। এখানে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে তিনি কাজে যুক্ত হন। তখন দেশের সর্বত্র ব্যাপক গ্রেপ্তারের পর

যে মুষ্টিমেয় মহিলা-কর্মী পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের সকলকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পান কল্যাণী দাস ও শান্তিস্থা ঘোষ। একদিকে এই সংযোগের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে ছাত্রীসংঘের মারফত মহিলা-সংগঠনের কাজ তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত করেন। কল্যাণী দাসের সাহচর্যে শান্তিস্থা ঘোষ গোপনে দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন।

গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিশ অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৩ সালের ১১ই নভেম্বর ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে শান্তিস্থা ঘোষকেও এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে মাস্থানেক বাঁধে প্রেসিডেন্সি জেলে। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে জামীনে খালাস দিতে হয়। ১৯৩৪ সালের ২রা মে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে বরিশালে ও পুরীতে স্বগৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩৮ সালের মাচ মাসে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

সেসময় সেখানকার জনসাধারণের অহুরোধে তিনি বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের সময় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও জেলে নিয়ে যায়।

কিছুদিন পরে অসুস্থতার দরুন তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। বছর-খানেক পরে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর চিকিৎসার্থে কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় তখন মন্বন্তরের বিভীষিকা চলছে। সে বীভৎস দৃশ্য তাঁর মনকে পীড়িত ক'রে তোলে।

তিনি 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সদস্য হয়ে বরিশাল ফিরে গিয়ে প্রথমে একটি সেবাকেন্দ্র গঠন করেন। সেখান থেকে চাউল, দুধ ও বস্ত্র বিতরণ করা হ'ত। পরে ওই সেবাকেন্দ্রকে 'মহিলা শিল্পভবন' নামে দুঃস্থ মহিলাদের একটি শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। তার পরিচালিকা ছিলেন ইন্দুপ্রভা মজুমদার।

সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারী থাকায় শান্তিস্থা ঘোষ তখনো বি. এম. কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিতে পারেন নাই। ১৯৪৫ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর তিনি পুনরায় ঐ কলেজে প্রবেশ করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়। শান্তিস্থধা ঘোষের পিতামাতার পরলোকগমনের পর তিনি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণ একলা পড়ে যান। ১৯৫০ সালে নিরুপাধ শান্তিস্থধা মাতৃভূমি ও কর্মভূমি ববিশালকে দূরে রেখে বাধ্য হয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।

সাহিত্যে তাঁর অল্পবাগ সুপরিচিত। তাঁর বচনা প্রকাশিত হয় ‘জয়শ্রী’, ‘মন্দিরা’ ও অন্যান্য পত্রিকাতে। ‘গোলকধাঁধা’, ‘১৯৩০ সাল’, ‘নারী’ প্রভৃতি পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেছেন নানা সময়ে।

শান্তিস্থধা ঘোষ বর্তমানে জগলি মহিলা-কলেজেবু প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর রুগ্ন শীর্ণ দেহের উপবে মস্তবড় একটা মাথাব নীচে বড় বড় চোখদুটোই কথা বলে। মুখেব ভাষা দিখে কথা বোঝাবার তাঁর বেশী দরকার হয় না। মুখেব চাইতে চোখ যে কত বেশী ভাষা প্রকাশ কবতে পারে তাব একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শান্তিস্থধা ঘোষ।

সুলতা মিত্র (কর)



সুলতা মিত্র জন্মগ্রহণ কবেছিলেন কলিকাতায় ১৯০৭ সালে। পৈতৃক দেশ তাদেব চন্দ্রনগর। তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা স্নহাসিনী দেবী।

সুলতা মিত্রের মা ছিলেন গোঁড়া ও বক্ষণশীল পবিবাবেব মধ্যে একটি উদাবচেতা মহিলা। পবিবাবেব সকলে যখন তাঁব ছোট ছোট মেয়েদের বিবাহ দিতে প্রবোচনা দিয়েছেন তিনি তখন মেবেদেব লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা কবেছেন, স্বদেশেব দুঃখহৃদশা তাঁদেব কাছে বর্ণনা কবেছেন, এবং তাঁদেব হৃদয়ে দেশসেবাব আকাঙ্ক্ষা জাগাবাব জন্ম প্রেবণা দিয়েছেন। মামাবাডীতে মান্বষ হন সুলতা মিত্রবা। মামারা এবং তাঁদেব বিদ্ঘাট পবিবাব যখন দশ বছব বয়স হতেই সুলতা মিত্রের বিবাহ দেবার জন্ম অস্থিব হয়ে ওঠেন তখন তাঁর মা এবং মাযেব এক কাকা জোব ক'বে মেবেদেব বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখান থেকেই সুলতা মিত্র শেষ পর্যন্ত বি.এ. পাস কবেন। ১৯২৬ সালে আইএসসি. পাস করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞার অধ্যাপক কুলেশচন্দ্র কবের সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৩০ সালে ও ১৯৩২ সালে সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধীজী ও কংগ্রেসেব

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

আইন অমান্য আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। তখনকার রাজনৈতিক কর্মী শোভারাগী দত্ত ও কল্যাণী দাস তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় স্থলতা কর ১৯৩২ সালে অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূ হয়েও তিনি প্রকাশ্যে রাজপথে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করেন, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করেন। এক নিষিদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগদান করাতে তাঁর ছবমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাসের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের পথ বেছে নেন। যুগান্তর-দলের বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে কাজ করতে থাকেন।

তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা হ'ত দেশের মঙ্গলের জন্ত চিবজীবন তিনি কারাবাস করবেন; স্বামী, সংসার ও পরিবার পরিজন সব ত্যাগ করবেন। এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পরিবারের সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের শয়নকক্ষে বিপ্লবীদের সভা করতে দিতেন, পলাতককে অর্থ সাহায্য করতেন, রিভলভার ও গোপনীয় কাগজপত্র নিজের ঘরে রাখতেন এবং অস্ত্র দিয়ে আসতেন।

পুলিসেব সন্দেহ থেকে পলাতক দীনেশ মজুমদারকে রক্ষা করবার জন্ত একদিন গভীর রাতে তিনি বধূবেশে গিয়ে নৌকায় ক'রে তাঁকে চন্দননগরের গোপন গৃহে পৌঁছে দিয়ে এলেন। পুলিশ টের পেল না।

গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কেব টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিশ তাঁদের বাড়ী তল্লাসী কবে এবং স্থলতা করকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়ে ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে চৌদ্দদিন রেখে দেয় ১৯৩৩ সালে।

‘খানার নির্জন হাজতের মধ্যে তাঁকে বই পড়তে অথবা কারও সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হ'ত না। অন্ধকার, দুর্গন্ধে ভরা হাজত-ঘরে একা থাকা এবং কদর্য খাওয়া এই ছিল পুরস্কার। প্রত্যহ তাঁকে নিয়ে যেতো গোয়েন্দা-বিভাগের এস.বি. আফিসে। সেখানে জেরা চলত দিনের পর দিন। ভয় দেখাত, স্বীকারোক্তি না করলে তাঁকে আজীবন কারাগারে কাটাতে হবে, স্বামীর চাকরী যাবে। স্বীকারোক্তি আদায় করা তবু পুলিশের সম্ভব হয়নি। তখন পাঠিয়ে দেয় তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে একমাস রাখার পর প্রমাণভাবে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দেয়।

হলতা মিত্র (কর)

কিন্তু তারপর তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয় পুর্কলিয়াতে, সেখানে তাঁর দুই বছর কাটে।

দশ বছর বাদে তিনি এম.এ. পাস করেন এবং বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতে থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর একেবারে ভেঙে যায়। আজ দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ তিনি শয্যাগত। শুয়ে-শুয়ে তিনি কয়েকখানা শিশু-সাহিত্য রচনা ক'রে জনপ্রিয় লেখিকা হয়েছেন। 'ছোটদের বিদেশী গল্প সংকলন', 'এগারসনের গল্প', 'অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প', 'বিদেশী শিশু নাটক', 'কাঠের পুতুল ক্ষুদিরাম', প্রভৃতি চিত্রাক্ষক পুস্তক তিনি শিশুদের জন্য লিখে স্তন্যম অর্জন করেছেন।

তাঁর কাছে গিয়ে বসলে প্রথমটা চমকে উঠতে হয়, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে। তিনি বালিশটা একটু উচু ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলেন শান্ত হাসিমুখে। অতি অল্পক্ষণই কথা বলতে পারেন, কিন্তু যতটুকু বলেন তাতে তাঁর আন্তরিক তায় শ্রোতাব মনটা ভরে যায়, তৃপ্তি পায়।

সবোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ)



সবোজ আভা দাসচৌধুরী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বৈশাখ মাসে। পৈতৃক দেশ তাঁদের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের জামিতি গামে। তাঁর পিতা বোহিনীকুমার দাসচৌধুরী, মাতা পমোদাসুন্দরী দেবী।

১৯৩৭ সালে তিনি বৈশাখ থেকে বিএ পাস করেন।

১৯২৯ সালে তিনি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অন্তর্দীপন সমিতির নীতিতে বৈশাখ দীক্ষিত হন। তিনি স্থানীয় অন্তর্দীপন দলের মহিলা নংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করতে নই, তার প্রভাবে তার মা-ভাইবাও প্রভাবিত হন এবং সমস্ত পরিবারটাই বিপ্লবীদের একটি প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হয়। তাঁদের বাড়িতে নিবিড় পুস্তক ও অগ্নি অস্ত্র লুক্কায়িত থাকত।

টিটাগড় মডেল মামলায় পূর্বে সংশ্লিষ্ট আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা দুযোগেব মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় সবোজ আভা দাসচৌধুরী ও তাঁর সহকর্মী মেয়েবা অর্থ দিয়ে এবং অলঙ্কার বিক্রি করে বিপ্লবীদের জীবন-যাপনের ও বিশ্ব প্রচেষ্টার সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের আশ্রয়ে একটি গোপন কেন্দ্র ছিল সবোজ আভার গৃহ। এই নিশ্চিত আশ্রয় যদি উন্মুক্ত না থাকত তবে বিপ্লবীদের অনেকেরই সেই সময় বাইবে থেকে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হ'ত।

কৃমে সবোজ আভা দাসচৌধুরী পুলিশের নজরে পড়ে যান। তাঁদের বাড়ি তল্লাসী করা, তাঁকে বাব বাব থানায় নিয়ে গিয়ে জেব করা হ'তে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সব সময় পুলিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অবশেষে ১৯৩৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডেটিনিউ রূপে দিনাজপুর, দার্জিলিং, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জেলে বন্দী বাধে প্রায় দুই বছর। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালে বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সবোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ)

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ও তিনি নিজের বাড়ীকে কর্মীদের আশ্রয়-কেন্দ্র করেন। কর্মীরা তাঁর আশ্রয়ে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি ও তাঁর স্বামী কলিকাতায় 'মহামানব শিক্ষাসদন' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সবোজ আভা নাগ অনেক বস্ত্রী ও দরিদ্রের মধ্যে সমাজসেবার কাজ করতেন।

১৯৫১ সালের ১৯শে আগস্ট দুরারোগ্য জবে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। একটি নিরভিমান ও নীরব কর্মী সেদিন অকালে বিদায় নিলেন। কত দরিদ্র পরিবার ও অসহায় নারী যে সেদিন অনাথ হয়ে গেলেন তা বলা যায় না।



ইলা সেন

★

১৯০৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ইলা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফেডারেটেড্ মালয় স্টেট্‌স্-এ। পৈতৃক দেশ তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরেব মধ্যে সোনারং গ্রামে। তাঁর পিতা ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও মাতা সুরবালা সেন। পিতা ফেডারেটেড্ মালয় স্টেট্‌স্-এর ডাক্তার ছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা বসবাস করতেন। পিতামাতা ছিলেন উদারমতাবলম্বী ও শিক্ষাগুরাগী।

১৯৩৭ সালে গোহাটিব নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে ইলা সেনের বিবাহ হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সংবাদপত্রসেবী মাখনলাল সেন তাঁর পিতাব খুড়তুতো ভাই।

শিশুকাল থেকেই ইলা সেনের শিক্ষা শুরু হয় মালয়ের রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট স্কুলে। অনার্স সহ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করেন তিনি ১৯২৩ সালে।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় এসে ডায়োসেসান কলেজ থেকে তিনি আই.এ. পাস করেন এবং ১৯২৭ সালে বেথুন কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের শোভাযাত্রায় তিনি যোগদান করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম.এ. এবং বি.টি. পাস করেন।

ইলা সেন ফেডারেটেড্‌ মালয় স্টেট্‌স্‌-এ রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট স্কুলে সম্পূর্ণ ইংরেজী আবহাওয়ায় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত ক'রে তারুণ্যে পরিণত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েই লালিতপালিত হয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি কলেজে পড়তে ভারতবর্ষে চলে আসেন তখন ভারতে জাতীয় আন্দোলনের খরস্রোত তীব্রবেগে বয়ে চলেছিল। তীরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দূরে রেখে শুধু লক্ষ্য ক'রে যাবেন সে-মেয়ে ইলা ছিলেন না। আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে, নিজেকে বিপন্ন করেও, লাফিয়ে প'ড়ে তবে তিনি সার্থক বোধ করেছিলেন। পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় বর্ধিত ইলা সেনের ভিতর থেকে ফুটে উঠেছিল স্বদেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী ও অসামান্য এক ভারতীয় নারী।

১৯২৯ সালে তিনি কল্যাণী দাসের ছাত্রীসংঘের সভ্য হন এবং তখন থেকেই তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতা দিবস পালন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাজনৈতিক সভা'ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে তিনি 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে বড়বাজারে বিলিভী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে যেতেন এবং অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা ক'রে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন।

এইসময়কার একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় সভা ও শোভাযাত্রা বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ২২শে জুন দেশবন্ধু শ্রদ্ধতিথি বার্ষিকীতে সত্যাগ্রহীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে মেয়েদের শোভাযাত্রা দেশবন্ধু পার্কের দিকে অগ্রসর হয়। পুরুষ সত্যাগ্রহীরা ছ'চারজন ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে আগেই গিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের নিকট অবস্থান করেন। নারী সত্যাগ্রহীদের পিছনে অশ্বারোহী পুলিশ ও পদাতিক পুলিশ অগ্রসর হ'তে থাকে। ইলা সেন অশ্বারোহী পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের উপর আক্রমণ যথাসাধ্য রোধ করবার ইচ্ছা নিয়ে সতর্কভাবে চলতে থাকেন। শোভাযাত্রা হারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) অতিক্রম করবার পর পুরুষ-সত্যাগ্রহীরা মহিল্যদের সম্মুখভাগে শোভাযাত্রা গঠন করেন। পুলিশ-অফিসার পুরুষ-সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চার্জ করতে পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিসকে হুকুম দেয়। পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিস নারী-সত্যাগ্রহীদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, ইলা সেন সেই

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ঘোড়ার লাগাম ধ'রে প্রতিরোধ করলেন এবং অগ্রসর হ'তে বাধা দিলেন। এইভাবে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটায় যখনই কোনো অশ্বারোহী পুলিশ তাঁর সামনে দিবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল তখনই তিনি বাধা দিবে প্রতিরোধ করতে থাকেন। অত্যাচার অনেক মহিলাও অম্লরূপভাবে বাধা দিতে থাকেন। শোভাযাত্রা দেশবন্ধু পার্কে পৌছাবার পর সভার অনুষ্ঠান আবস্ত হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করবার জ্ঞাত প্রস্তুত হয়ে এক এক স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। যে ইওরোপীয়ান অশ্বারোহী অফিসারটি লাঠিচার্জের লক্ষ্যে দেবাব জ্ঞাত অগ্রসর হ'তে থাকে ইলা সেন তাকে বাধা দেবার জ্ঞাত দৃঢ়মুষ্টিতে তার ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফেলেন। ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু তবুও ইলা সেনের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হয়নি। ঘোড়া লাফিয়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে তিনিও ঘোড়ার লাগাম ধরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে থাকেন। এবং ঘোড়া নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেমে আসেন। এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোড়ার সঙ্গে ইলা সেনের গঠানামা চলতে থাকে। তাঁর এই ঙ্গসাহসিক কাণ্ড দেখে পুলিশ ও সত্যাগ্রহী উভয়পক্ষই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। একটি ক্ষীণাঙ্গী নারীর অভূতপূর্ব সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তা সেদিন অনেক সত্যাগ্রহীর মাথা বাঁচিয়েছিল।

ওদিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সৈন্যদেব যোগদান করতে আবেদন জানিয়ে ইন্দুমতী গোবেঙ্ক। ইস্তাহার প্রচার ক'রছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু হয়। ইলা সেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলায় সাক্ষ্য দেবাব জ্ঞাত কোর্ট ইলা সেনকে আহ্বান করে। কিন্তু তিনি কোর্টে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজের আইন আদালত তিনি মানেন না। এই আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। এই পরোয়ানা জারী করার পূর্বেই তাঁকে পিকেটিং-এর দায়ে গ্রেপ্তার ক'রে চারমাসের সাজা দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে জেলে সতীন সেন প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশ-কমিশনার টেগার্টের প্রহারের প্রতিবাদে তিনি জেলে অনশন অবলম্বন করেন।

অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সে যোগদান ক'রে ১৯৪৫ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা শাখার ভার গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪৮ সালে দিল্লী যাওয়া পর্যন্ত ঐ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে কলিকাতা দাঙ্গার সময় দাঙ্গাপীড়িতদের উদ্ধার ও সাহায্যকার্ণে তিনি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। অত্যাচারি তিনি নানা সেবা ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছেন।

প্রভা চট্টোপাধ্যায়



প্রভা দেবীর জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে (বাংলা ১৩০৬ সালে) ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরেব এক গ্রামে। তাঁর পিতা দুর্গামোহন চক্রবর্তী ও মাতা সর্বোজিনী দেবী।

তাঁর বিবাহ হয় দিনাজপুর জেলায় বালুবঘাটের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা স্বরেশবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীর প্রেরণায় প্রভা দেবীর মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। পবানীন দেশের মুক্তিই তাঁর জীবনের সাধনা হয়ে ওঠে।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কিছুদিন পর তিনি বালুবঘাটের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করতেন মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বাজলক্ষ্মী গুহও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সফর করতেন।

১৯২০ সালে (বাংলা ১৩২৭ সালে), স্বরেশবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রমোদাঙ্গলদেবী দেবীর নেতৃত্বে ‘বালুবঘাট মহিলা সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহিলা-সমিতির ইতিহাসই প্রধানতঃ বালুবঘাট মহিলা-কর্মীদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইতিহাস।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৬ই এপ্রিল সমিতির সভানেত্রী প্রমোদাশ্ৰমদী দেবী কংগ্রেস-প্রাক্কণের এক বিরাট সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রায় একহাজার মহিলা সেদিনের সভায় পাঠ করেন স্বাধীনতাব সঙ্কল্পবাক্য।

১১ই এপ্রিল মহিলাদের এক বিশাল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে সমবেত হয় কংগ্রেস-প্রাক্কণে। এই সভায় প্রভা দেবী জলন্ত ভাষায় লবণ-আইন আন্দোলনে যোগদান করতে প্রতিটি মহিলাকে আহ্বান কবেন।

১২ই এপ্রিল আটজন মহিলা-স্বৈচ্ছাসেবিকা মদের দোকানের সামনে পিকেটিং ও অবস্থান-সত্যাগ্রহ করেন। এরপর প্রতিদিনই আটজন মহিলা-সত্যাগ্রহী মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন।

১৩ই এপ্রিল বালুবঘাট কংগ্রেস লবণ আইন ভঙ্গ করণাব প্রস্তাব কবে। সেদিন বিকালে কংগ্রেস-প্রাক্কণে এক বিরাট সভায় স্বরেশবস্কন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী প্রভা দেবীকে প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করতে আহ্বান করেন। প্রভা দেবীর অন্তবতী হয়ে সভার প্রায় পাঁচশত মহিলা সেদিন লবণ আইন ভঙ্গ কবেন। এই সভা মহকুমা ব্যাপী মহিলাদেব মনে বিপুল উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। এরপরই বালুরঘাটে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়।

মহিলা কর্মীদের সহযোগিতায় বালুরঘাটে মদ-গাঁজার দোকানে, আদালতে ও স্কুলে পিকেটিং সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রথম সত্যাগ্রহীদের নেত্রী প্রভা দেবী ও সমিতির সম্পাদিকা বেলা দেবী গ্রেপ্তার হন। দুজনেরই ১৩ মাসের কারাদণ্ড হয়। তাঁদের পরে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ক'রে অগ্রাগ্র মহিলাগণও কারাবরণ করেন।

বালুবঘাট মহিলা-সমিতির কর্মিগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করেন। সেই সময়ে মহকুমা শাসক (S.D.O.) তাঁদের সমিতির অফিসের যাবতীয় জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। বেলা দেবী ও প্রভা দেবীর নেতৃত্বে সমিতির উৎসাহী কর্মিগণ শোভাযাত্রা ক'রে কংগ্রেস-প্রাক্কণের ভিতরে তাঁদের সমিতির অফিস দখল করতে যান। তাঁরা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তাঁরা কারাদণ্ডিত হন। এই সম্পর্কে কারাবরণ করেন বিমলাশ্ৰমদী সেন, মাতঙ্গিনী দাশগুপ্তা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতিও।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগ সংগঠিত হবার পর 'বালুরঘাট মহিলা সমিতি' তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রভা চট্টোপাধ্যায়

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বছর এই মহিলা-সমিতি, প্রাথমিক অবস্থায় অতি অল্প অর্থ সম্বল ক'রে, ক্রমে হাসপাতালে প্রসূতি-সদনের ব্যবস্থা, অবৈতনিক পাঠশালা, শিল্প-প্রদর্শনী ইত্যাদি নানা জনসেবার কাজ ক'রে চলেছিল।

১৯৪২ সালে ভাবতব্যাপী গণ-আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠেছিল বালুরঘাটেও। শহরের প্রায় অধিকাংশ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই আন্দোলনেও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

তাবপব থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী গঠন-মূলক কাজ ক'রে চলেছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ক'বে, এল বহুপ্রার্থিত স্বাধীনতা। সীমান্ত শহর বালুরঘাটেও নানা ভ্রাণ ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও একালের কর্মীদের নিয়ে আজও প্রভা দেবী বালুরঘাট মহকুমার সর্বত্র সমাজসেবা ও মানবকল্যাণের কাজ ক'রে চলেছেন।



চারুপ্রভা সেনগুপ্ত



১৮৯৭ সালের ২৯শে মার্চ মধননিংহেব কাঠালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চাক্রপ্রভা সেনগুপ্ত। পিত্রালয় বংশী গ্রামে। তাঁর পিতা মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মাতা কুন্তমকুমারী দেবী। আইনজীবী ও সাহিত্যিক ডঃ নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গান্ধীভক্ত ও খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাত-নামা সত্যীচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁর ভগ্নিপতি। তাঁর ভগ্নী হেমপ্রভা দাসগুপ্ত অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং গান্ধীজীব অল্পগামী হয়ে দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

চারুপ্রভা সেনগুপ্তের বিবাহ হয়েছিল ফরিদপুর জেলার লক্ষণদিয়া গ্রামের ভাবতবন্ধু সেনগুপ্তের সঙ্গে। তখন চাক্রপ্রভা সেন নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

তাঁর শ্বশুরবাড়ী ছিল একটি শিক্ষিত পরিবার। তাঁরা স্বীকৃতি প্রচারের জন্য 'অন্তঃপুর শিক্ষা সমিতি' গঠন করেছিলেন। এই শিক্ষার আবহাওয়াতে বড় হয়েছিলেন বলে চাক্রপ্রভা সেনগুপ্ত নিজেকে সাহিত্যের দিক থেকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি 'প্রিয়পূজা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। নানা পত্রিকায় লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেন।

তঁার পিত্রালয়ের শিক্ষা ছিল স্বদেশীভাবাপন্ন। শিশুশ্রমশ্রম ও তাই। সহজেই তাঁর হৃদয়ের গতি এদিকে গ'ড়ে উঠবাব স্বযোগ পেয়েছিল।

১৯২৫ সালে তিনি সূতা কাটতে এবং খন্দর পবতে শুরু কবেন। বাত্রে বাডী বাডী গিবে তিনি খন্দর বিক্রি কবতেন। স্বামী ছিলেন ফবিদপুবেব বাজবাডীৰ উকিল। সেখানেই ছিল তাঁব কর্মক্ষেত্র।

১৯২৯ সালেব এপ্রিল মাসে তাঁব স্বামীৰ মৃত্যু তাঁব জীবনে বিপুল পবিবর্তন এনে দেয়।

১৯৩০ সালে তাঁব ম্যাট্রিক পবীক্ষা ও গান্ধীজীৰ ডাণ্ডী অভিযান একই সমব যোগাযোগ হব। গান্ধীজীৰ আহ্বান তাকে এতখানি বিচলিত কবে যে, কলেজে না গিবে তিনি পুৰোপবিভাবে বাজনীতিক্ষেত্রে নেমে পড়েন।

বাজবাডী শহবে সেনময়ে মেবেবা বাইবে বেবিবে এসে আন্দোলনে যোগ দিতে বাবা পেতেন। নখানকাব প্রথম পবণ সত্যাগ্রহী দলকে আশীৰ্বাদ কবাব ভাব পড়ে তাঁর উপব। আশীৰ্বাদ অচুঠানেব স্থলে তাঁব সঙ্গে যাবাব জন্ত তিনি একটি মেয়েকে ও ন গ্রহ কবতে পাবেননি। অবশেষে একাই তিনি অচুঠান সম্পন্ন ক'বে এলেন। এইভাবে তাঁব ঘবেব গণ্ডী ভাঙলো।

পিকেটিং, বে আইনী সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান প্রভৃতি কাজ তিনি ক'বে যেতে থাকেন। বাজবাডীৰ অনেক মেয়ে এবং বোী ঘবেব বাবা ভেঙে ওখন সাহস ক'বে বেবিবে এলেন। ১৯৩০ সালেব জুলাই মাসে তাকে বাদ্র-দ্রোহমূলক বক্তৃতা কবাব অভিযোগে গ্রেপ্তার ও জবিমানা কবা হব।

১৯৩২ সালেব আন্দোলনে আইন অমান্ত কবাব অভিযোগে তাকে পুনবায় গ্রেপ্তার ক'বে ১৬ মাসেব সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩৩ সালে বেবিবে এসে তিনি হবিজন-বিভালয়েব কাজে ও চরকা খন্দর ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ কবেন। ১৯৩৫ সালে তাঁব হেলেহুদব টিটাগড ষডযন্ত্র মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার কবে এবং ঘন ঘন তাঁব বাডী তল্লাসী কবে। অথচ তাঁদেব বাডাব সঙ্গে বিপ্লবীদেব কাযকলাপেব কোনো সম্বন্ধই ছিল না।

তারপব তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। , তিনি কলিকাতা চলে আসেন ১৯৩৬ সালে। ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে যোগদান কবাতে তিনি এবং তাঁব প্রাব সব ছেলেমেয়েরাই গ্রেপ্তার হন। তিনি নিবাপত্তা বন্দীরূপে প্রায় ১০ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৪৩ সালে মুক্তি পাবার পূর্বে তিনি ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য কাজ করতে থাকেন। রাজবাড়ীতে দুঃস্থ শিশুদের জন্য এ আই ডব্লিউ সি -র সাহায্যে তিনি একটি শিশুসদন খোলেন। পরে এই শিশুসদন বৃন্দাবনী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়—নাম তার ‘কম্বববা বিজ্ঞানন্দিনী’।

১৯৭৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গার পূর্বে গান্ধীজী নোয়াখালি যাবার পথে তাঁকে সেখানে যেতে আহ্বান করা হলেও তিনি নোয়াখালি যান নাই। রাজবাড়ীতে তখন দাঙ্গার পূর্বাবস্থা। তাই তিনি সেখানে থেকেই শান্তি-কমিটি গঠন করে দাঙ্গার সম্ভাবনাকে শোধ করতে চেষ্টা করেন।

এক বিভাগ হয়ে যাবার পূর্বে তাঁর রাজবাড়ীতে যাতায়াত ছিল। কিন্তু পাসপোর্ট প্রথা চালু হবার পূর্বে মনে কেমন একটা ধাক্কা খেলে তাঁর সাব-জীবনের কর্মক্ষেত্রে তিনি আর যেতে পারেন নাই।

১৯৭৭ সালের পূর্বে থেকে অত্যাধিকার তিনি নানা গঠনমূলক কাজে ও সংগঠনের কাজে লিপ্ত আছেন।

সরযুবালা সেন

(ভোলা শহরের)



বাংলা ১৩০০ সালের ২২শে ফাল্গুন সরযুবালা সেন জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা-বিক্রমপুরের পূর্ব সিমুলিয়া গ্রামের চন্দ্রকান্ত গুপ্ত তাঁর পিতা এবং মৃন্ময়ী গুপ্তা তাঁর মাতা।

বাংলা ১৩১২ সালে বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের চুনিলাল সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কর্ম উপলক্ষ্যে এই পরিবার বরিশাল জেলার ভোলা শহরে বসবাস করতে থাকেন। পরে ভোলাই হয় তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে চুনিলাল সেন যোগদান করেন। আন্দোলনে যোগদানের ফলে সরযুবালা সেনের স্বামীর কালীকুমার সেনের সরকারী কাজের কন্ট্রাক্ট বন্ধ হয়ে যায়। অতিকষ্টে সংসার চলতে থাকে। পরে চুনিলালবাবু ভোলাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন, তাতে কিছুটা সচ্ছলতা আসে।

১৯১৮ সাল থেকে বহুদিন অবধি সরযুবালা সেন মহকুমা সরোজনলিনী নারীমন্ডল সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। সেবার কাজেই তিনি অধিক আনন্দ পেতেন। তাঁর সেবায় জাতি-ধর্মের প্রস্নই ছিল না। তাই ভোলার হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধাই তিনি আকর্ষণ করেছেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অংশগ্রহণ করেন। একদিন নেতা শবৎ ঘোষ যখন অর্থের আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সবুয়ালা সেন একে একে তাঁর সকল স্বর্ণাভরণ খুলে দিবে এলেন। আব কেউ কখনো তাঁকে অলঙ্কার ব্যবহার কবতে দেখেনি।

১৯৩০ সালে তাঁর স্বামী ছিলেন মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি এবং তিনি নিজে তাঁর প্রধান সহায়িকা। স্থানীয় কংগ্রেস স্থির কবেন যে, ভোলাতে লবণ তৈরী ক'বে আইন ভঙ্গ করা হবে। পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এঁদের বাড়ীর প্রতি। শত শত কর্মী এ-বাড়ীতে তখন আসা-যাওয়া কবেন। সংযোগমতো পুলিশ গ্রেপ্তার কবতে থাকে যাকে ইচ্ছা তাকে। পুলিশ এ বাড়ীর নাম দিল 'আনন্দমঠ'।

একদিন স্থানীয় সবকাবা বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কাছে সবুয়ালা সেনের নিন্দা করা হয়। প্রতিবাদে ছাত্রীদের কবেকজন অভিভাবক ঐ বিদ্যালয়ে কতাদের পাঠানো বন্ধ কবলেন। তখন প্রধানতঃ সবুয়ালা সেনের উত্তোকে স্থাপিত হয় 'বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়'। সেখান থেকে মেয়েবা পাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে থাকে।

১৯৩০ সালে তিনি গঠনমূলক সেবাকাজে আত্মনিয়োগ কবেন। তৎক্ষণে স্বাবলম্বী কববার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা কবেন 'কর্মকুটিব' নামে শিল্প প্রতিষ্ঠান। হুদুব গ্রাম থেকে আসা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াশুনার স্ববিধার জন্য প্রতিষ্ঠা কবেন তিনি স্বল্পব্যয়ের ছাত্রাবাস। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অববাসীবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেন। আন্দোলন পরিচালনা কবেছিলেন সবুয়ালা সেন নিজেই। তাঁর স্বামী ও পুত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবার ফলে কাবাগারে বন্দী হন। সবুয়ালা সেনকে করা হয় স্বকৃত্ত অস্ত্রবীণ। অস্ত্রবীণ অবস্থায়ও তিনি নির্দেশ দিয়ে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা কবেন চাবিদিকেব হিংসার উত্তেজনার মধ্যেও।

পঞ্চাশের মধ্যস্তব। না খেতে পেয়ে মাছের পথে পথে মবছে, মাখের বুকে শিশু, শিশু কোলে মা। চুনিলাল সেন এবং সবুয়ালা সেন দুজনেই তখন মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা ৩৫৩৬টি নারী এবং ১৪৩টি শিশুকে 'কর্মকুটিব' তুলে নিলেন এবং যথেষ্ট সঙ্কে লড়াই ক'বে সেবা কবতে লাগলেন। হাসপাতালও একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৭টি নারী এবং ২৮টি শিশুকে বাঁচানো গেলনা। ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের চাঁদাই তাঁদের সম্বল ছিল। অবশেষে 'শিশুবন্ধা

সরযুবালা সেন (ভোলা শহরের)

করো' সমিতির বাংলা-শাখার সম্পাদিকা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু শিশুদের ভার নেন। 'কর্মকুটির'-এর সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'শিশুসদন'। সেখানে স্থাপিত হয় শিশুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়। 'কর্মকুটির'ও তখন বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পর সরযুবালা সেন এবং তাঁর স্বামী প্রথমে দেশত্যাগ করতে বাজী ছিলেন না। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে যেতে থাকে। 'শিশুসদন'-এর মুসলমান শিশুদের স্থান হ'ল 'ঢাকা সলিমুল্লা অন্-ফ্যানেজ'-এ। অল্প শিশুদের ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু নিয়ে গেলেন কলিকাতার উপকণ্ঠে 'ঠাকুরপুকুর শিশুসদন'-এ। একান্ত অসহায় নাবীদের নিধে সরযুবালা সেন চলে যান মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রামের রাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের জমি ও অর্থসাহায্যে তিনি ঝাড়গ্রামে আবার 'কর্মকুটির' স্থাপন করেন।

এই 'কর্মকুটিবে' বর্তমানে শিল্পবিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, খাদিকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ পরিচালিত করছেন সরযুবালা সেন। আজ পবিত্র বয়সেও তরুণব উৎসাহ নিয়ে তিনি নিরলস কাজ ক'রে চলেছেন। অবস্থা-বিপর্যয় তাঁকে নিরুত্তম কবতে পারেনি।



ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা

★

বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে ঘোষ দস্তিদার পরিবারে ১৯০৫ সালে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পৈতৃক দেশও সেখানেই। তাঁর পিতা রজনীনাত্ ঘোষ ও মাতা বসন্তকুমারী ঘোষ।

১৯১৬ সালে বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামের কেদারনাথ গুহঠাকুরতাব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর দাদা রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন বরিশাল শঙ্করমঠের কর্মী; এটি ছিল যুগান্তর-দলের বিপ্লবী কর্মীদের একটা ঘাঁটি। সেখান থেকে নৈতিক জীবনের আদর্শে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত বরিশালে। ইন্দুমতী গুহঠাকুরতার দাদার বন্ধু মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, জিতেন কুশারী প্রভৃতি তাঁদের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করতেন। তাঁদের রাজনৈতিক আলোচনা ইন্দুমতী দেবীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। বরিশালের নেতা শরৎ ঘোষ তাঁর হৃদয়ে দেশসেবায় আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। স্বরেশচন্দ্র গুপ্ত ও মুকুন্দ দাসও তাঁকে দেশসেবায় অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের কয়েকজন মহিলা এবং তাঁর মা ও বৌদির সঙ্গে ইন্দুমতী দেবীও চরকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন।

ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা

১২২৬ সালে তিনি বানরিপাড়া গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেসনেতা কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তাঁর প্রেরণায় তিনি প্রকাশ্য কর্মের পথে অগ্রসর হন। এই কাজে তাঁর স্বামীর বিশেষ কোনো আপত্তি না থাকলেও, তাঁকে কুলবধু হিসাবে তিক্ত সমালোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। কিছুদিনের মধ্যে আবে। তিনটি গ্রাম্য-মহিলা তাঁর সহকর্মী হন, তাঁরা হচ্ছেন—সবয়ুবালা সেন, লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা ও যোগমায়া দত্ত।

১২২৯ সালে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা ও আবে। কয়েকজন মিলে বানবিপাড়া' একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন ও তাঁত প্রভৃতি শিল্পকাজ আবিস্ত কবেন। বোগীদেব সেবা কাজ ও তাঁরা কিছু কিছু কবতে থাকেন।

১২৩০ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যভাবে যোগদান কবেন। তাকে স্থানীয় কংগ্রেসেব ডিস্ট্রিক্টাব ক'বে দিয়ে পুরুষ-কমিগণ গ্রেপ্তার হন। তিনি বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি পবিচালনা কবতে থাকেন। ১২৩০ সালে ববিশালে কোনো মহিলাকে গ্রেপ্তার কবা হয় নাই।

১২৩১ সালে স্থানীয় কংগ্রেসেব নিদেশে বিলাতী কাপড বিক্রি বন্ধ কববার জ্ঞা ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা এং সবয়ুবালা সেন সাতদিন সাতবার্ত্রি বানবিপাড়া বাজাবেব মধ্যে অনশন ক'বে প'ড়ে থাকেন। ফলে চাবিদিকেব হাটবাজার প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। তখন মনে হচ্ছিল যেন ঐ অঞ্চলে বৃটিশ রাজহেব অবসান ঘটেছে। দোকানদারগণ কংগ্রেসেব সঙ্গে আপোষ মীমাংসা ক'বে বিলাতী কাপড বিক্রি বন্ধ করতে রাজী হয়। তারপব তাঁরা অনশন ভঙ্গ কবেন।

১২৩২ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা অংশগ্রহণ ক'রে তিনমাস কাবাদণ্ড ভোগ কবেন। তারপব আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইমাস স্বগৃহে অন্তবীণ থাকেন। পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১২৩৪ সালে তিনি নিজ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে একটি হরিজন বিদ্যালয় স্থাপন কবেন। ১২৩৮ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস অন্তমত পল্লীর নিকটে বিদ্যালয় স্থাপনের জ্ঞা কিছু জমি দান করেন। ঐ জমিতে সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদেব সাহায্যে ও চাঁদাষ ইন্দুমতী দেবী বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করান। সেখানেই তিনি বিদ্যালয় ও কংগ্রেসের কাজ পূর্ণ উচ্চমে করতে থাকেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৯৩৫ সালে তাঁর স্বামী মৃত্যু হয়। কাজের সুবিধার জন্ত এবং কর্মীদের থাকবার একটা স্থান রাখার জন্ত ১৯৩৯ সালে তিনি তাঁর পুত্রকন্যা ও কয়েকজন মহিলা-কর্মী সহ ওই প্রতিষ্ঠানেই বসবাস করতে থাকেন।

১৯৩৯ সালে ঢাকার আশালতা সেনের সহকর্মী হয়ে মহিলা-সংগঠনের কাজে তিনি উত্তরবঙ্গের বহু স্থান ভ্রমণ করেন।

ভোলার সবযুবালা সেনের আস্থানে তিনি সেখানকার কর্মক্ষেত্রের সহায়তা-কল্পে অনেকবার ভোলা যান। ১৯৪০ সালে ভোলা থেকেই তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হন; দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে।

১৯৪১ সালে তিনি স্বর্গীয় নেতা মনোবঞ্জন গুহঠাকুরতার নামে ঐ প্রতিষ্ঠান-বাড়ীতে ‘মনোবঞ্জন শিল্পসদন’ স্থাপন করেন। সেখানে তাঁত, চরকা ও বিভিন্ন শিল্পকার্য পরিচালিত হ’ত। রোগীদেব সেবার জন্ত একটি বিভাগও ছিল। এই সময় প্রতিষ্ঠান-বাড়ীতে স্থায়ীভাবে ১২ জন মহিলা ও পুরুষ কর্মী থাকতেন। তাঁরা গঠনমূলক কাজ ও কংগ্রেসের কাজ করতেন। এটি কংগ্রেসের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। ‘মনোরঞ্জন শিল্পসদন’ প্রতিষ্ঠা-দিবসে গান্ধীজী তাঁর বাণীতে জানিয়েছিলেন—“ইন্দুমাতা, তোমার কর্মজীবন যেন পল্লীগ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকে। তোমার কর্মপ্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।”

১৯৪২ সালের আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা তিনজন মহিলা-কর্মী সহ গ্রেপ্তার হন। প্রতিষ্ঠানের পুরুষ-কর্মীরাও সকলেই গ্রেপ্তার হন। প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

দশমাস কাবাদও ভোগ করার পর ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা ও যোগমায়া দত্তকে স্বগৃহে অন্তর্বিণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা মুক্তি পান।

অন্তরীণ থাকার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্ত রিলিফের কাজ পরিচালনা করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর কন্যা শান্তিরাগী ঘোষকে দিয়ে পাশের গ্রাম আদালিয়ায় একটি ‘কস্তুরবা কেন্দ্র’ স্থাপন করেন।

১৯৫০ সালে তাঁকে কর্মভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণ ক’রে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়।

সুরেন্দ্রবালা রায়



১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে সুরেন্দ্রবালা বায় জন্মগ্রহণ করেন পূর্ণিমা জেলাব দিল্লী-দেওবানগঞ্জে মামাবাড়ীতে। তাঁর পৈতৃকভূমি মালদহের হবিষচন্দ্রপুরে। তাঁর পিতা মোহিনীমোহন মিশ্র ও মাতা জগৎমোহিনী দেবী।

এগারো বছর বয়সে দিনাজপুর জেলাব পত্নীতলা থানাব সিংহলি গ্রামের দ্ব্যতিথব রায়েব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা ঐ গ্রামেই বসবাস করতেন।

তাঁর স্বামী ছিলেন একজন একাগ্রচিত্ত কংগ্রেস-কর্মী। তাঁর নিকট থেকেই সুরেন্দ্রবালা বায় পেয়েছিলেন দেশসেবাব প্রথম প্রেবণা। তাঁরপব পত্নীতলা থানাব প্রধান কংগ্রেসকর্মী অবিনাশচন্দ্র বসুব প্রভাবে তিনি এবং তাঁদের বাড়ীব সকলেই প্রভাবান্বিত হন এবং দেশসেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। হিজলীব বাজবন্দীদেব উপব গুলী-চালনার পব সুরেন্দ্রবালা বায় গৃহের অন্তবালের পদা ছেড়ে দিয়ে সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দেশ সেবায় ডুবিয়ে দেন।

১৯০২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে তাঁদেব পরিবারেব সকলেই অংশ-গ্রহণ করেন। তাঁদের বাড়ীটা ছিল আন্দোলন-পরিচালনার একটা কেন্দ্র। এই আন্দোলনে যোগদান কবাব ফলে তিনি এবং তাঁর স্বামী, দেওব, ভাণ্ডর ও ভাণ্ডবপো সকলেই গ্রেপ্তার হন এবং কারারুদ্ধ হন। বহু ক্লমক-পরিবারের ও মধ্যবিত্ত পরিবারেব মেয়েবা তখন দলে দলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

সুরেন্দ্রবালা রায় একবছর সশ্রম কাবাদেও দণ্ডিত হন। জেলে তাঁকে তৃতীয়-শ্রেণীভুক্ত ক'রে রাখা হয়। কিন্তু জমিদারবাড়ীর কচ্ছা ও ধনীরা সংসারের বধু হয়েও তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কঠিন জীবন সানন্দে ও হাসিমুখে বরণ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য প্ঠাবাপ থাকাতে তাঁকে দ্বিতীয়-শ্রেণীভুক্ত হবার জন্ত আবেদন করতে অছুবোধ করা হয়। কিন্তু ইংরেজের অছুগ্রহ পাবার জন্ত আবেদন করতে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁকে দিনাজপুর জেল, রংপুর জেল ও শহরমপুর জেলে বন্দী ক'রে রাখা হয়। মুক্তি পান তিনি ১৯০৩ সালে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মুক্তির পব তিনি পতিপুত্রসহ পিত্রালয় মালদহ জেলার ভালুকা গ্রামে চলে আসেন। সেখানেই তাঁরা বসতবাড়ী স্থাপন করেন। তাঁর ভাইরা, বিশেষতঃ সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র তাঁকে দেশসেবার কাজে সর্বপ্রকার সহায়তা কবেন। পিত্রালয়ের সকলেই কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন।

স্বরেন্দ্রবালা রায় এই সময় লাবণ্যালতা চন্দের সহযোগিতায় মালদহে একটি ‘কংগ্রেস মহিলা সংঘ’ গঠন করেন এবং মেয়েদের সচেতন করবার কাজ করতে থাকেন। সংঘের পক্ষ থেকে একটি গ্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়। তা ছাড়া তিনি মেয়েদের নিয়ে খন্দর-বিক্রি ও চরকা-কাটা প্রভৃতি গঠন-মূলক কাজ করতে থাকেন।

স্বরেন্দ্রবালা রায় তাঁর স্বামী-পুত্র নিয়ে স্বাধীনভাবে পার-ভালুকাঘ নিজের বাড়ীতে থেকে মালদহের কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালিত করতেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে পুনবাঘ এই পবিবারের প্রত্যেকে এবং তাঁর ভাই সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র যোগদান করেন। তাঁদের বাড়ীটাই ১৯৪২ সালের আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

প্রায় সকল পুরুষ-কর্মীদের সেইসময় বন্দী ক’রে জেলে নিয়ে যাওয়াতে মালদহের কংগ্রেসনেত্রী স্বরেন্দ্রবালা রায় ঐ স্থান থেকেই মালদহেব আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন।

স্বাধীনতা আসার পর দেখা গেল মালদহ জেলার দশটা থানা পড়েছে হিন্দুস্থানে এবং পাঁচটা থানা রইল পাকিস্তানে। দ্বিখণ্ডিত মালদহের দুই অংশে দুই জাতীয় পতাকা উডতে দেখে তাঁর হৃদয় যেন দুই টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে নিলেন।

সুশীলা মিত্র

★



১৮৯৩ সালেব ফাল্গুন মাসে সুশীলা মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রিপুরা জেলাব আশিকারি গ্রামে। তাঁর পিতা গুরুচরণ ঘোষ ও মাতা সবলাবালা ঘোষ। ‘ত্রিপুরা হিতসাহিনী সভা’ মেম্বের তখন লেখাপড়া শিক্ষায় উৎসাহ দিত। তিনি পঞ্চম মান পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

নোয়াখালি জেলার গাবুয়া গ্রামের কুমুদিনীকান্ত মিত্রের সঙ্গে সুশীলা ঘোষের বিবাহ হয়। সাংসারিক নানা দুর্ভোগের সময় তাঁরা নোয়াখালি শহরে চলে যান। এখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক’রে তাঁরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। বাইবের জগতেব সঙ্গে মিশবার ফলে তাঁর মনে জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত কিছু একটা করবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

১৯১৪-১৫ সালের ভারত-জার্মান বড়যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের একটি গোপন আড্ডা ছিল তাঁদের পর্বকুটরে। তাঁর দেবর সত্যেন বসু ও শচীন বসু যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। তাঁদের দেওয়া নিষিদ্ধ জিনিসপত্র সুশীলা মিত্র লুকিয়ে রাখতেন এবং সর্বপ্রকারে তাঁদের সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা সুশীলা মিত্রকে প্রেরণা দিত।

নোয়াখালিতে তখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না; অশিক্ষিত দাইয়ের

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

হাতে প্রস্রুতি ও শিশুমৃত্যু ঘটত অহরহ। একদিন কলিকাতার 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' থেকে নোয়াখালিতে একজন ভদ্রলোক ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন দেখাতে যান। তার পরদিনই স্ত্রীলা মিত্র এবং তাঁব কয়েকজন বন্ধু মিলে তাঁর সঙ্গে সমিতি গঠন করা সম্বন্ধে আলোচনার পর্ব 'নোয়াখালি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' গঠন করেন; স্ত্রীলা মিত্র সম্পাদিকা, কুসুমকুমারী সেন সভানেত্রী এবং হিরণবালা মিত্র সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। এখানে সেলাই, তাত, ধাত্রীবিজ্ঞা ও লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং লাঠি-ছোরা খেলার শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। তা ছাড়া ছিল শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিভাগ। স্ত্রীলা মিত্র নিজেও ধাত্রীবিজ্ঞা শিক্ষা করেন। ডাক্তার কিরণ ঘোষ এম.বি. ধাত্রী-বিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন। পাস করার পর প্রত্যেককে ওষুধপত্র সহ একটি ক'রে বাক্স দেওয়া হ'ত। ২১ জন মহিলা এখান হ'তে ধাত্রীবিজ্ঞা পাস করেন এবং স্বাবলম্বী হন। তা ছাড়া তাঁত, সেলাই ও কুটিয়শিল্প শিক্ষালাভ ক'বে অনেক মেয়ে এখান থেকে নিজেদের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হন। সমিতি ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তার ৫টি শাখা ঐ শহরেই খোলা হয়। স্ত্রীলা মিত্র প্রায় ১০।১২ বছর সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনেব যুগে কংগ্রেস সর্বত্র শক্তিশালী হয়ে দানা বেঁধে উঠেছিল। সেসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাসন্তী দেবী, সুনীতি দেবী ও উমা দেবী নোয়াখালি যান। দেশবন্ধুর আস্থানে নোয়াখালির সাধারণ মেয়েবা অনেক শেষসম্বল গহনাটুকু পয়স্তু দান ক'রে দিয়েছেন। নোয়াখালির মেয়েরা কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্ত্রীলা মিত্র, কমলকুমারী ঘোষ, জ্যোতি দেবী, শশীমুখী গুহ রায়, চাক্রালা কাজিলাল, কিরণপ্রভা চৌধুরী ও হিরণবালা মিত্র প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রথম মহিলা-সভ্য হয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে সংগঠিত মহিলাগণ লবণ আইন অমান্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা বে-আইনী লবণ তৈরী ও পিকেটিং করতে থাকেন। এই সময়ে স্ত্রীলা মিত্র ও অন্যান্য কর্মিগণ বিপ্লবীদেরও গোপনে সাহায্য করতেন। তাঁরা বিপ্লবীদের গোপনে সংবাদ সবুবরাহ এবং অর্থসাহায্য করতেন। চাক্রালা কাজিলাল তাঁর গহনা বিক্রি ক'রে বিপ্লবীদের দশখানা সাইকেল কিনতে সাহায্য করেন। স্ত্রীলা মিত্র রাজে পলাতক বিপ্লবীদের নিজের ছেলেদের সাথে এক-বিছানায় শোয়াতেন। বিপ্লবীরা শিকার-বেলা আশানে

তথবা অন্ত্র চলে যেতেন। আবার গভীর বাতে সুশীলা মিত্রই মক্লেব অগোচরে তাঁদের ভাত খাওয়াতেন।

১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনেও এই মহিলাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারি সুশীলা মিত্র সবকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তাৎপৰ্য্য শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সুশীলা মিত্র গ্রেপ্তার হন। সেদিনই জ্যোতি দেবী, শ্রীমুখী গুহ বায়, কবিশ্রী চৌধুরী এবং কমলকুমারী ঘোষ ও গুপ্তা হন।

সুশীলা মিত্রকে বলা হয়, এগু লিখে দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। আরো বলা হয়, তাব আড়াই মাস, তিন বছর ও পাঁচ বছর বয়সেব সন্তানবা তাব সঙ্গে জেলে গেলে বাঁচবে না। সুশীলা মিত্র জবাবে বলেছিলেন, “দেশেব হাজাৰ সন্তানের সঙ্গে আমার সন্তানবাও যদি এলি বাব তদে আমি গোবব বোধ কবব, চোখেব জল ফেলব না।” তাঁব প্রতি ছবমাস কাবাদেওব আদেশ হয়। তিনি কুমিল্লা ও বহুবমপুৰ জেলে বন্দীজীবন কাটাবাব পৰ ১৯৩৩ সালে মুক্তি পান।

তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ছাত্র ও কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধা করে তিনি সংগঠন করতেন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সুশীলা মিত্র ও তাব সঙ্গিগণ অক্লান্তভাবে রিলিফের কাজ করেন। তাঁদের সমিতি কর্তৃক পরিচালিত একটি নাবী-দুঃস্থাস্রম তাঁদের গ্রামেব বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫০ জন নাবী ও ১৫টি শিশুর ভাব তাঁবা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রাণে বাঁচিয়ে স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেন। তাবা তাঁত বুনত, চাটাই বুনত, পাটের দড়ি, বেতেব কাজ ও মাছ ধরবাব জাল তৈরী করত।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গাব পর তাঁবা দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে গিয়ে সাহস দিতেন, অসহায়দের সংগ্রহ করে বিলিফ-ক্যাম্পে পাঠাতেন। চৌমুহনী বিলিফ-ক্যাম্পে তাঁবা দাঙ্গাবিক্ষস্ত অঞ্চলেব মেয়ে ও শিশুদের তত্ত্বাবধান করতেন।

১৯৪৮ সালে সুশীলা মিত্র কলিকাতায় চলে আসেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতায় এন্টালীতে ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র প্রেসিডেন্ট।

সেই যুগে সুশীলা মিত্র ছিলেন নোয়াখালির নারী-জাগরণের অন্ততম উৎস।

দৌলতম্লেছা খাতুন



দৌলতম্লেছা খাতুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৮ সালের জুন মাসে বগুড়া জেলার সোনা তলা নামক গ্রামে। তাঁর পৈতৃক বাড়ী যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমাতে। তাঁর পিতা মহম্মদ ইয়াসীন ও মাতা নুরুন্নেসা খাতুন।

নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতম্লেছার মাত্র আটবছর বয়সে বগুড়ার ডাঃ হাফিজুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ হয়।

তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সেইসময়ে স্ত্রীশিক্ষার খুব বিরোধী ছিলেন। তবুও দৌলতম্লেছার পিতামাতা তাঁর লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তারপর তাঁকে স্বত্তরবাড়ী যেতে হয়। তাঁর স্বামী গাইবান্ধার ডাক্তার ছিলেন। লেখাপড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ থাকাতে তিনি সেখানেই বাড়ীতে বসে লেখাপড়া করতে থাকেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সভা ও শোভাযাত্রায় দৌলতম্লেছা যোগদান করেন। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় দৌলতম্লেছা খাতুন ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে 'গাইবান্ধা মহিলা-সমিতি' গঠন করেন। যদিও বয়স তখন তাঁর মাত্র ১৪ বৎসর, দায়িত্বজ্ঞানে ও কর্মভার-গ্রহণে তিনি পরিণত বয়সের পরিচয় দিতেন। সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন তিনি নিজে, সভানেত্রী ছিলেন মহামায়া ভট্টাচার্য এবং সহ-সভানেত্রী দক্ষবালা দাস।

‘এই সমিতি সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচারকার্য ইত্যাদি পূর্ণোচ্চমে করতে থাকে। আশেপাশের ৭৮টি গ্রামের মহিলাগণও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বামুনডাঙা, স্বরতখালি, নলডাঙা, বিজয়ডাঙা, ফুলছড়ি, কুপতলা, তুলসীঘাট প্রভৃতি গ্রামে তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান দলে দলে দৌলতম্লেছার বক্তৃতা শুনতে আসতেন। ঘোর পর্দীনসীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাতে আবার অত ছোট, তাই সভা লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। দৌলতম্লেছা খাতুন প্রাণের আবেগে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করতেন।

দৌলতম্লেছা খাতুন

কিছুদিন পবে তাঁব স্বামীকে গাইবান্ধাব বাইবে বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁদেব গাইবান্ধাব বাড়ীও বাজেয়াপ্ত কবা হয়। তাঁব স্বামীব অন্তঃপন্থিতিতে যেদিন পুলিস এসে তাঁদেব লাড়ী বাজেয়াপ্ত কবে সেদিন একটি দেববকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে শহবেব বাজপথে এসে দাঁড়াতে হয়। একজন বিশিষ্ট ৩৮লোক সময়ে তাঁবে তাঁব পৰিবারে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন।

সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও নিষাভন হাসিমুখে স্বৰণ ক'বে নিয়ে দৌলতম্লেছা আন্দোলন পৰিচালনা ক'বে যান। অবশেষে পুলিস ফুলছড়ি গ্রাম থেকে তাকে, মহামায়া ভট্টাচাৰ্যকে এবং প্রতিভা স্বৰকারকে গ্ৰেপ্তার ক'বে কাবাদগে দণ্ডিত কৰে। দৌলতম্লেছা খাতুন বাজসাহী, প্ৰেসিডেন্সি ও বহবমপুৰ জেলে বন্দী ছিলেন।

এই সময় দৌলতম্লেছাব আত্মীয়া ৭ সমবয়সী জিবাউননাতাব বৰিনা খাতুন এবং সামন্তননাতাব দৌকেবা খাতুন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্ৰহণ কৰেন। কিন্তু তাঁদেব গ্ৰেপ্তার কবা হব নাই।

মুক্তিব পব দৌলতম্লেছা খাতুন দেখলেন আন্দোলন মন্দীভূত। তিনি পডাশুনায মন দিলেন। ঘৰে বসে পডাশুনা ক'বে তিনি বিএ. পযন্ত পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন। নানা প্ৰবন্ধ ও গল্প লিখে তিনি তাঁব সাহিত্যকৰিব পৰিচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমিতিব কাজও কবতেন।

১৯৭৩ সালেব ভয়াবহ দুৰ্ভিক্ষেব সময় তিনি অনাথ শিশু ও বালক-বালিকাদেব জন্তু একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন কৰেন এবং সমাজসেবামূলক কাজে প্ৰবৃত্ত হন।

বৰ্তমানে তিনি স্বামী-পুত্ৰেব সঙ্গে পাকিস্তানে টাকায বসবাস কবছেন এবং নানাকৰ্প গঠনমূলক কাজেব মধ্য দিয়ে দেশসেবায নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পূৰ্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা-পৰিষদেব সদস্য নিৰ্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে পূৰ্ব-পাকিস্তান থেকে চীনে প্ৰেৰিত ডেলিগেশনেব অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে তিনি চীন পৰিভ্ৰমণ ক'রে এসেছেন।

স্বলেখিকা, স্ববক্তা এবং সমাজসেবিকাকৰ্পে তিনি এখন পূৰ্ব-পাকিস্তানে পৰিচিত।

স্নেহশীলা চৌধুরী



খুলনা জেলাব পাড়ুলি গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮৬ সালে স্নেহশীলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিত্রালয় যশোহরের পাজিবা গ্রামে। তাঁর পিতা যোগেন্দ্রনাথ বসু ও মাতা বাজলক্ষ্মী দেবী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বসু তাঁর মামাতো ভাই।

খুলনা জেলাব সাহন গ্রামের ললিতমোহন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় বারোবছর বয়সে। স্বামীর প্রেবণা ও উদ্বোধনে তিনি দেশসেবার কাজে অগ্রসর হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিকল্পে আন্দোলনের সময় স্বামীর উৎসাহে তিনিও বিলাতী দ্রব্য বর্জন করেন। সভা-সমিতি আহ্বান করতে এবং বক্তৃতা দিতে স্বামীই তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মেবেদেব বিলিতি কাচের চুড়ি ভেঙে শাঁখা পবিয়ে দিতেন, বিলিতি জিনিস বর্জন করতে শেখাতেন। কোথাও বস্ত্র বা ভূভিক্ষ হ'লে সাহায্য সংগ্রহ ক'বে পাঠিয়ে দিতেন। দর্বিভ্রমের পিতৃমাতৃশ্রদ্ধা, কন্যার বিবাহ, পাঠ্যপুস্তক ও বেতনের অর্থ তিনি সবদাই সংগ্রহ ক'বে দান করতেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ হবে ওঠে।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর আত্মীয় অনেকে আদালত বর্জন করেন। স্নেহশীলা চৌধুরী তখন সভা-সমিতি আহ্বান ক'বে সবক'ব-বিরোধী প্রচাবে প্রবৃত্ত হন। স্বামীর প্রেবণায় যেমন তিনি দেশের কাজে আত্মনিবেগ করেন, তেমনি স্বামীর চেষ্টায় ও যত্নে তিনি স্নেহলেখিকা হন। ১৯২৮ সালে তাঁর স্বামী পরলোকগমন করেন।

১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্ত আন্দোলন আবিস্ত হয়, খুলনা শহরে স্নেহশীলা চৌধুরী, শৈবলিনী দেবী, সবলাবালা বায়, সুরবালা বায়, বসন্তকুমারী পৈ, মেঘা পৈ, নীহার পৈ, উষাবাগী দেবী, উষারাগী দাস, কবিরবালা দেবী, সুরাবাগী হুই, অমিয়া মিত্র, বেণুকা ঘোষ, রাণী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ দলে দলে পিকেটিং ও শোভাযাত্রা করতে থাকেন। একদিন শোভাযাত্রা করার সময় শৈবলিনী দেবী পুলিশের লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিন্তু শোভাযাত্রা দমন করা যায় নাই। পূর্ণ উত্তরে দিনের পর দিন তাঁরা আন্দোলন

স্নেহশীলা চৌধুরী

পরিচালনা ক'বে যান। খুলনা জেলাব বাগেরহাটের আন্দোলনে নেতৃত্ব ক'বে কারাবরণ কবেন লীলাবতী দেবী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী প্রভৃতি।

স্নেহশীলা চৌধুরী আন্দোলন পরিচালনা করতেন পল্লী অঞ্চলে আজুগড়, শীফলতলা, পয়গ্রাম, ফুলতলা, মহেশ্বরপাশা, পাশিশপুং ইত্যাদি গ্রামেও।

সেসময়ে 'মহিলা সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়, এর সম্পাদিকা, ছিলেন সবলাপালা বায় এবং সভানেত্রী শৈবলিনী দেবী।

১৯৩১ সালে স্নেহশীলা চৌধুরী একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন গান্ধীজীব আদর্শে। এখানে হবিজনদেবও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাবা প্রতি লাভ কবত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায় এবং পবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেব সভানেত্রী স্ত্রাবণ্যপ্রভা দত্ত এই বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য কবেন।

১৯৩২ সালেব আইন অমান্ত আন্দোলনেব সময় স্নেহশীলা চৌধুরী পুনর্বার আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবেন। তিনি তখন খুলনা জেলা কংগ্রেসেব ডিস্ট্রিক্টাব ছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজারে গিয়ে বক্তৃতা দিতেন। এই সময়ে বাজব্রোহ্মলক বক্তৃতা দেওয়াতে তাঁব ছবমাস বাবাদও হব।

মুক্তিব পবে তিনি ঐ স্কুলেব জন্ত অর্থ সংগ্রহ ক'বে একটি বাড়ী নির্মাণ কবান এবং স্কুলেব নাম দেন 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়'। স্কুলে চবকা ও কুটিব-শিল্প শিক্ষাব ব্যবস্থা কবা হয়।

ভাবত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবাব পর তাঁব নিজ-হাতে-গড়া সার্বজনীন বিদ্যালয়েব অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যখন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তখনো পতনোন্মুখ বিদ্যালয়কে অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বহুকষ্টে স্থবক্ষিত বেখেছিলেন। কিন্তু পবে তিনি তাঁব সার্বজনীন কৰ্মস্থল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসাতে তাঁর কৰ্মজীবনেব অবসান ঘটেছে।



সুরমা মুখোপাধ্যায়



১৮৮৭ সালের ১লা শ্রাবণ সুরমা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়।
তাব পিতা সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ঈশানী দেবী।

বৰ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার কালিকাপুর গ্রামের গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অল্পবয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা কাটোয়াতে বসবাস
করতেন। তিনি স্বামীকে নিকট থেকে দেশসেবার প্রেরণা পান।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সুরমা দেবী চরকা
কাটতেন ও খন্ডক ব্যবহার করতেন। ‘কাটোয়া মহকুমা মহিলা বাস্তবিক সমিতি’
গঠিত হবার পূর্বে তিনি তার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের
আন্দোলনে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের নিয়ে
তিনি পিকেটিং করতেন, সভা-সমিতি আহ্বান করতেন ও বে-আইনী লবণ
জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করতেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনেও তিনি
কাটোয়ার মহিলাদের নিয়ে পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। ১৯৪৪
খাবা ভিক্ষা করার অপবাধে তাঁর দুইবাবো ছয়মাস ক’বে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড
হয়। তিনি বর্ধমান জেলে ও বহুবন্দুর জেলে বন্দীজীবন যাপন করেন।
আজীবন তিনি দেশের সেবা ক’বে গেছেন।

স্বরমা মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুঃস্থদের সেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা বিস্মৃত হবার নয়। বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার নারী-জাগরণে স্বরমা দেবীর অবদান অনেকখানি।

১৯৪৬ সালের ১৬ই নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

নরেশনন্দিনী দত্ত



শ্রীহট্ট জেলাৰ অন্তৰ্গত হৰিনগৰ পৰগনাব এক বিখ্যাত পৰিবাৰে ১৯০২ সালেৰ ডিচেম্বৰ মাস নৰেশনন্দিনী দত্ত জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তাৰ পিতা ঈশাচন্দ্ৰ গুপ্ত ও মাতা নিত্যমণী গুপ্ত।

অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তাৰপৰ ১৯৩১ সালেৰ ৩ মে ডিচেম্বৰ তাৰ অষ্টমবৰ্ষীৰ একমাত্র পুত্ৰকে মাতুলালৰে বেখে তিনি 'শ্রীহট্ট মহিলা ন্যয যোগদান' কৰেন। তদৰ্বাৰ ১৯৩৫ সাল পৰ্যন্ত এই মহিলা ন্যয কৰ্মীৰূপে তিনি গান্ধীজী-প্ৰবৰ্তিত প্ৰতিটি আন্দোলনে যোগদান ক'ৰে পাঁচবাৰ কাৰাবন্দন কৰেন। শুধু তাই নথ, গঠনমূলক ও সমাজহিতকৰ কাজে তাৰ বিধান ও নীৰৱ কৰ্মসাধনা শ্রীহট্টেৰ মহিলাদেৱ কৰ্মে ও ত্যাগে অল্পপ্ৰাণিত কৰত।

তিনি ১৯৩২ সালেৰ আইন অমান্ত আন্দোলনে ছুইবাৰ কাৰাগাৰে প্ৰেৰিত হন। কাৰাগাৰ তাকে ৩৬ দেখাতে পাবেনি। ১৯৩১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহে যোগদান ক'ৰে আৰাব তিনি কাৰাগৃহে প্ৰবেশ কৰেন। ১৯৪২ সালে 'ভাৰত ছাড' আন্দোলন পৰিচালনা কৰতে কৰতে পুনৰাব কাৰাদণ্ড মাথাৰ নিষে সেই কাৰাগ্ৰাচীৰেৰ অন্তৰালেই তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। নিৰাপত্তা বন্দীৰূপে বাজ-অতিথি হ'বে বইলেন তিনি শ্রীহট্ট জেলে পঞ্চমবাবে। জেলখানা তাৰ হাসিমুখকে আৰো উজ্জল ক'ৰে তুলেছিল।

নোখাখালিৰ দাঙ্গাৰ পৰ উক্ত অঞ্চলে প্ৰাৰ চাববছৰ পৰ্যন্ত দুঃস্থেৰ সেবাধ তিনি নিজেকে ডুবিযে বেখেছিলেন।

বৰ্তমানে তিনি আংশিকভাবে ভুদান-যজ্ঞেৰ কাজে ও অভৱ আশ্ৰমেৰ গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত আছেন।

যমুনা ঘোষ

★



যমুনা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলাব বিক্রমপুরের মালিকান্দা গ্রামে। প্রখ্যাত নেতা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ছোট ভগ্নী তিনি। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও মাতা বাণাপাণি দেবী। শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন।

১৯২১ সালে গান্ধীজীব আত্মানে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন টাঁকশালের উচ্চপদেব সবকাবী চাকরি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন তখনই তিনি সাত-আট বছর বয়সেব ভগ্নী যমুনাকে কলিকাতা নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে চলে যান। সেখানেই যমুনা মানুষ হ'তে থাকেন।

১৯২৯ সালে তিনি চলে আসেন কুমিল্লা নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে।

১৯৩১ সালে যখন লাংগলতা চন্দ এসে কুমিল্লা অভয়-আশ্রমে 'কল্যাণ শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা করেন তখন যমুনা ঘোষ এসে সেখানে যোগ দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় অভয়-আশ্রমকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। লাংগলতা চন্দ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে জামুয়ারি মাসেই যমুনা ঘোষের কারাদণ্ড হয় পনেরো মাস। মুক্তির পর পুনরায় আন্দোলন পরিচালনা করার অপরাধে আবার তাঁর সাজা হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি মুক্তি পান।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ফিরে এসে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং বি.এ. পাস করা পর্যন্ত লেখাপড়া করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে তিনি কণ্ঠা-শিক্ষালয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে তাঁকে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক রাখে একবছর; মুক্তি পান তিনি ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে।

ফিরে এলেন তিনি দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় মধ্য। তখন লাবণ্যলতা চন্দ্রের সঙ্গে তিনি রিলিফের কাজ ও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি বাংলাদেশে এইসব নিবভিমান ও যশোলিপ্সাহীন কর্মীরাই গেঁথে তোলেন।

বর্তমানে বলবামপুরের বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি আন্তরিক নির্মমার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অন্ততম অংশ হচ্ছে সনকিছু নিজহাতে সাফাই করা। যমুনা ঘোব যখন অল্প কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে বাল্‌তি-ভর্তি মলমূত্র সাফাই করেন তখন মনে হয়—গান্ধীজীর শিক্ষা এখনো বাংলাদেশ কোনো কোনো প্রান্তে অন্তরঙ্গ করছে—গান্ধীজীকে বাংলাদেশ একেবারে ভোলে নাই।

প্রভানলিনী ভাণ্ডারী

★



১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ২৪ পূর্ণিমা জেলায় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বাদবপুৰ গ্রামে প্রভানলিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হেমচন্দ্র হালদার।

ঈশ্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বর্তমানে ভূদান-যজ্ঞের নেতা চাকচন্দ্র ভাণ্ডারীর সঙ্গে তার অল্পবয়সে বিবাহ হয়। তাঁর পুত্রবধূভীও ডায়মণ্ডহারবারে।

স্বামীর নিকট থেকে তিনি দেশসেবার প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩০ সালের লক্ষ আইন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তাঁর কাবাদের হয় নাই। ১৯৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করলে তিনি তিনমাস কাবাদের ভোগ করেন। মুক্তি পাবার পর পুনরায় ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিকেটিং পরিচালনা করার অপরাধে তিনি তিনমাস কাবারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি ডায়মণ্ডহারবার আদালতের মাঠে স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন ও তাঁর প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। এই নিবলস ও দুঃসংকল্প নারীকে বাধা দেবার সাধ্য ইংরেজ সরকারের ছিল না। যতবারই দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন ততবারই দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি আবার এগিয়ে গেছেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

স্বামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রতিষ্ঠিত 'খাদি-মন্দির'-এর সূতাকাটা, হরিজন-সেবা প্রভৃতির তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ১৯৩৪ সাল থেকেই।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সাতমাস কারাদণ্ড নিয়ে রইলেন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে।

বর্তমানে তিনি ভূদান-যজ্ঞের আদর্শে পবিত্র দিগ্বাসী এবং স্বামীব সঙ্গে তিনি এই কর্মেই যুক্ত আছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী



১৯০৮ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে বাজসাহী জেলাব তানোব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনবছর বয়সের মধ্যেই তার পিতা মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র এবং মাতা মনোমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁব মেজদিব কাছে মানুষ হয়ে ওঠেন।

১১ বছর বয়সে সিরাজগঞ্জের যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁব বিবাহ হয়। স্বশ্রবাবাদীর প্রায় সকলেই স্বদেশীভাবাপন্ন ছিলেন।

১৯২১ সালে ১৩ বছর বয়সে সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী সিরাজউদ্দীন সাহেবের ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিলিতি দ্রব্য বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অথচ বিলিতি চুড়ি পরিধান করা সম্বন্ধে দু'দিন আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁব তর্কাতর্কি হয়। স্বামী বিলিতি রেশমী চুড়ি পরার বিষয়ে আপত্তি করেন, কিন্তু জেদী, সৌখিন, ছেলেমানুষ বোঁ তা শুনলেন না। মনের মতো বেছে বেছে চুড়ি প'রে এলেন। তারই দু'দিন পরে সিরাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা শুনতে স্বামী পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রীকে, যাতে বিলিতি পরবার স্পৃহা আর তাঁর না-জাগে। ঢিল ঠিক জায়গায় পড়েছিল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে গেল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ১৭ বছর বয়সের সময় হঠাৎ তাঁর স্বামী মারা যান। তাঁর সেজ ভাণ্ডার পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন আজীবন কংগ্রেস-সেবী। তিনিই এই হতভাগ্য কিশোরীকে স্বদেশী কাষের প্রেরণা দেন। তিনি বুঝেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অশাস্ত জীবনে অল্প আর কিছুতে শান্তি আসবে না,—আসবে ত্যাগের পথে, মানবকল্যাণের পথে।

১৯৩১ সালে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে দলে দলে মেয়েরা যখন জেলে যাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া চলে গেলেন কংগ্রেসনেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্তের কাছে। তিনি তখন মেয়েদের বেছে বেছে নিয়ে আইন অমান্য করতে পাঠাবার ব্যবস্থা কবচ্ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও আন্দোলনে যোগদানের অঙ্গুমতি চাইলেন। প্রায় ২৫।২৬টি সত্যগ্রহীর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তিনি চলে যান আইন অমান্য ক'রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবতে। সেখানেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হিজলী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে তিনি বন্দী ছিলেন। জেলের মধ্যে কল্যাণী দাস, সুলতা কর প্রভৃতির সঙ্গে মিশে তাঁদের প্রভাবে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। পরে বেরিয়ে এসে তিনি শোভারাগী দত্তের সঙ্গে যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলে কাজ করেন।

বহরমপুর জেলে তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং তিনি (লাবণ্যপ্রভা দত্ত) তাঁকে আপন কন্যার ছায় স্নেহ করতেন। আজও তাঁদের সেই মা-তা ও কন্যার সম্পর্ক অটুট আছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বি.পি.সি.সি.-র সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ২২নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন। তা ছাড়া শোভারাগী দত্ত নিজেকে তাঁকে বিপ্লবীদলের কাজ করতে শিক্ষা দেন। রিভলভার আদান-প্রদান করা, লুকিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করা, তাঁদের আশ্রয় দেওয়া সবই তিনি শোভারাগী দত্তের নির্দেশে করতেন।

তিনি সরলা-পুণ্যাশ্রমের জন্ত ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন নিয়ে নানা জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সমাজসেবার কাজে তিনি ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন নিয়ে মালদহ, রাজসাহী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

এইভাবে জীবনের সার্থকতার সাধনায় তিনি জনসেবার কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

সবমা গুপ্তা.



সবমা গুপ্তা ১৮৮২ সালে ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিবীশচন্দ্র সেন ও মাতা সবলানন্দবী সেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে সবমা গুপ্তা সন্তান ও স্বামীহারা হয়ে ঢাকার পিত্রালয়ে চলে আসেন।

তিনি দেশের সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীজীব ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯২৪ সালে সবমা গুপ্তা আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 'গেণ্ডাবিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতি থেকে চবকা ও খদ্দর প্রচার করা, খাদি ও শিল্প-প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা, সভা-সমিতি আহ্বান করা এবং নানা গঠনমূলক কাজ করা হ'ত। মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা—সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হুর্ভূতদের হাত থেকে আত্মরক্ষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে সমিতিতে লাঠি-ছোঁবা খেলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হ'ত। শিক্ষাদান করতেন বিপ্লবী আশুতোষ দাশগুপ্ত।

১৯২৯ সালে সবমা গুপ্তা ও আশালতা সেন গেণ্ডাবিয়ার দুই মাইল দূরে একটি নিরক্ষর ও নমঃশূদ্রপ্রধান চাষীদের গ্রামে 'জুডান শিক্ষামন্দির' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ গ্রামের কোনো কোনো লোক

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নাবী

কংগ্রেস-কর্মীদের সেখানে কংগ্রেসের কাজ করতে প্রবল বাধাব সৃষ্টি কবে। তখন সেই গ্রামেব একজন বয়োবৃদ্ধ মাতব্বব অমবচাঁদ মিস্ত্রী তাঁদেব কাজে আন্তবিকভাবে সহায়তা কবতে থাকেন। তাঁবই পৃষ্টপোষকতাব ও সাহায্যে ঐ অল্পমত সম্প্রদায়েব বিদ্যালয়টি তাবা সূত্রপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ঐই মূলেব প্রথম পবস্কাব বিতবগী সভাতে অমবচাঁদ মিস্ত্রীব একটি পৌত্র পবীক্ষাব পদম হওবাব পবস্কাবস্বরূপ মহিলা-সমিতিব পক্ষ থেকে একথানা কুত্রিবাসী বামাষণ পাব। সেই সভাতেই সে যখন পিতামহেব হাতে বামাষণখানি দিবে প্রণাম কবে তখন সেই বৃদ্ধেব চোখ দিয়ে দবদব দাবে অশ্রু রাবে পডতে থাকে। বংশান্ত্রক্রেমে নিবক্ষব একটি পবিবাবেব বৃদ্ধ অভিভাবকেব শিক্ষাপ্রাপ্ত পৌত্রেব কাছ থেকে পাওবা বামাষণখানা বে কী অমূল্য সম্পদ ব'লে মনে হবেছিল তা ভাবা দিবে শোঝাবাব নব, চোখেব জল দিয়েই বুঝাব।

ঐই বিদ্যালয়েব কোণা কোনো ছাত্র পবে ম্যাট্রিক পাস কবেছেন, কোনো কোনো ছাত্র বলেজেও পড়েছেন। আশেপাশেব তাওটি গ্রামেব ছেলেবাও ঐই জুড়ান গ্রামে এসে শিক্ষালাভ কবত। সবম গুপ্তা বিদ্যালয়টিব জগ্ন অক্লান্ত পবিগ্রম কবেছেন। তাব মৃত্যুব পব তাবই নামে বিদ্যালয়টি আজও চলছে।

১৯৩০ সালে সবম গুপ্তা 'সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল' এব কর্মীকপে নে'বাখালি গিবে লবণ আইন অমান্ত কবেন। সেখান থেকে ফিবে এসে তিনি ঢাকা হ'ব ও ঢাকা জেলাব বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন পবিচালনা কবেন।

১৯৩২ সালে আন্দোলন পবিচালনা ক'বে তিনি গেপ্তাব হয়ে ঢাকা জেলে প্রেবিত হন। মুক্তিব পব তাঁব প্রধান কাজ ছিল ঢাকা জেলে কাবাদগে দণ্ডিত মহিলাদেব খোঁজখব নেওবা, কাবামুক্ত হ'লে তাদেব ঢাকা থেকে নিজ নিজ গ্রামে অথবা কর্মকেন্দ্রে পাঠিবে দেওবা। বিভিন্ন বে-আইনী প্রচাবপত্র সাইক্লোস্টাইল কবিবে মহিলাদেব দিবে তিনি বিলিব ব্যবস্থা কবতেন। সত্যাগ্রহী সেবিকা-দলেব নিজস্ব সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল—ঐই বিষয়েব দাখিহ গ্রন্থ ছিল তাব উপব। তিনি কংগ্রেসেব প্রচাবেব কাজে ঢাকা জেলাব অনেক গ্রামে এবং কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে পবিভ্রমণ কবেন।

সবম গুপ্তা ছিলেন ঢাকা এবং ঢাকার বাইবেব বহু দেশসেবকেবই স্নেহশীল। 'বডদি', এবং বিশেষ শ্রদ্ধাব পাত্রী।

১৯৭২ সালে তিনি কঠিন বোগে ভগ্নস্বাস্থ্য হন। ১৯৫০ সালে তাঁর দেহাবলন হয়।

সরযু গুপ্তা



কলিকাতায় ১৮৮৮ সালে সরযু গুপ্তা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ী ঢাকা-বিক্রমপুরেব সোনাবং গ্রামে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রমোহন সেন ও মাতা কুমুদিনী সেন।

সরযু গুপ্তা গান্ধীজীর আদর্শে প্রবুদ্ধ হয়ে সারাজীবন কংগ্রেসের কাজ ক'বে গেছেন। ১৯২৪ সালে ঢাকার 'গেণ্ডাবিবা মহিলা সমিতি'র সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন।

সরযু গুপ্তার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিত্তায় পারদর্শিতা ছিল। তিনি ঐ মহিলা-সমিতির স্বাস্থ্য-বিভাগের মাধ্যমে রুগ্নব্যক্তিদের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা দ্বারা স্বস্থ করতেন। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে প্রস্তুতিদের তিনি প্রসব-কালীন সহায়তা ও শিশুদের পরিচর্যা করতেন।

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি ঢাকা জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে 'সত্যগ্রহী সেবিকা দল'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি আইন আমান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলতে থাকে। তার ফলে সরযু গুপ্তা, কামিনী বসু, সুনীতি বসু ও প্রতিভা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁদের মধ্যে সুনীতি বসু ভিণ্ডা অগ্নি তিনজনই ছিলেন বিধবা। তাঁরা যখন জেলে গেলেন তখন বিধবাদের অথাত্ত সাধারণ লক্ষ্যখানার কয়েদীদের রান্না (ফাইলের ভাত) তাঁদের খেতে দেওয়া হয়। তাঁরা সরযু গুপ্তার নেতৃত্বে স্বহস্তে রান্না ক'রে খাবার দাবী জানান। নানা-প্রকার ভীতিপ্রদর্শনের পরও তাঁদের দৃঢ়তা দেখে জেল-কর্তৃপক্ষ বিধবাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর যখন পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সরযু গুপ্তা ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ডিস্ট্রিক্টার নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। সেই সময়ে ঘোড়সোয়ার পুলিশ তাঁদের ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি জাতীয় পতাকাহস্তে দৃঢ়পদক্ষেপে শোভাযাত্রা নিয়ে অগ্রসর হন। অবশেষে তাঁকে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কারামুক্তির কিছুকাল পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৪৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সরযুবালা সেন

(চাকার)



সরযুবালা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৯ সালে। তাঁর পৈতৃকভূমি বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রীমাচরণ সেন ও মাতা সরলাসুন্দরী সেন।

সরযুবালা সেন ১৯০১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁর মধ্যে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। তিনি খন্দর-প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘গেওয়ারিয়া শিল্পাশ্রমে’ বয়নকার্য শিক্ষা করেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন ‘সত্যগ্রহী সেবিকা দল’-এর সদস্যরূপে। পুনরায় ১৯৩২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে ঐ সালের জাহুয়ারি মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুক্তির পর তিনি বিক্রমপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি ‘নশঙ্কর মহিলা শিবির’ থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত। মহিলাগণ ঘরসংসার ছেড়ে এখানে অবস্থান ক’রে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। শিবিরে একত্রিত মহিলাদের নিয়ে সরযুবালা সেন ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টে পিকেটিং করতেন; গ্রামে গ্রামে সভা ও বৈঠক, এমনকি জলপথেও নৌকায় শোভাযাত্রা পরিচালিত করতেন। এঁদের কোর্ট-পিকেটিং-এর ফলে কিছুদিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট বন্ধ থাকে এবং মদ-গাঁজার দোকানও বন্ধ হয়ে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

যায়। লাঠি-চার্জ করেও এইসমস্ত মহিলা-কর্মীদের নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে ধারা ঐ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেন তাঁদের অনেকের মালপত্র ক্রোক করা হয়।

এইসমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পুলিশ বার বার ‘নশঙ্কর শিবির’-এর মহিলাদের বিতাড়িত করে এবং বারবারই তাঁরা শিবির দখল ক’রে বসেন।

১৯৩২ সালে সরযুবালা সেন ও তাঁর সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় ঘোর বর্ষার সময় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ‘বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলন’-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাযোগে সমাগত মহিলাগণ সম্মেলন-স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে রাত্রির অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর নৌকা লাগিয়ে, নৌকাতেই রাত্রিযাপন করেন। পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধ্বনিসহ হঠাৎ সকলে সম্মেলন-ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা হাতে উপস্থিত হন এবং সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করেন। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন ক্ষান্তকালী দেবী। তাঁর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধু যখন আন্দোলনে যোগদান ক’রে কারারুদ্ধ হন তখন এই বয়োব্রদ্ধা মহিলা অগ্রসর হয়ে আসেন কারাবরণ করবার জুতা। সম্মেলন আরম্ভ হবার অল্প পরেই পুলিশবাহিনী সভাস্থল ঘিরে ফেলে এবং সভানেত্রীসহ ২৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার কবে; এঁদের মধ্যে ক্ষান্তকালী দেবী প্রভৃতি শাওজনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯৩৩ সালে কলিকাতায় বে-আইনী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে। সরযুবালা সেন ঢাকা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে এই বে-আইনী কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

মুক্তির পর পুনরায় তিনি আইন অমান্য করেন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে প্রেরিত হন। কারামুক্তির পর তিনি ‘ঢাকা কল্যাণকুটির’ অবস্থান ক’রে গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হন।

কিরণবালা রুদ্র



১৮৯৯ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পূর্বখিলপাড়া গ্রামে কিরণবালা রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃকভূমিও ঐ স্থানেই। তাঁর পিতা শশীকুমার দে ও মাতা রাজবালা দেবী।

পনেরো বছর বয়সে মুকুন্দদাসের যাত্রা ও স্বদেশী-প্রচার তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। পিতার স্বদেশপ্রেমও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী বিক্রমপুরে ও নাবায়ণগঞ্জে আন্দোলন প্রচার করতে যান। তখন থেকেই কিরণবালা রুদ্র চরকা-কাটা ও খদ্দর ব্যবহার করা আরম্ভ করেন, অগাবধি তিনি খদ্দর ছাড়া অন্য বস্ত্র ব্যবহার করেন না।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী বিক্রমপুরে যান। তাঁর আগমনে সমগ্র বিক্রমপুর চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেইসময়ে কিরণবালা রুদ্র স্বশ্রমবাদের সমস্ত বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়েন। তাবপর তিনি আশালতা সেনের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁরা একত্রে কাজ করতে থাকেন—বিক্রমপুরের নানা স্থানে মহিলা-শিবির স্থাপিত হ'তে থাকে।

১৯৩১ সালে তাঁরা বিক্রমপুরে স্বদেশী-পোস্টাফিস স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই পুলিশ সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে। তাঁরা পাইকপাড়া মহিলা-সমিতির টাকা দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৩২ সালের আন্দোলনে যোগদান করার ফলে পাইকপাড়ায় কিরণবালা রুদ্র সহ ১৮ জন মহিলা সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন ও প্রায় দেড়শত মহিলা হাজতবাসের পর মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে কিরণবালা রুদ্র একবছর আটমাস কারারুদ্ধ থাকেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করাতে তিনি ঐ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর প্রতি দুইবছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে একবৎসর পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পর তিনি 'পাইকপাড়া বিদ্যাশ্রম'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু দেশ-

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বিভাগের পর পাইকপাড়ার প্রায় সাতশত চরকা-কাটুনী বাংলার এদিকে চলে আসেন, কিরণবালা রুদ্রও অবশেষে বছরখানেক পবে চলে আসেন। ফলে এদিকের কাজ তাঁর বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে তিনি ভদান-যজ্ঞের সঙ্গে জড়িত আছেন।

উষা গুহ



১৮৯৯ সাল ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উষা গুহ। তাঁর পিতা অভ্যচন্দ্র ঘোষ ও মাতা হেমাদ্বিনী দেবী।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা পান। ১৯৩০ সালে নোয়াখালিতে তিনি লবণ-সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩২ সালেও আইন অমান্ত আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালের আন্দোলনের সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন নবাবগঞ্জ থানার গালিমপুর গ্রামে একটা ঘরোয়া বেঠক অনুষ্ঠিত হয় কর্মী স্ত্রীসমিতি বহু ও উষা গুহের উদ্যোগে। সেই সময়ে প্রায় দুইশত গুর্খা সৈন্য সেই বাড়ী ঘেরাও করে। তখন বিকাল ৪টা। পুলিশ স্ত্রীসমিতি বহু ও উষা গুহকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে হাঁটাতে আরম্ভ করে। প্রায় ৬৭ মাইল হাঁটাবার পর রাত্রি আটটার সময় তাঁদের নবাবগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। থানার দারোগা কনস্টেবলদের চুপিচুপি কিছু ব'লে দেয়। তারপর পুলিশ আবার তাঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে চললো এক জঙ্গলের দিকে। সেই জঙ্গলের একটা নিবিড় বেতঝোপের মধ্যে তাঁদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে তারা চলে যায়। বেতঝোপটা এত ঘন ছিল যে, আকাশও দেখা যাচ্ছিল না, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। দারারাত্রি মহিলা দুজন সেখানে নিরুপায়ভাবে আটকে রইলেন। উষা গুহ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে জিজ্ঞেস করলেন, “স্ত্রীসমিতি, আমাদের এ কোথায় ফেলে দিয়ে গেল?” স্ত্রীসমিতি বহু অভয় দিয়ে বললেন, “ভয় কি? খার নাম করে বেরিয়েছ তাঁকে স্মরণ কর।” গান্ধীজীর নামের ছিল এমনই প্রভাব।

গালিমপুরের জঙ্গলে বাঘ থাকত। পুলিশরা বলেছিল, সে-রাতে নাকি কেউ কেউ তারা বাঘ দেখেছিল। ভোর হলে পুলিশ দেখল যে, ঐ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দুটি গান্ধী-অঙ্গুষ্ঠা স্বদেশভক্ত নারী তখনও বেঁচে আছেন, বাঘে খায়নি। সেখান থেকে আবার তাঁদের থানায় নিয়ে যায়। থানাতে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

নিয়ে গিয়ে কুংসিত গালাগালি ক'রেও দারোগা তাঁদের মনোবল বিন্দুমাত্রও
ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

কোর্টে মামলা শুরু হ'ল। তিনমাস হাজতবাসের পব তাঁদের প্রতি
একশত টাকা জরিমানা দেওয়ার আদেশ হয়।

প্রফুল্লমুখী বসু



১৮৯৮ সালের ৩রা নভেম্বর বরিশাল জেলার বানবীপাড়া গ্রামে প্রফুল্লমুখী গুহঠাকুরবতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরবতা ও মাতার নাম নির্মলাসুন্দরী দেবী।

তাঁর পিতা ছিলেন আজীবন কংগ্রেস-কর্মী, এবং কল্যাণ পেয়েছিলেন পিতার নিকট থেকে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা।

১৩ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং ২৮ দিন পাবেই তিনি বিধবা হন ও পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। কল্যাণকে পুনর্বিবাহে অসম্মত দেখে পিতা তাঁকে সেবামূলক কাজের শিক্ষা দেন।

১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি খ্রীস্টসাবদামাতা ও স্বামী প্রেমানন্দজীব আশীর্বাদ লাভ করেন। সাবদামাতা তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন—“অত নিবাণ কেন মা” তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।” প্রফুল্লমুখী একথা শুনে প্রাণে নতুন আলোব ইঙ্গিত পান।

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন ঢাকা যান তখন প্রফুল্লমুখী দেবী কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। তিনি ৮বকা ও খদ্দের প্রচারণা করতে থাকেন। মুন্সীগঞ্জে গিয়ে ১৪৪ ধাবা অমাত্য করাতে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ৬ ঘণ্টা থানায় আটক থাকেন।

১৯২৫ সাল থেকে তিনি বাজনৈতিক কাজে আবার সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালের আইন অমাত্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। সেইসঙ্গে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি বক্তৃতা ও প্রচারকার্য করতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে অর্ডিন্যান্স আইনে একমাস জেলে আটক রাখার পর চট্টগ্রাম বিভাগে প্রবেশ নিষেধ করে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে’ কংগ্রেসের ডিক্টেটর হিসাবে ১৪৪ ধাবা অমাত্য করাতে তাঁকে কুমিল্লায় ৯ মাসের

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কুমিল্লা, হিজলী ও বহরমপুরে প্রভৃতি নানা জেলে তিনি বন্দী ছিলেন।

মুক্তির পর শিক্ষয়িত্রী-জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনেকসময় গ্রীষ্মের ছুটিতে আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তার সঙ্গে বিক্রমপুরে গঠনমূলক কাজের জগ্য পরিভ্রমণ করতেন।

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে গঠনমূলক কাজ, রিলিফের কাজ ও নানা জনসেবার কাজ ক'রে চলেছেন। কুমিল্লার 'সারদা দেবী মহিলা সমিতি'র তিনিই সম্পাদিকা ও প্রাণশক্তি।

শতদল সরকার



১৯০৬ সালের ২৬শে এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার গুমুট নামক গ্রামে শতদল সবকাব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কেদারনাথ বিশ্বাস ও মাতা যুগল-কিশোরী দেবী।

গ্রামের মেয়ে। তাঁর অল্পবয়সেই বিবাহ হয়। কিছুদিন পরেই স্বামী বৃত্য হয়। তারপর সাধারণ গৃহস্থবাড়ী বনে শুধুই শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর টানা-পোড়েনের মধ্যে একঘেয়ে দিনগুলি গড়িয়ে চললো।

নানা প্রশ্ন এসে মনকে তাঁর তোলপাড় ক'বে তোলে—নারীরূপে জন্ম হয়েছে ব'লে কিছুই কি পৃথিবীতে করবার নেই? অত্যাচার যখন চরম অবস্থায় আসে তখনই হয় বিদ্রোহ। একদিন বিদ্রোহী হয়ে সমস্ত বাধাবিল্ল অতিক্রম ক'রে লুকিয়ে যোগ দিলেন তিনি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে।

বিদ্রোহী শতদল সরকার প্রথমে সরসীবালা দেবীর সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অধীন গোপালনগর ক্যাম্পে যান। সেখানে রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা ক'বছিলেন। এখানকার আন্দোলনে শতদল সরকার এবং পবে তাঁর ছোটবোন নীরজা বিশ্বাস যোগদান করেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন অনেক মহিলা-কর্মীকেই গ্রেপ্তার করে তখন শতদল সরকার ও নীরজা বিশ্বাস টানাদীঘিতে একটা বাড়ীতে আত্ম-গোপন ক'রে থাকেন। সেখান থেকে তাঁরা দুই বোন এবং লোকপুত্রের বীণাপাণি দেবী কলিকাতায় এসে আন্দোলনে যোগদান করেন। সেখানে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে এবং তাঁরা চারমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীরজার বয়স কম ছিল ব'লে তাঁকে তখন ছেড়ে দেয়, কিন্তু ১৯৩১ সালে ২৬শে জানুয়ারি পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শতদল সরকার যখন বাড়ী যান তখন তাঁদের নেতা রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে। জেল থেকে বের হলেন তিনি মারাত্মক

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

রোগ নিয়ে ; শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শতদল তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন ।

তারপর তাঁর পদপ্রদর্শক হয়ে দেখা দিলেন কংগ্রেস-নেতা স্বশীলচন্দ্র পালিত । শতদল সরকার তাঁর সংস্পর্শে এসে বাঁকুড়া জেলার প্রায় অধিকাংশ থানাতেই কাজ করেন ।

ক্রমে পরিচয় হয় তাঁর লাবণ্যলতা চন্দ্রের সঙ্গে । তাঁরই প্রেরণায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মে প্রবৃত্ত হন । শতদল সরকার আহ্বান করেন ‘বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন’ ১৯৩৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি । তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিকা । সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন লাবণ্যলতা ‘চন্দ্র । ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে লাবণ্যলতা চন্দ্র নির্দেশমতো তিনি গুমুটে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় গঠন করেন ; তিনিই তার প্রধান শিক্ষয়িত্রী ।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় গোপনে প্রচারের কাজ চলতে থাকে । শতদল সরকারের ঘরের মধ্যে ভাগবত মিশ্র ঐ প্রচারপত্র ছাপার কাজ করতেন । পুলিশ সন্দেহ করেছে কিন্তু বার বাব হানা দিয়েও হৃদিস করতে পারেনি ।

বালবিধবা শতদল সরকার তাঁর জীবনকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সার্থক করে তোলেন ।

মাতঙ্গিনী হাজরা

★



মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ, মতাস্তবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, মতাস্তবে ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

মাতঙ্গিনী দেবী মেদিনীপুর জেলায় তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে এক মাহিষ্য পবিত্রাবে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস মাইতি ও মাতা ভগবতী দেবী। মাতঙ্গিনী দেবীর পিতা একজন সাধারণ দরিদ্র কৃষক ছিলেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, কিন্তু আবো ঢুটি কুণ্ডা ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী বাল্যকালে দরিদ্র পিতৃগৃহে শিক্ষার কোনো সুযোগ পান নাই। বালিকা-বয়সে পার্শ্ববর্তী আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

বিধবা হবার পর প্রথমে তিনি কিছুদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। পবে স্বামীর ভিটার অদূরে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি কুলগুরু কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'বে ধর্মের পথে নির্ভর সঙ্গে জীবনযাপন করেন। ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'বে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। তমলুকের বামকুম্ভ-মিশন এবং সেখানকার সাধুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নাবী

পর পর কয়েকটি জাতীয় আন্দোলনের ফলে ১৯৩০ সালে মেদিনীপুরের জনগণ রাজনৈতিক চেতনায় এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, নবনারী নিবিশেষে যেন প্রতিটি মানুষ নিজেকে উৎসর্গ ক'বে দিতে উন্মুখ ছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে এসেছিল লবণ-আইন ভঙ্গ ও আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ। দলে দলে নবনারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গেছেন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পুলিশের নির্মম নির্বাতন, নাবীর উপর বীভৎস অত্যাচার, শাস্ত পুড়িয়ে দেওয়া, বাড়ীঘর জালিয়ে দেওয়া, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন সবই অকাতবে সহ্য কবেছেন মেদিনীপুর-বাসীরা। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালেও আন্দোলনে।

মাতঙ্গিনী হাজরাও ব'সে থাকতে পাবেননি। আপন হৃদয়ের তাগিদে বেবিয়ে এলেন তিনি আন্দোলনে ঝাপ দিতে।

১৯৩১ সালে তাঁর বাড়ীর সামনে তাঁদেরই জাবগাব একটি স্বেচ্ছাসেবক-শিবির স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালের ২৬শে জাম্বুয়াবী স্থানীয় কর্মীরা প্রভাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর একটি শোভাযাত্রা বেব করেন। কয়েকটি বালিকা শঙ্করনি কবতে কবতে শোভাযাত্রার পূর্বোভাগে যাচ্ছিলেন। মাতঙ্গিনী দেবীর কুটিরের সামনে দিবে যখন শোভাযাত্রা অগ্রসর হ'ব তখন তিনিও একটি শঙ্খ বাজাতে বাজাতে তাঁদের সঙ্গে যোগদান ক'বে ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন। জাবনের একটি শুভক্ষণে সেদিন তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঐদিন থেকে ঘটেছিল। বাত-বোগের জন্ম অনেকবছর যাবৎ তিনি আফিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীব আদর্শ গ্রহণ করার পর থেকে তিনি আব কখনো আফিম খান নাই। এককালের অভ্যস্ত নেশাব জন্ম যখনই তাঁর কষ্ট হ'ত তখনই তিনি 'গান্ধীজী' 'গান্ধীজী' 'গান্ধীজী' ব'লে তিন গণ্ডুষ জল পান কবতেন। তাঁর নেশাব কষ্ট অচিরে দূর হয়ে যেতো। এতবড় মনোবল এবং গান্ধীজীব প্রতি এমন অটুট নিষ্ঠা ছিল তাঁর। বাতবোগে আব কখনো তাঁর কষ্ট হয় নাই।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। আলিনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ 'প্রস্তুত ক'বে তিনি আইন অমান্য করেন। পুলিশ তাঁকে অগ্ন্যাত সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার ক'বে অনেকদূর পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে ছেড়ে দেয়। ঐ বৎসর তমলুক থানার

‘চৌকিদারী ট্যান্ড বন্ধ’ আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের সমব তমলুক শহরে একবার বাংলার গভর্নর দরবার কবেন। মাতঙ্গিনী দেবী একটি শোভাযাত্রায় যোগদান ক’রে “গভর্নর ফিরে যাও” ধনিসহকায়ে দরবারের দিকে অগ্রসব হন। পুলিশ তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর প্রতি ছয়মাস সশ্রম কাবাদেওর আদেশ হয়। তাঁকে বহুবমপুর জেলে বন্দী রাখা হয়।

মুক্তি পর আরো ঘনিষ্ঠভাবে তিনি কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। তিনি নিষমিতভাবে স্মৃতি কাটতেন এবং খন্দর ব্যবহার কবতেন। তখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কংগ্রেসেব প্রায় সব কাজেই তাঁকে অংশগ্রহণ কবতে দেখা যেতো। ১৯৩৩ সালে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন তমলুক থানার ত্রীবামপুৰ গ্রামে একটি ‘মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলন’ অস্থস্থিত হব। সেখানে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি-চার্জ কবে। এই সম্মেলনে মাতঙ্গিনী হাজরা প্রতিনিধিরূপে যোগদান কবেন প্রায় ১২ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে। ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুৰ জেলা কংগ্রেস মহিলা-সম্মেলনেও তিনি প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়ে যোগদান কবেন।

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদেব স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যেব প্রতি তাঁব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। দরিত্রের প্রতি স্নেহ তাঁর স্ববিদিত ছিল। পাডায় কেউ অভুক্ত আছে জানতে পারলে তখনি ব্যস্ত হ’য়ে তিনি তার আহাৰেব ব্যবস্থা কবতেন। আশে-পাশের গ্রামে কলেবা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিব আক্রমণের সময় তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক’রে রোগীর সেবা কবতেন। গ্রামের লোকেবা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ‘গান্ধীবুড়ী’ নামে অভিহিত কবতছিল। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাসের তাঁর অন্ত ছিল না। এমনকি অন্ত্র করলেও তিনি ওষুধ খেতেন না। গান্ধীজীর নামে ‘সিল্লিজল’ খেতেন—তাতেই নাকি তাঁর অন্ত্র সেরে যেতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের দমননীতি মেদিনীপুর-বাসীদের জ্ঞাত বিপ্লবেব পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সভা-সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হথ। যুদ্ধ-তহবিলে টাকা দেবার জ্ঞাত ধনী দরিত্র নির্বিশেষে সকলের উপর ভব দেখিয়ে চাপ দেওয়া হ’তে থাকে। নৌকা, বাইসিকেল, বাস সব নষ্ট ক’রে বা সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সবকিছুই জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে মরিয়া হয়ে উঠবার প্রেরণা দিয়েছিল।

বোম্বাইতে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব গ্রহণ করার

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পর এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের পর মেদিনীপুরের অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হয়। প্রতিটি থানাকে তাঁরা স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। মহিষাদল থানার সামনে প্রায় কুড়িহাজার লোকের মিলিত এক সভা যখন তাদের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করে তখন তমলুকের এস.ডি.ও. সভার বক্তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করার অদেশ দেয়। কিন্তু জনতা রুখে দাঁড়ায়। এস.ডি.ও. তখন লাঠি-চার্জের হুকুম দেয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কনেষ্টেবলগণ লাঠি-চার্জ না ক'রে, চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। এস.ডি.ও. সদলবলে পালিয়ে বাঁচল।

তমলুক মেদিনীপুরের একটি মহকুমা। মাতঙ্গিনী দেবী এই মহকুমারই নারী। তাই এখন তমলুকের কথায় আসছি। এখানে তখন ছাত্ররা বহু স্থল বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সংগ্রামে সংকট আশঙ্কা ক'রে কংগ্রেস-কর্মিগণ মহকুমাব্যাপী জাতীয় ডাক-বিভাগ খুলে ফেলেন। অগ্নাগ্ন মহকুমার সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রাখলেন। যতবাব সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে ততবারই আবার অধিক সংখ্যায় শিবির পুনর্গঠিত হয়েছে। সরকারী অফিস ও আদালত প্রভৃতি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ক্রমে জনগণ সরকারী আসন দখল করার জ্ঞান অসহিষ্ণু হতে ওঠে। তখন কর্মিগণ একটি সভায় স্থির করেন যে, ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরা থানা, কোর্ট এবং অগ্নাগ্ন সরকারী কেন্দ্র আক্রমণ ও দখল করবেন। প্রায় একলক্ষ নরনারী এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর রাতে কংগ্রেস-কর্মিগণ বড় বড় গাছ ফেলে বাইরে থেকে তমলুক আসবাব প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ ক'রে দিলেন। ২৭ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হ'ল; খেয়া-পারাপারের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

তমলুক মহকুমার তিনটি থানা—তমলুক, মহিষাদল ও সূতাহাটা একসঙ্গে আক্রমণ করা হ'ল ২৯শে সেপ্টেম্বর। কেবল নন্দীগ্রাম থানা পরের দিন আক্রমণ করা হয়েছিল। নিহত ও আহত বীরগণ শরীরের সম্মুখভাগে গুলীর আঘাত বহন ক'রে সম্মুখ সংগ্রামে আত্মপরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে সাতদিন পর্যন্ত যা পুড়িয়ে বা ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে একটি থানা, দুটি ফাঁড়ি, দুটি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, তেরোটি ডাকঘর, নয়টি ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, দশটি

পঞ্চায়েত অফিস, বারোটি মদের দোকান, চারটি ডাকবাংলো, মহিষাদল রাজ-এস্টেটের তেরোটি অফিস। বিপ্লবীরা তেরোজন সরকারী ও পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন এবং সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ করবেন এই প্রতিজ্ঞা করাতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের মেদিনীপুর জেলার ঘটনা জাতির জীবনে অবিস্মরণীয়।

পাঁচদিক থেকে পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা তমলুক শহরের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে বেলা তিনটার সময়। শোভাযাত্রায় অসংখ্য মহিলা ছিলেন। তমলুক শহর স্বরক্ষিত দুর্গের মতো সাদা ও কালো সৈন্তে ছেয়ে গিয়েছিল। শহরের দিকে ফাবার প্রতিটি রাস্তা লাঠি-ধারী সিপাহী ও রাইফেল-ধারী সৈন্তদ্বারা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছিল। শোভাযাত্রিগণ অহিংস ও শাস্ত ছিলেন।

পশ্চিমদিক থেকে আটহাজার বিপ্লবীসহ এক শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। তাঁরা থানার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুচণ্ড লাঠি-চার্জ আরম্ভ হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আহতদের মধ্যে কয়েকজন মরিয়া হয়ে থানার দিকে ছুটে যান। থানা থেকে গুলী চলে। একজন তৎক্ষণাৎ নিহত হন। আহতদের মধ্যে সংজ্ঞাহীন রামচন্দ্র বেরাকে বন্ধুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সৈন্তগণ থানার সামনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। বুলেট-বিক্র, রক্তাক্তদেহ রামচন্দ্র বেরা একসময় জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি অতিকষ্টে বুলেটে-ঝাঁঝরা-হওয়া দেহটাকে থানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন, তারপর সগর্বে চীৎকার ক'রে উঠলেন—“আমি থানায় পৌঁছে গেছি, থানা দখল করা হবে গেছে।” বিজয়ীবীর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইভাবে সেদিন পাঁচটি দল অগ্রসর হ'তে থাকে তমলুক শহরের দিকে। প্রতিটি দলের হাজার হাজার কর্মীর শোভাযাত্রার উপর লাঠি-চার্জ ও গুলীবর্ষণ চলেছিল।

উত্তরদিক থেকে আসছিল যে বিপুল বাহিনী তার মধ্যে চলেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। বাহাত্তর-বর্ষীয়া বৃদ্ধা থানা দখল করতে চলেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দলের পিছনের দিকে মহিলাদের রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহীদল তমলুক দেওয়ানী আদালতের নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বন্দীদল গুলীর ফোয়ারা ছাড়তে আরম্ভ করে। বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে মাতঙ্গিনী দেবী মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

তায় চোখে মুখে ফুটে উঠল স্বাধীনতার প্রতিভা। তিনি জাতীয় পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন—“করব অথবা মরব, হয় জব না-হয় মৃত্যু, তোমরা বাঁচতে ফিরে গিয়ে কি বলবে?” তাঁর আহ্বানে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীরা ফিরে দাডালেন এবং মাতঙ্গিনী দেবীর নেতৃত্বে সশস্ত্র-ভাবে দশদল বঙ্গবাহিনীর দিকে অগ্রসর হ’তে থাকেন। বঙ্গবাহিনী তখন বেপবোবা গুলীবিদ্ধ কবতে আবদ্ধ কবে। মাতঙ্গিনী দেবী জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধ’রে অগ্রসর হন। পশ্চাতে রয়েছে পাঁচহাজার আবালবৃদ্ধ নব নারীর বিশাল নিরস্ত্র বাহিনী। সৈন্যরা তাঁকে লক্ষ্য ক’বে গুলী ছুঁড়ল, অব্যর্থ গুলী এসে তাঁর তথানা হাওই বিদ্ধ ক’বে দেয়। হাত স্থলিত হ’ল কিন্তু জাতীয় পতাকা স্বাধীনতার গুলীবিদ্ধ হাতেও সগর্বে মাথা ঠেঁচু ক’বে উডতে থাকল। মাতঙ্গিনী দেবী অকম্পিত পদে এগিয়ে চললেন। ভাবতীর্থ সৈন্যদেব আহ্বান ক’বে ব’লে চলেছেন তিনি—“ভাইবো বৃকে গুলী চালিওনা, তোমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান কবা।” তাব উত্তবে আব একটি গুলী এসে তাঁর কপাল ভেদ ক’বে চলে গেল। ভুলুষ্ঠিত বক্তাপ্রত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ওখনো উচু হয়ে উডছে জাতীয় পতাকা। সবকাবী সৈন্য ছুটে এসে তৎক্ষণাৎ সেই জাতীয় পতাকা ধুলায় লুটিয়ে দেয়। শহীদ মাতঙ্গিনী হাজবাব পুণ্যদেহেব পশ্চাতে ছড়িয়ে পড়েছিল অমণিতব আবো কথেকজন শহীদেব গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ। তাঁদেব নাম—লক্ষ্মীনাথায় দাস (১৩), পুৰীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত (৩৩) এবং জীবনচন্দ্র বেবা (১৮)। বহু আহত বীব বক্তাক্ত কলেববে সেদিন ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। নাবীবা ছুটে গেছেন আহতদের সেবা করতে। পুকুৰ থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল আনতে গেলে, সৈন্যরা বন্দুক উচিয়ে তাঁদের বাধা দিতে এল। একজন নারী চীৎকার ক’রে ব’লে উঠলেন—“আমাদেব তোমরা গুলী ক’রে মেবে ফেলতে পার—কিন্তু ভয় দেখিয়ে বাধা দিতে পাববে না।” সৈন্যরা গুলী করতে নিবস্ত হয়।

মেদিনীপুবে এইভাবে চলেছিল সেদিন শহীদেব আত্মবিসর্জনেব বিনিময়ে বিদেশী শাসনেব হাত থেকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। মাতঙ্গিনী দেবীর অপূৰ্ব আত্মাহুতিব সেই গৌবোজ্জ্বল মুহূর্ত কয়টিব দিকে চেয়ে স্বতঃই মনে আসে—

“শুধু জানি, যে শুনেছে কানে

তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাগে

মাতঙ্গিনী হাজরা

সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্ধাতন লয়েছে সে বন্ধু পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শ্রুনেছে সে সঙ্গীতের মত।”

ওগো ভারতের গরীবসী জননী মাতঙ্গিনী দেবী, তুমি আমাদের শতকোটি
প্রণাম গ্রহণ কর !



সুচেতা কুপলানী



১৯০৮ সালের ২৬শে জুন সুচেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার শ্রেন্দ্রনাথ মজুমদার।

তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাবের স্থায়ী বাসিন্দা। সুচেতা দেবী লাহোরে লেখাপড়া শেখেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের সময় তিনি বিহারের গ্রামে মাসের পর মাস রিলিফের কাজ করেছেন।

১৯৩৬ সালে আচার্য জে. বি. কুপলানীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আচার্য কুপলানী সেই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৩৯ সালে সুচেতা কুপলানী নিখিল ভারত কংগ্রেসের মহিলা-সাব-কমিটির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। প্রায় বছর দেড়েক তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগেরও সম্পাদিকার কাজ করেন।

১৯৪০ সালে গান্ধীজী-পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগদান

ক'রে তিনি কারাবরণ করেন। সেখান থেকে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরই ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ হয়। যদিও প্রায় সমস্ত নেতাদের তৎক্ষণাত্ গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় কিন্তু স্বচেতা রূপলানী প্রায় দুই বছর যাবৎ পুলিশের হাত এড়িয়ে পলাতক অবস্থায় থেকে অসংখ্য কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা ক'রে যান। অবশেষে তিনিও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান।

বেরিয়ে এসে তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'কম্বুজবা গান্ধী মেমোরিয়াল ফাণ্ড'-এর তিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয়ে যায় একতরফা। সেখানকার সংখ্যালঘুদের অধিকাংশের বাড়ীঘর পেট্রলের আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের লাহিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়, হতাহতের সংখ্যাও হয় আতঙ্কজনক। দাঙ্গার পর স্বচেতা রূপলানী ছুটে যান নোয়াখালিতে দাঙ্গাপীড়িত শিশু ও নারীকে উদ্ধার করতে ও অভয়দান করতে। কতবার কত জারগায় এমন হয়েছে—অন্য প্রকৃতির বহু লোকের দল তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে, তাঁকে ঘিরে ফেলবার উপক্রম করেছে, হাসি বিদ্রূপ করেছে—তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়েছেন, ভয়ে লোকগুলি সরে গেছে। যখনই খবর পেয়েছেন, কোনো বাড়ীতে অপহৃত নারী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি সামান্য দু'একজন জনসেবক কর্মী সঙ্গে নিয়ে, বহু লোকের বাধা সত্ত্বেও বাড়ীতে ঢুকে পড়েছেন, হুঁস্কা নারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেন। তাঁর অসীম সাহসিকতার কাজ নোয়াখালির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। কখনো কোমর অবধি জল ভেঙে, কখনো-বা একাই চলে গেছেন তিনি অজানা গ্রামের অভ্যন্তরে অসহায় নারী ও শিশুদের উদ্ধারের প্রেরণায়। নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত, ভীত, আতঙ্কিত নারী বিনাবাক্যে নিঃশব্দে শুধু দূর থেকে তাঁকে দেখেই তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলে এসেছিল দলে দলে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায়। বিভিন্ন ক্যাম্পে এনে তিনি তাদের আশ্রয় ও খাণ্ড দিয়েছেন হাজারে হাজারে। অবিভক্ত ভারতের সেই সংকটতম সন্ধিক্ষণে নির্ভীক নারী স্বচেতা রূপলানীর এই হৃদয়-নিঙড়ানো সেবা ও দান কি ভুলবার ?

তারপরই মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার করতে চলে গেলেন, স্বচেতা রূপলানীও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন শান্তি-স্থাপন ও পুনর্বাসনের কাজে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বাংলা কংগ্রেসের এবং বাইরেরও অনেক মহিলা ও পুরুষ কর্মী নিয়ে স্বচেতা দেবী নোয়াখালির বহু গ্রামে শিবির স্থাপন কবেছিলেন গ্রামের লোকেদের মনে সাহস ও শাস্তি ফিবিতে আনবাব জন্ম। কর্মীবৃন্দের সাহায্যে তিনি নোয়াখালির গ্রামগুলিতে একদিকে বিলিফের কাজ, অত্রদিকে শাস্তি-প্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ফিবিতে আনা ও পুনর্বাসনের কাজ ক'বে চলেছিলেন অক্লান্তভাবে দীর্ঘদিন।

সেদিন নোয়াখালিতে মহামানব গান্ধীজী চলেছেন খালি-পায়ে গ্রামের পব গ্রাম পরিক্রমা ক'বে, অতি সা ও প্রেমের বাণী ছড়িয়ে। সেই মহাবাণী কেউ শুনেছে, কেউ শোনেনি। গান্ধীজীব আকাজ্জিত প্রেম ও অহিংসাপূত বৃহত্তব সভ্যতা আনবাব তিল তিল সাধনা একদিন সত্যই সফল হবে, এই বিশ্বাসই সেদিন জেগে উঠেছিল নোয়াখালির মাটিতে গান্ধীজীব কর্মীদের অন্তরে। স্বচেতা কুপলানী সেই কর্মীদেরই একজন। তাঁর কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে এই সবই বেজে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালের প্রথমভাগে যখন পাক্কাবে দাঙ্গা হয়, স্বচেতা দেবী সেখানেও ছুটে যান আতের সেবা কবতে। ভাবত-বিভাগের পব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শরণার্থীগণ যখন দিল্লী, পূর্ব-পাক্কাব, উত্তবপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে কাতাবে কাতাবে চলে আসেন তখন স্বচেতা কুপলানী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের সেবায নিজেই ডুবিতে দেন।

যেখানেই আতের আতিনাদ ও হাহাকাব সেখানেই স্বচেতা দেবী ত্রস্তপদে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধুভাবে। দবদী এবং কর্মদক্ষ স্বচেতা দেবী এই পবিচয় ভাবতবাসী বাব বাব পেবেছে।

বর্তমানে তিনি উত্তবপ্রদেশের মন্ত্রীরূপেও তাঁর যোগ্যতাব পবিচয় দিচ্ছেন।

বেলা মিত্র

★



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র ভ্রাতৃপুত্রী বেলা বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক দেশ তাঁর ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। পিতা স্বরেশচন্দ্র বসু।

ষশোহরের হবিদাস মিত্রের সঙ্গে ১৯৩৬ সালে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পিতার বাড়ীর আবহাওয়া, এবং বিশেষ ক'বে নেতাজীব প্রভাব গ'ড়ে তুলেছিল তাঁর চবিত্রকে। দেশসেবাব আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর কন্দরে। শ্রুতরাগত ষশোহরে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন একটি মহিলা-সমিতি ১৯৩৮ সালে।

১৯৪০ সালে বামগড়ে অয়োজিত হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশন। নেতাজী তখন মূল কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন। বামগড়ে ঐ কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি নেতাজী আহ্বান করেন এক আপোষ-বিবোধী সম্মেলন। সেই সম্মেলনে নাবীবাহিনীর কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯ বছরের মেয়ে বেলা মিত্র।

১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারি রাত্রি ১২টায় পর নেতাজী স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেন। নেতাজী যখন পূর্ব-এশিয়ায় তখন তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভাবতবর্ষে প্রেরণ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

করেন। তারই একটি দল সাবমেরিনে এসে উড়িষ্যার উপকূলে কোনারক মন্দিরের কাছে নিরাপদে নামেন। এই দলের লোকেরা পূর্বনির্দেশমতো বেলার স্বামী হরিদাস মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। হরিদাস মিত্র যখন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তায় নিমগ্ন তখন নির্ভীক বেলা তাঁর সকল সংশয় ঝড়ের বেগে মুহূর্তে উড়িয়ে দিলেন। হরিদাস মিত্র কর্তব্য স্থির ক'বে নিলেন। বেলা মিত্রের তত্ত্বাবধানে তাঁদের (হরিদাস মিত্রের) কলিকাতার বাসভবন থেকে হরিদাস মিত্র ও গুপ্ত-বিভাগের লোকেরা সিঙ্গাপুরে নেতাজীর কাছে ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথম ট্রান্সমিটার যোগে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করেন ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারি। তাঁদের সংবাদ আদানপ্রদান চলে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনেব সঙ্গে।

ক্রমে বেহালাব জঙ্গলের মধ্যে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে এই রেডিও-স্টেশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাঁরা সেখান থেকে গ্রেপ্তার হন। হরিদাস মিত্র প্রভৃতি আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্ত-বিভাগের লোকেরা এই স্থানেই বাস করতেন।

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে হরিদাস মিত্র ও অত্যাঁচ কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। সেই সময় তাঁদের গোপন বেডিঙেতে খবর এসে পৌঁছায় যে, আরেকটি সাবমেরিনে আরো কিছু আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক আসছেন, তাঁদের সঙ্গে আছে প্রভূত অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র। তাঁদের উড়িষ্যার উপকূলে কোনারক মন্দিরের কাছ থেকে নামিয়ে আনতে হবে। হরিদাস মিত্রের গ্রেপ্তারের ফলে গুপ্ত-বিভাগের অত্যাঁচ লোকেরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁরা বিক্ষিপ্ত, সহায়সম্বলহীন। বেলা মিত্র এগিয়ে এলেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি তাঁর সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি ক'রে সেই অর্থ দিয়ে শত বাধাবিঘ্নের মধ্যে লোক পাঠিয়ে উড়িষ্যার উপকূলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবতরণের দু'দিন পরে সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যান।

সংবাদ আদানপ্রদানের সমস্ত যত্নপাতি, দলিলপত্র ইত্যাদি নিরাপদে রাখবার দায়িত্ব এসে পড়ে বেলা মিত্রের উপর। তার মধ্যে কতকগুলি শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে কলিকাতা আলিপুর জেলে আবদ্ধ হরিদাস মিত্রের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে আজাদ হিন্দ ফৌজের আরো ২১ জন বন্দীর

ফাঁসীর আদেশ হয়। ১৯৪৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হরিদাস মিত্র এবং তাঁর কয়েকজন সাথীর ফাঁসীর দিন ধার্য হয়। ভারতের অত্যাচার কারাগারে বাকী বন্দীরা ফাঁসীর অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর বেলা মিত্র ছুটে গেলেন পুনায় মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই ২২ জনের জীবনরক্ষার প্রার্থনা নিয়ে। গান্ধীজীর চেষ্টার ফলে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের ফাঁসী স্থগিত রইল। বেলাকে তিনি তিনমাস পুনাতে রেখে দিলেন।

তিনমাস ধ'রে গান্ধীজী এবং ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে বহু পত্র-বিনিময় ও বাদান্তবাদ চলে এই বন্দীদের জীবনরক্ষার প্রস্ন নিয়ে। গান্ধীজী হরিদাস মিত্র সম্বন্ধে ১৯৪৫ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর একখানি চিঠিতে লর্ড ওয়াভেলকে লিখেছিলেন—“I have perused the petition for mercy by the uncle of the condemned as also of Advocate Carden Noad. I suggest that they furnish cogent grounds for the exercise of mercy. In any event the case for mercy becomes irresistible in that the War with Japan is over. It will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect.”

আজাদ হিন্দ ফৌজের আরও ২১ জন ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত বন্দীর মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্ত গান্ধীজী লর্ড ওয়াভেলকে ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর লিখেছিলেন—“I see from legal papers that there are others of the batch awaiting execution. The times when the sentences were pronounced were those of war when calunness was at a discount. Now they are changed. The war is over. The condemned men have, no matter what the cause of delay was, survived the war. Will it be too much if I suggest a reconsideration of all such cases in the shape of commutation of death sentences? In my opinion, justice to be real justice requires extention of mercy to temper it.”

কয়েকমাস ধ'রে এমনি সব জোরালো যুক্তিতর্ক দিয়ে বহু চিঠিপত্র আদান-প্রদানের পর অবশেষে গান্ধীজী জয়যুক্ত হলেন। ২২ জন বন্দীরই মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে বাবজীবন বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হ'ল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা নারী

গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে বেলা হাসিমুখে ফিরে এলেন কলিকাতায়।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলা মিত্র গঠন করেন ‘ঝাঁসীর বাণী’ বাহিনী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীব ‘ঝাঁসী রেজিমেন্ট’-এর আদর্শে। তিনি ছিলেন তার সর্বাধিনায়িকা। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৫০ সালে শিয়ালদা স্টেশনে এবং অত্রাণ্ড কেন্দ্রে বিফিউজিদের মধ্যে বিলিফের কাজ কবতে গিয়ে অতিবিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৫২ সালের ৩১শে জুলাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিক বেলা মিত্র অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি যখন পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে শিয়ালদা স্টেশনে কাজ করছিলেন তখন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুসংখ্যক পবিবাবকে বালি এবং ডানকুনি স্টেশনের মধ্যবর্তী অভয়নগর নামক স্থানে পুনর্বসতির ব্যবস্থায় সাহায্য করেন। বেলা মিত্রের মৃত্যুর পূর্বে ১৯৫৩ সালে ঐ স্থানের ‘বেলানগর’ নামকরণ হয়। পূর্বে ১৯৫৮ সালে তাঁর জন্মদিনে ‘বেলানগর’ নামে একটি নতুন রেলওয়ে স্টেশন ঐ স্থানেই নির্মিত হয়। ভাবতবর্ষে ভাবতীয় নারীর নামে রেলওয়ে স্টেশন এটি প্রথম।

‘বেলানগর’ রেলওয়ে স্টেশন



মায়া ঘোষ

★



গণিতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও 'বীজগণিত'-প্রণেতা কে. পি. বহুর দৌহিত্রী মায়া ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিল্লীতে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর মাতা প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী ও পিতা যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। মায়ার দু'বছর বয়সের সময় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়াকে মানুষ ক'রে তোলেন তাঁর মাতামহী মেঘমালা দেবী, কে. পি. বহুর স্ত্রী।

মেঘমালা দেবীর ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা তখন দিদি মেঘমালা দেবীর বাড়ীতেই থাকতেন। সেখানে তাঁদের সহকর্মী বন্ধুদের গোপন আনাগোনা ছিল। তাঁদের সকলের প্রতি এবং তাঁদের বিপ্লবী কাজের প্রতি মেঘমালা দেবীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। ফলে পুলিশের বহু নির্ধাতন সহ্য করতে হয়েছিল এই পরিবারকে।

মায়া তাঁর জ্ঞান হওয়া অবধি একটা বিপ্লবী আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর এই মামাবাড়ীর সঙ্গে যুগান্তর-দলের বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবনলাল চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সংস্রব ছিল। এঁদের সংস্পর্শে এসে, এঁদের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী শুনে, এবং এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মায়ার মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। মায়ার ছোটমাসীমা বীণাপাণি মিত্রও বিপ্লবীদের গোপনে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি নিজে কখনো বিলিতি জিনিস ব্যবহার করতেন না এবং মায়াকেও দিতেন না।

১৯৩০ সাল থেকে সশস্ত্র বিপ্লব ও অহিংস আইন অমান্ত আন্দোলনের দুই স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছিল বাংলাদেশ জুড়ে। ঐসব বিপ্লবীরা তখন কারাগারচীরের অন্তরালে। মায়া ঘোষ তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি ছুটফুট করছিলেন, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ছোট বোন স্নেহলতা দত্তও (সেন) তখন তাঁদেরই বাড়ীতে থাকতেন। তাঁরও প্রবল ইচ্ছা কাজ করবার।

একদিন কংগ্রেস-নেত্রী মোহিনী দেবী এলেন তাঁদের বাড়ীতে। জিজ্ঞেস করলেন, মায়া ঘোষ প্রভৃতি জেলে যেতে রাজী কিনা। মায়া লাফিয়ে উঠলেন। লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিন বন্ধু—মায়া ঘোষ, স্নেহলতা দত্ত ও দীপ্তি ঘোষ, এবং পৌছলেন গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে।

শোভাযাত্রায় যোগদান করাতে পুলিশ নিখে যায় তাঁদের লালবাজার। পরদিন ছেলেমাছুষ ব'লে বিচারে তাঁরা মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে সেদিন কী দুঃখ তাঁদের! বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার কোনো পথই তাঁদের সামনে তখন খোলা ছিল না—বিপ্লবী দাদারা সবাই তখন জেলে। নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা মায়ার মনে বুথাই কৈঁদে ফিরল।

তাঁর বাবা বিয়ের চেষ্টা করাতে মায়া করলেন অনশন। বিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ১৯৩৬ সালে মায়া বি.এ. পাস করেন। ১৯৩৮ সালে বিপ্লবী নেতারা সবাই জেল থেকে মুক্তি পান। গুপ্ত আন্দোলনের দিন তখন শেষ হয়েছে। যুগান্তর-দলের নেতারা তখন গুপ্ত যুগান্তর-দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁদেরই মুখপত্র-স্বরূপ ছিল তখন 'মন্দিরা' মাসিকপত্রিকা। বিপ্লবী রসিকলাল দাস মায়া ঘোষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'মন্দিরা'র সম্পাদিকা কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে। মায়া 'মন্দিরা'র কাজ করতে থাকেন প্রাণের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে। 'মন্দিরা'র কর্মীদের মনে তখন এই প্রেরণাই ছিল যেন 'মন্দিরা'র কাজ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ।

১৯৩৯ সালে বেধেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে বাড়ীর সকলের

অমতে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিয়ে মায়া চলে যান বীরভূমের রামপুরহাটে নিজের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। এবারের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান তাঁকে করতেই হবে।

তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্কুলে কাজ করতে করতে তিনি বীরভূমের গ্রামেব অভ্যন্তরে সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর একটা ঘনিষ্ঠতা, একটা নিবিড় সংযোগের ফলে কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়ে উঠল।

ওদিকে মায়া ঘোষের কাছে মহকুমা-শাসকের নির্দেশ এল যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা তোলার জন্ত স্কুলে সিনেমাব টিকিট বিক্রি ক'রে দেবার। মায়া ঘোষ লিখে পাঠান যুদ্ধ-তহবিলের জন্ত টাকা তুলে দেওয়া তাঁর আদর্শবিরুদ্ধ। তবুও চাকরী তাঁর গেল না।

১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের পূর্বেই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি নেতাগণ আবার কারারুদ্ধ হন। ঐ আন্দোলনের মুখে মায়া ঘোষ কলিকাতা এলেন কমলা দাশগুপ্ত ও বীণা দাসের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিভাবে আন্দোলনের কাজ করা যায়। আলোচনার পব সিদ্ধান্ত হয় যে, যে যার জায়গায় গিয়ে কংগ্রেসের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আন্দোলনের কাজ করবার চেষ্টা করবেন।

মায়া ফিরে যান রামপুরহাটে। তাঁর বিজ্ঞালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ—প্রভাসিনী চক্রবর্তী, গুরুমা প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সিনেমা দেখতে গিয়ে বুলেটিনের মতো কংগ্রেসের প্রোগ্রাম বিলি ক'রে এলেন। মায়া ঘোষ সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করবার চেষ্টা করতে থাকেন। স্থানীয় কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। এতদিনে মায়া ঘোষের রুদ্ধ আকাজক্ষা পূর্ণ হ'তে চলেছে। পরদিন শোভাযাত্রা যখন মায়া ঘোষের স্কুলের সামনে এসে থামল, তিনি বেরিয়ে এলেন তাতে যোগ দিতে—সঙ্গে এলেন স্কুলের আরো দুটি শিক্ষয়িত্রী—উষা মাহাড়া ও মণিপ্রভা মুখার্জী। শোভাযাত্রা ছেলেদের হাই-স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে যোগ দেয় এসে ছাত্রের দল। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন বীরভূমের বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্মী লালবিহারী সিংহ ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারাণী সিংহ, এলেন নীহারিকা মজুমদার।

রামপুরহাটের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল। বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে শহরে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

৩ গ্রামে। তাঁদের দমন করবার জন্ত সেখানে আমদানি করা হয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। শোভাযাত্রীদল ও সশস্ত্র বাহিনী পাশাপাশি চলতে থাকে ঐ ছোট শহরেও।

৩১শে আগস্ট থানা দগল করা হবে স্থির হয়। মায়া ঘোষ সদলবলে আদালত বন্ধ করতে চলে যান। মহকুমা-শাসক ফৌজদারী আদালত বন্ধ ক'বে দিবে চলে গেলেন। মায়া ঘোষের নেতৃত্বে কর্মীবাহিনী দ্রুত এসে সিভিল-কোর্টে দ্রাতিয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

ছেলের দলকে খাবার জন্ত পাঠিয়ে দিয়ে মায়া ঘোষ ফৌজদারী আদালতের বারান্দায় ব'সে ছিলেন। পাশে বসে আছেন সাবিত্রী গান্ধী। এমন সময় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বন্দুক উচিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে ফেললো। পুলিশবাহিনীর খেতাব অফিসার মায়া ঘোষকে সেখান থেকে হটাতে না পেয়ে, তাঁর দৃঢ়তা দেখে চলে যায় মহকুমা-শাসকের কাছ থেকে গুলী চালাবার অনুমতি চাইতে। অনুমতি মেলেনি। গ্রেপ্তারের আদেশ হয়। পুলিশবাহিনীর একজন এসে সাবিত্রী গান্ধীকে ধাক্কা দিয়ে বারান্দা থেকে নামিয়ে দেয়। মায়া ঘোষকে চারিদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেলে। দুজন লোক এমন শক্তভাবে তাঁর হাত ধরেছিল যে, অনেকদিন পর্যন্ত সেই কালসিটের কালো দাগ মিলিয়ে যায়নি। মায়া গ্রেপ্তার হলেন। সাবিত্রী গান্ধী তখনো তেজোময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। উগ্ৰত বন্দুকের সামনে জনতা নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সক্ষ্যারামী সিংহ দাঁড়ালেন এসে বন্দুকের সামনে। তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সাবিত্রী গান্ধীও।

মায়া ঘোষদের নিয়ে যায় সিউডি জেলে। সাজা হয় তাঁর একবছর দশমাস সশ্রম কারাদণ্ডের। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মায়া ঘোষ রাজসাহী জেল থেকে মুক্ত হন।

বেরিয়ে এসেই দেখেন তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়া। রিলিফের কাজ করতে লেগে যান তিনি বীরভূমের গ্রামগুলির মধ্যে।

১৯৪৫ সালে কস্তুরবা-ট্রেনিং নিতে চলে যান তিনি বঙ্গে।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি-দাঙ্গার পর নোয়াখালিতে গিয়ে রিলিফের কাজ করেন তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রামের অভ্যন্তরে।

অগাবধি নীরবে সমাজসেবার কাজ ক'রে চলেছেন তিনি বীরভূমের গ্রামে গ্রামে। নিরলস, শ্রান্তিহীন তাঁর কর্মপ্রেরণা।

সফ্ফারাগী সিংহ



সফ্ফারাগী সিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায়। উত্তরপ্রদেশে মেঘে হায়েও তিনি কাজ করেছেন বাংলাদেশে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল বিহারের লালবিহারী সিংহের সঙ্গে। লালবিহারী সিংহ বীরভূমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি বীরভূমে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্মী।

স্বামীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সফ্ফারাগী সিংহ স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি বামগড় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। সফ্ফারাগী সিংহ আধা-হিন্দী-মেশানে। বাংলাভাষায় মিষ্টি ক'বে কথা ব'লে বড় সরকারী অফিস থেকে অবস্ৰ ক'বে সহকর্মীদের পর্যন্ত হাসি খোঁচকি যোগাতেন।

এই আন্দোলনের সময় সদলবলে বোলপুর কোর্টে গিয়ে তিনি বিচারককে বলেন—“এইবার দাদা, আপনি ওখান থেকে নেমে আসুন, আমবা গিয়ে বসব।” শেষপর্যন্ত তাঁরা বোলপুরের কোর্ট বন্ধ ক'বে দিতে সমর্থ হন।

তিনি রামপুরহাটে এসে সেখানকার কর্মী মায়া ঘোষের সঙ্গে মিলিত হন। রামপুরহাটের দেওয়ানী আদালতে গিয়ে প্রথমে তাঁরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর কোজদারী আদালতের সামনে এসে ব'সে যান তাঁরা কোর্ট বন্ধ ক'রে দেবার জ্ঞা। সশস্ত্রবাহিনী আসে তাঁদের বাধা দিতে। সাবিত্রী গান্ধীকে তারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রত্যেকটি কর্মী গুলীর সামনে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃকে তাঁদের অসীম বল, সাহসে মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁরা। পুলিশ সেখান থেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়—সফ্ফারাগী সিংহ, মায়া ঘোষ, সাবিত্রী গান্ধী প্রভৃতিকে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সম্মতিবাণী সিংহকে একবছর তিনমাসেব সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রেখে দেয় টাকে রাজসাহী জেলে।

তিনি বর্তমানে ভূদান-যজ্ঞেব কাজে লিপ্ত আছেন। নিজেদের প্রায় সমস্ত জমি তাঁরা ভূদান-যজ্ঞে দান কবেছেন।

রাণী চন্দ'



১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে) পূজোর সময় রাণী চন্দ মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। কিন্তু দেশ চোখে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি, কারণ পদ্মানদী সেই তল্লাটই ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল।

বড় হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রশিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করতে। ধীরে ধীরে নিজেকে স্বেপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলেন তিনি শান্তিনিকেতনের চিত্রশিল্পী ও লেখিকা রূপে। তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রিয় ছাত্রী।

অমন সাহিত্য ও শিল্পের পরিবেশের মধ্যে থেকেও তাঁর প্রাণ ভরলো না। তিনি শুনতে পেতেন শৃঙ্খলিত দেশমাতার গভীর ক্রন্দন। তখন দেশের যে অবস্থা ছিল তাতে তাঁর মতো হৃদয়ের সাড়া না দিয়ে চূপ ক'রে শুধু শিল্পচর্চা করা অসম্ভব ছিল। আপন অন্তরের তাগিদেই তিনি দেশসেবার কর্মক্ষেত্রে নেমে এলেন। তাঁর মনে হ'ত এ-কাজ না ক'রে তাঁর যেন উপায় নেই।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বরাবরই খন্দর পরতেন তিনি। দেশের দরিদ্র সন্তানের হাতের কাজ যে! কংগ্রেসের কর্মীরূপে গঠনমূলক কাজ করতেন তিনি গ্রামের মধ্যে। গ্রামে চরকা পরিচালনা করা, স্কুল গঠন করা, হাতের কাজ শেখানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দেওয়ার কাজ ক'রে চলেছিলেন তিনি বছরদিন থেকেই।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সমগ্র বীরভূম যেন শিকড়স্বল্পে উঠল। গঠনমূলক কাজে তখন আর তাঁর তৃপ্তি রইলো না। একেবারে সংগ্রামেব সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে একাই বেরিয়ে পড়লেন আপন হৃদয়ের প্রেরণায়। অগ্ররাও অনেকে দ্রুত এগিয়ে এলেন আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। এগিয়ে না এসে তাঁরা সেদিন কেউ ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তাই রাণী চন্দ্রের সঙ্গে এমনি ক'রে একে একে এসে যোগদান করেন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা রূপলানী, শিল্পভনের ছাত্রী এলা দত্ত, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ভবানী সেন, শ্রীভবনের শান্তি দাশগুপ্ত (বনলতা দাশগুপ্তের দিদি) প্রভৃতি।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের কর্মসূচী অমুযায়ী তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান করেন। সভা-সমিতির অমুষ্ঠান করতে করতে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে যতই তাঁরা সাড়া পেলেন ততই আন্দোলন গভীরতর হয়ে দানা বেঁধে উঠল।

গ্রামবাসী সাঁওতালরাও এসে তাঁদের সভায় দলে দলে যোগ দিতে লাগলেন। গভর্নমেন্টের পক্ষে এ-দৃশ্য স্থির হ'য়ে দেখা আর সম্ভব হয়নি। আন্দোলন-পরিচালনারত ঐসব কর্মীদের পুলিশ একে একে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। রাণী চন্দ্রের কারাদণ্ড হয় ৯ মাসের। নন্দিতা রূপলানী, এলা দত্ত, ভবানী সেন, শান্তি দাশগুপ্ত প্রভৃতিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

দেশসেবিকারূপে দেশের লোকে রাণী চন্দ্রকে পেয়েছিল সেদিন জনসাধারণের মধ্যে। সাহিত্যিকরূপে তিনি আজ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত ও সুপরিচিত। যে বইগুলি লিখে তিনি অবিসংবাদিত স্মনাম অর্জন করেছেন তার মধ্যে প্রধান—'ঘরোয়া', 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'জেনানা ফাটক', 'পূর্ণকুম্ভ', 'হিমাদ্রি' প্রভৃতি। শুধু জেল-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি শিল্পীমনে কত যে রসসৃষ্টি করেছিল সে কথা লেখা আছে তাঁর 'জেনানা

রাণী চন্দ

ফাটক'-এ। 'পূর্ণকুম্ভ' নিজের কুতিষের পরিচয় দিয়েছিল যখন ১৯৫৩ সালে বইখানি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত হয়।

১৯৩৩ সালে রাণী চন্দেব বিবাহ হয় বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অনিলকুমার চন্দেব সঙ্গে।



বনলতা সেন
(চক্রবর্তী)

★

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বনলতা সেন জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামে। পিতৃভূমিও ঐস্থানেই। তাঁর পিতা কালীপ্রসন্ন সেন ও মাতা সরোজিনী দেবী।

ছোটবেলা থেকেই তাঁদের পরিবারে একটা স্বদেশী পরিবেশ তিনি দেখে আসছিলেন। মায়ের কাছ থেকে স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের কাহিনী এবং ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কাহিনী তিনি তন্ময় হয়ে শুনতেন। বাড়ীর অনেকেই ১৯২১ সালে স্কুল-কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এবং ১৯২৯ সালে যতীন দাসের মৃত্যুর পর দেশব্যাপী যে শোক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তিনি দেশের কাজ করবার জন্ত প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩০ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে চলেছিল গান্ধীজীর ‘লবণ আইন আমাণ্ড আন্দোলন’। বিপ্লবী আন্দোলনের গতিও সেইসময় প্রবল। চারিদিকের এই আবহাওয়া তাঁকে রাজনীতিক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করে। তিনি বিপ্লবী অম্মশীলন-দলে যোগদান করেন।

কার্তিকপুর গ্রামে একটি ক্লাব ও লাইব্রেরি স্থাপনে তাঁর একটা প্রধান

অংশ ছিল। একটি মহিলা-সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ‘মহিলা কর্মসংঘ’, ‘কংগ্রেস মহিলা সংঘ’ প্রভৃতিতে যোগদান ক’রে মহিলাদের মধ্যে তিনি কাজ করেন।

১৯৩৭ সাল থেকে তিনি ‘বন্দীমুক্তি আন্দোলন’, ‘ছাত্র ফেডারেশন’ প্রভৃতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ‘অল বেঙ্গল গার্লস্ স্টুডেন্টস্ কমিটি’-র তিনি সম্পাদিকা ছিলেন।

১৯৩৯ সালে স্ভাষচক্র বহু যখন পৃথক কংগ্রেস পরিচালিত করেন— বনলতা সেন তাতে যোগ দেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে তিনি শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হন। পুলিশ লাঠি-চার্জ করতে থাকে। পুলিশেব লাঠির আঘাতে তিনি লাহিত হন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রায় তিনবৎসর নিবাপত্তা-বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি আটক থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কারাবাসকালেই পরীক্ষা দিয়ে তিনি এম.এ. পাস করেন। মুক্তির পব অনুশীলন-দলের বিপ্লবী সরোজকুমার চক্রবর্তীৰ সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৪৬ সালে কলিকাতার দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গাবিধ্বংসদেব মধ্যে রিলিফের কাজ করেন। নানা স্থানের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁর বন্দী-জীবনের একটি ছবি দেওয়া এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জেলখানা হচ্ছে গতিহীন স্থির জলের ডোবা। এখানে অনেকদিন থাকতে থাকতে সবকিছুই যেন একঘেয়ে হ’য়ে প’চে উঠতে চায়। রাজবন্দীবা ঐ বন্ধজলকে প্রাণস্পর্শে সজীবিত করবার প্রয়াসে যতগুলি পদ্মা অবলম্বন করতেন, তার মধ্যে পড়াশুনা ও আলোচনা একটা প্রধান স্থান অধিকার করত। কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস্ প্রভৃতির কঠিন কঠিন নানা বই পড়বার একটা আড্ডা ছিল প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল-ইয়ার্ডে। আড্ডার পাঠকবৃন্দ ঐ কঠিন পুস্তকগুলিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন। তর্ক এবং মুক্তি তখন জাল বিস্তার ক’রে সব-কয়টি পাঠককে জড়িয়ে ফেলত। জাল না-হেঁড়া পর্ধস্ত কারো মুক্তি ছিল না। ঐ তর্কজাল তাঁদের দিনের চিন্তা, রাতের ঘুম সবই বেড়ে ধরত। ‘অ্যাটি ডুহ’রিং’ প্রভৃতি পুস্তকের প্রতিটি পঙ্ক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তার যুক্তি ও তর্ক বনলতা সেন মাঝে মাঝে এমনভাবে

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মেলে ধরতেন যে, অতরা সেই জালে অজানিতে জড়িয়ে যেতেন। জাল ছিঁড়ে সাময়িক মুক্তি অবশ্য একসময় আসত মূল সঙ্কানের একটা প্রবল চেষ্টার পর। তবু অনন্ত বহু অনন্তই র'য়ে যেতো। বনলতার যুক্তিবাদী মন তাঁর কাবাজীবনের সতীর্থদের এমনি ক'বে আনন্দ পরিবেশন করত।

কিরণ চক্রবর্তী

★



১৯২১ সালে কিরণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা জেলার নাবাঘণগঞ্জে। দেশ তাঁদের বিক্রমপুরেব পাইকপাড়ায়। তাঁর পিতা হীবালাল চক্রবর্তী ও মাতা স্বর্ণপ্রভা দেবী। তাঁর বড়মামা বমেশ আচার্য 'অন্তর্দীপন' বিপ্লবী দলেব নেতা।

বয়স বাড়বাব সঙ্গ সঙ্গেই কিরণ চক্রবর্তী দেখলেন তাঁর মা কংগ্রেসেব কর্মী, খন্দব ছাড়া কিছু ব্যবহাব করেন না, বিলিতী জিনিস বাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি নাবাঘণগঞ্জ কংগ্রেস মহিলা-সমিতিব সম্পাদিকা ছিলেন। প্রত্যেকটি আন্দোলনের পূর্বোভাগে তিনি থাকতেন। কল্যাণ কিরণ ছিলেন তাঁর সকল কর্মেব বাহন। তা ছাড়া তাঁর মামাবা সকলে প্রায়ই কারারুদ্ধ থাকতেন। কিরণ চক্রবর্তীও কাবাবরণ কবেছিলেন। ১৯৩০ সালেব আইন অমান্ত্র আন্দোলনে তাঁর দিদিমা বিধুমুখী দেবীও যোগদান করেন।

নাবাঘণগঞ্জে তাঁদের বাড়ীব পাশেই তাঁর মামাবাড়ীটি বাজনৈতিক কর্মীদের একটি আবাসস্থলে পরিণত হয়। বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ঐ বাড়ীটি রাজনৈতিক কর্মীদের একটি আশ্রয়স্থল হ'য়ে দাঁড়াত। ঐ পারিপার্শ্বিকে কিরণ

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

যোগ দিলেন আর.এস.পি. নামক বিপ্লবী দলে। তিনি একটি লাইব্রেরি ও পাঠচক্র গড়ে তোলেন। লাঠি-ছোরা খেলার ক্লাবও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ক্যাপ্টেন-রূপে শিক্ষা দিতে থাকেন। এইভাবে তিনি কর্মী-সংগঠন করেন।

১৯৪১-৪২ সালে কিরণ চক্রবর্তী স্বগ্রহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সময় যখন তাঁর মামারা কারারুদ্ধ তখন আন্দোলন পরিচালনা করাব ভার স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপব এসে পড়ে; অন্তরীণ অবস্থায়ই তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। খুব প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে হ’লে তাঁকে বেশ-পরিবর্তন করতে হ’ত। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে একদিন যখন তিনি থানায় হাজিরা দিতে গেছেন তখন তাঁকে গ্রেপ্তার ক’রে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে দিনাজপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়ে তিনি পূর্ণোন্মমে কাজ করতে থাকেন। কাজের পবিধি তখন আরো বেড়ে গেছে। পূর্বের কাজ তো ছিলই, তা ছাড়া বস্তীতে গিয়ে বস্তীবাসীদের সচেতন করার কাজ তিনি হাতে নিলেন।

তখন তিনি নারায়ণগঞ্জের আর.এস.পি.-র কাষকরী সমিতির সদস্য। যেসব কর্মী তাঁর সঙ্গে কাজে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম—বাজু সেন, জ্যোতি সেন, প্রণতি সেন, অরুণা সেন, বকুল পাল, মণিকা চক্রবর্তী, কিরণ চক্রবর্তীর বোন প্রভৃতি।

এরপর শুরু হয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। কাজের গতি হ’ল ব্যাহত। তারই পরে এল ভারত-বিভাগের প্রচণ্ড ভূমিকম্প—সহকর্মীরা কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেলেন কে জানে! কিরণ চক্রবর্তী নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে ছিটকে এসে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর গঠনমূলক কর্মধারা এখনও অব্যাহত আছে।

নির্মলা রায় (সান্যাল) ও সুসমা রায় (চক্রবর্তী)



নির্মলা রায় ও সুসমা রায় দুই ভগ্নী । তাঁদের পিতার নাম মনোরঞ্জন রায় । নির্মলা রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামে । সুসমা রায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালে ঐ গ্রামেই ।

পিতা যদিও গ্রামেব একজন জমিদার ছিলেন কিন্তু তিনি বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মের জন্য তাঁকে দৌলতপুর কলেজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় । বিদেশী শাসকদের হাতে পিতার বন্দীজীবনের নিষাতনের কাহিনী তাঁরা জ্ঞান হওয়া অবধি শুনতেন এবং তাঁদের মন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠত । মায়ের কাছে পিতার কথা শুনে, তাঁর উদার আদর্শের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হতেন । আব একটু বড় হ'য়ে চোখের সামনে প্রজাদের প্রতি পিতার সম্মেহ ও উদার আচরণে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন । ভাবতেন বড় হয়ে ওদের চঃখকষ্ট দূর না করতে পারলে জীবনের সার্থকতাই নেই ।

নির্মলা বায় ১৯৩৭ সালে বি.এ. পাস ক'বে কলিকাতায় আসেন । ১৯৩৮ সালে তিনি বিপ্লবী নেতা রমেশ আচায ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে এসে আর.এস.পি. দলেব সভ্য হন । তিনি ছাত্রী-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৩৯ সালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন'-এব ছাত্রী-সাব-কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হন । ১৯৪০ সালে বারানসীতে 'নিখিল ভাবত ছাত্র ফেডারেশন'-এর বার্ষিক সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির তিনি সভ্য নির্বাচিত হন । ছাত্রসমাজের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা-বন্দীরূপে তিনবৎসর প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকেন । তাঁর গানের স্বরনা জেলখানার অগ্নাজ্বলি বন্দীদের কাছে এক বিশেষ সম্পদ ছিল ।

১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভের পরেও তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে পূর্বের স্থায় কাজ করতে থাকেন । উত্তর-কলিকাতার নানা বস্তীতে তিনি নিরক্ষরতা দূর করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন ।

১৯৪৫ সালে ভবেশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

সুখমা রায় ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলিকাতায় কলেজে পড়তে আসেন। সেই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তারপর তিনি পাটনা, খুলনা, রাজসাহী ইত্যাদি স্থানে ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদান করেন। এদিকে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আর.এস.পি.-ব সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বস্তীতে কাজ করেন। আগস্ট-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে ১৯৪২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে আটক থাকেন এবং পরে বছরখানেক নিজ গ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দেয় তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে ছাত্রদের মুখপত্র 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তিনি গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে কবি নীরেঙ্গনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ছায়া গুহ



ছায়া গুহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলার আউটসাইদী গ্রামে ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর। তাঁর পিতা স্নেহচরণ গুহ এবং মাতা শৈলবালা দেবী।

শিশুকাল থেকে মানুষ হয়েছিলেন তিনি বর্মাদেশে। তাঁর পিতা সেখানেই বসবাস করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প'ড়ে ছায়া গুহের মনে মানুষের প্রতি দরদ ও সেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

১৯৩২ সালের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী বর্মায় বসে শুনতে শুনতে তাঁর মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগত। তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে কাজ কবাব স্বপ্ন দেখতেন। স্বভাষচন্দ্র বসুকে একখান চিঠিও লিখে ফেললেন। ছোট মেয়েটির স্তম্ভ-আকাঙ্ক্ষা-ভবা চিঠি নেতাজীব তাতে পৌছেছিল কিনা কে জানে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের বাজভক্ত স্কুল 'ওয়ার ফাণ্ড' খোলে। ছাত্রী ছায়া গুহ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা অগ্রাহ্য ক'বে, দল বেঁধে ঐ ফাণ্ডে টাকা না দিতে কুখে দাঁড়ালেন।

বর্মাদেশে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বর্মীভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হওয়াতে, ছায়া রেক্সনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প'ড়ে কলিকাতায় চলে আসেন ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। যে দেশের মাটি তাঁকে লালন পালন কবেছে, তার উপর মায়া ছিল তাঁর অনেকখানি, হয়তো জন্মভূমির পবেই তাব স্থান। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া আর তাঁর সম্ভব হয়নি।

কলিকাতায় এসে পরিচিত হন তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলের নেত্রী লীলা রায়ের সঙ্গে। যোগ দেন তিনি ঐ দলে। কাজের জ্ঞান অস্তরের স্পৃহা এবাবে স্রোত পেয়ে নিজেকে সঁপে দিল।

১৯৪১ সালের শেষে বর্মাদেশে যুদ্ধের ঢেউ উঠল—জাপানের বোমা-বর্ষণ শুরু হ'ল। বর্মায় প্রবাসী ভারতীয়গণ দিশাহারা হয়ে ছুটে আসতে লাগলেন ভারতের দিকে। কলিকাতায় জাহাজঘাটে ও হাওড়া স্টেশনে ছায়া গুহ সর্বস্বান্ত ও পথক্রান্ত ভারতীয়দের সেবা করতে ছুটে যেতেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

অবশেষে ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের আহ্বান এল। পিছিয়ে রইলেন না ছায়া গুহ। তিনি নিষিদ্ধ সভা-সমিতিতে যোগদান করতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই আগস্ট নিরাপত্তা-বন্দীরূপে কারারুদ্ধ হলেন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলখানার বন্দীদের তিনি মাতিয়ে রাখতেন তাঁর প্রাণস্পর্শ-করা গানে। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে। জেলের মধ্যে তিনি আই.এ. পাস করেন।

বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন বর্মা থেকে তাঁর বাবা মা সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁদের প্রতি কর্তব্যবোধে কাজ নেন তিনি একটা স্কুলে।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি-দাঙ্গার পর তিনি কলিকাতার কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে চলে যান নোয়াখালিতে রিলিফের কাজ করতে।

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ছায়া গুহ কখনো উদ্বাস্তুদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতেন, কখনো সরকারী আশ্রমে যেখানে অভাগা ভিক্ষুকদের আশ্রয় দেওয়া হয়—তাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে কাজ করতেন। কখনো শিশু-অপরাধীদের মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করেন তিনি সরকারের ‘জুভেনাইল কোর্ট’-এ। এখানে দোষী বড় নয়, দোষকে ও তার কারণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান ক’রে, সাব্যস্ত দোষীকে সংশোধন করবার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে মানুসেব সেবাকেই তিনি আপন জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

মেধা ঘোষ



১৯২৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহরে মেধা ঘোষের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মহতাব ঘোষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে অকালে দেহত্যাগ করেন। মেধার মাতা তাঁর একমাত্র সন্তানের পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র দেশ একটি বিপ্লবের স্রোতে প্রাবিত হচ্ছিল। তরুণ চিত্তে তখন নিজেরও অজ্ঞাতে বৈপ্লবিক আদর্শের একটা স্পর্শ লাগত। মেধা ঘোষও বাদ যান নাই।

১৯৪২ সালে তিনি বি.এস্.-সি. পড়ছিলেন। ওদিকে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তিনি উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে আন্দোলনে নেমে পড়লেন। অর্থ সংগ্রহ করা, গোপন ইস্তাহার রচনা ও বিলি করা ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বি.ভি. দলের কর্মী রাতুল রায়চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত হ’য়ে তিনি প্রায় আড়াই বছর আত্মগোপন ক’রে কাজ ক’রে যান। সেই কাজের জন্ত যে মস্তগুপ্তি-সাধনা, সাহস ও বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল—মেধা ঘোষের মধ্যে তা বর্তমান ছিল।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের এক গভীর রাতে তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করা হয়, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ মেধাকে কোনো ষড়যন্ত্রে জড়াতে পারে নাই। অবশেষে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’-এর কাজও করতে থাকেন। ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক’রে তিনি নিজের সংগঠন-শক্তির পরিচয় দেন।

স্বাধীনতা আসার পর লগুনে গিয়ে তিনি ‘সোশ্যাল সায়েন্স’ কোর্স-এর ডিপ্লোমা নিয়ে আসেন।

বর্তমানে তিনি ‘খাপছাড়া’ নামক সাপ্তাহিক কাগজের সহযোগী সম্পাদিকা।



মীরা দত্তগুপ্ত



১৯০৬ সালেব ৫ই অক্টোবর মীরা দত্তগুপ্ত ঢাকা শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। দেশ ঢাকা বিক্রমপুরেব জৈনসাব গ্রামে। তাঁর পিতা শবংকুমার দত্তগুপ্ত।

তাঁর পিতামাতা মনেপ্রাণে স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্যেব স্থান ছিল না। এই পাবিপাশ্বিকে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ব'লে সহজেই মীরা দত্তগুপ্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

তিনি ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পবীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবেন।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বি ভি নামক বিপ্লবী দলে যোগদান কবেন। 'বেণু' পত্রিকার মহিলা-বিভাগের ভার ছিল মীরা দত্তগুপ্তেব উপর। ঐ কাগজ পরিচালনা করবার দায়িত্বের একটা অংশও গৃহস্থ ছিল তাঁর উপর। কিছুদিন তিনি 'দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্রীসংঘ'-ব সম্পাদিকা ছিলেন। পবে তিনি ছাত্র-আন্দোলনেব প্রকাশ্য কাজ ত্যাগ ক'বে গুপ্তদলেব নীরব কাজে ব্রতী হন।

তাঁর পিতা বড় সবকারী অফিসার ছিলেন, কাজেই পুলিশ বহুকাল বিশ্বাসই করতে পাবে নাই যে, ঐ বাড়ীটি বিপ্লবীদের একটি গোপন কেন্দ্র।

সেখানে গোপন ইস্তাহার, জরুরী কাগজপত্র ও অস্ত্রাদি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত।

১৯৩১ সালে দলের নির্দেশে তিনি বিভাগাগর কলেজের মহিলা-বিভাগের ভাইস-প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় সম্পূর্ণ বেতনই তিনি দলের কাজে দিয়ে দিতেন।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দলের পলাতক বিপ্লবীদের গতিবিধির যোগসূত্র খাঁদের মাধ্যমে পরিচালিত হ'ত তাঁদের মধ্যে মীরা দত্তগুপ্ত ছিলেন অগ্রতম। শুধু তাই নয়, সেসময় মেদিনীপুরে এবং অগ্রতম কিতাবে কাজকর্ম করতে হবে সে-আলোচনা করবার জন্য বরানগরে দলের যে জরুরী বৈঠক বসে তাতে মীরা দত্তগুপ্ত অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৩ সালে তাঁর গোপন গতিবিধি পুলিশের নজরে আসে। মেদিনীপুরে বার্জ-হত্যার পব তাঁদের বাড়ী বার বাব তল্লাসী ক'রেও কিছুই পাওয়া যায় নাই।

১৯৩৪ সালে দার্জিলিং-এ লেবং-এর মাঠে গভর্নর অ্যাগারসনকে গুলী করা হয়। ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। সেই দলের কর্মী মীরা দত্তগুপ্তকে ইলিসিয়াম রো-তে নিয়ে গিয়ে পুলিশ নানা প্রশ্ন করতে থাকে। পুলিশ তাঁর বাবাকে জানায়—মেয়েকে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। দলের নির্দেশে মীরা পিতার কথা মেনে নিলেন। দুই বৎসর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে রইলেন তিনি।

১৯৩৭ এবং ১৯৫২ সালে তিনি দুইবার বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কর্মলিপ্ত থাকেন এবং প্রচুর অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিপ্লবী সতীর্থদের হাতে দেন।

১৯৪৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সহকর্মীরা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করতে থাকেন। মীরা দত্তগুপ্তও 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সভ্য হন।

দাক্ষাপীড়িতদের সেবায়, দুর্ভিক্ষে, বন্ধ্যায়, আর্ন্তাত্মিক-কল্ল, বাস্তবহারীদের সাহায্যে তাঁর সংগঠনমূলক কাজের অবদান অনেকখানি। ১৯৫৪ সালে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা-মিশনের সভ্যরূপে তিনি বাংলার তরফ থেকে চীন পরিভ্রমণ করেন। শিক্ষাবিদ রূপেও তাঁকে দেশ পেয়েছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্বরেজনাথ কলেজের সহ-অধ্যক্ষ।

অনিতা বসু



১৯৩২ সালের ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে অনিতা বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অম্বিকাচরণ বসুর বাড়ী ছিল ঢাকায় বিক্রমপুর পরগনার রাউতভোগ গ্রামে। এই পরিবারের গর্ব ছিল শহীদ বিনয় বসুকে ঘিবে। সম্পর্কে বিনয় বসু তাঁদের নিকট-আত্মীয়। শিশুকাল থেকেই অনিতাব মনোরাজ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের দিকে একটা প্রবল অনুরাগ ছিল।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ কববার পর থেকেই তিনি চারিদিকের রাজনৈতিক উত্তপ্ত হাওয়াব স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করেন। তিনি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গঠন করেন ‘স্বাতি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী’। তাঁরা প্যারেডও করতেন আবাব নাচগানও করতেন। অনিতা বসু ধীরে ধীরে একটি ছোট গ্রন্থাগারও সংগঠন করেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পাবলে তবে সে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও যোগ্যস্থান অধিকার করতে পারবে।

বিপ্লবী যতীশ জোয়ারদার যখন ময়মনসিংহ শহরে ‘আজাদ হিন্দু ভলান্টিয়ার কোব’ প্রতিষ্ঠা করেন, অনিতা বসু তার ‘ঝাঁসী-বাহিনী’ শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ দলে যোগদান করেন।

কলিকাতায় ভিয়েটনাম দিবস উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রা হয়। পুলিশ নির্মমভাবে তার উপর গুলীবর্ষণ করে। প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই ময়মনসিংহ শহরে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়; পুলিশ ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে বহু ছাত্র ও তরুণদল শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

ট্রেজারি-গ্রাউণ্ডে পুলিশের অবরোধ ভেঙে জনতা ভিতরে ঢুকে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসে পড়েন। বন্ধুদের মুক্তি না দিলে তাঁরা উঠবেন না, এই তাঁদের পণ। উত্তেজিত জনতার ইট-পাটকেল ও পুলিশের গুলীবর্ষণ চলতে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রছাত্রীর দল খাঁটি সত্যগ্রহীর মতো যথাস্থানে বসে রইলেন।

অনিতা বসু

পুলিসের গুলীতে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র অমলেন্দু ঘোষ অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ‘আজাদ হিন্দু ভলান্টিয়ার্স’-এর প্লেটুন সার্জেন্ট। তারপর পুলিসের গুলীতে অনিতা বসু ধরাশায়ী হন। তাঁর দুটি পা-ই গুলীবিক্ত হয়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার ক’রে তাঁর পায়ের গুলী বের করতে হয় এবং দুইমাস হাসপাতালে থাকতে হয়। তারও প্রায় সাতমাস পরে তিনি স্বেচ্ছা হন। এঁরা দুজন ছাড়া, লক্ষ্মী দাস, মণ্টু সেন, ভোলা মিশ্র ও দোলন গুলীবিক্ত হয়েছিলেন।

অনিতা বসু পরে শরৎচন্দ্র বসুর এস্.আর.পি. দলে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে তিনি বি.এ. পাস করেন।

বর্তমানে তিনি ‘সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ’-এর সম্পাদিকা এবং ‘আজাদ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন সার্ভিস’-এর সভ্য।

উমা সেন (দাশগুপ্ত)



১৯১৬ সালের ১৮ই অক্টোবর উমা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে। তাঁর পিতা সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও মাতা বিনয়লতা সেন। তাঁর উপর তাঁর দাদা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব ছিল অনেকখানি। ১৯৪৪ সালে উমা সেন এম.এ. পাস করেন।

১৯২৭-২৮ সালে মেদিনীপুরে এলেন তরুণ বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। তিনি 'বেণু' পত্রিকার মাধ্যমে আনলেন একটা নতুন তরঙ্গ। উমা সেনের কিশোর মনের উপর কাগজখানির লেখাগুলি গভীর রেখাপাত করে। বিপ্লবী সত্যভূষণ গুপ্ত, হেমেন গুপ্ত, শান্তিগোপাল সেন, জ্যোতিষ গুহ প্রভৃতি তাঁকে বিপ্লবের আদর্শে অন্তর্প্রাণিত করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। সেই বছরেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্ডকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে উমা সেনের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও, সন্দেহক্রমে ইংরেজ সরকার তাঁর পিতা সত্যেন্দ্রনাথের ২৩ বছরের সরকারী চাকুরী এক কলমের খোঁচায় শেষ ক'রে দেয়। ছেলেমেয়ের জ্ঞান পিতার সহ্য করতে হয় বৃটিশ গভর্নমেন্টের অত্যাচার। দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং সন্তানদের লিখলেন, এই ভাগ্যবিপর্যয়ের জ্ঞান দুঃখ না করতে। উমা সেনের ভাই অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে হন পলাতক, কিছুদিন পরে রাজবন্দী।

এই দুঃখোন্নের দিনে ১৭ বছরের মেয়ে উমা এগিয়ে আসেন পরিবারকে আর্থিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। দেশসেবার অপরাধে সেদিন আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁদের পরিত্যাগ করেছিল।

১৯৩৪ সালে তিনি পলাতক বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারকে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন কয়েকদিন। এই আশ্রয়দানের ফলে তাঁর মা, বাবা, এমনকি বৃদ্ধা দিদিমাকেও হাজত বাস করতে হয়েছিল। কিন্তু অবিচলিত মৌনতা দিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করেছেন।

পার্টির খবরের আদান-প্রদান, অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজের

উমা সেন (দাশগুপ্ত)

দায়িত্ব ছিল উমা সেনের উপর। সর্বোপরি তিনি তাঁর দাদার স্থান হৃদিমুখে পূর্ণ করেছিলেন পিতামাতার সমস্ত ভার বহন ক'রে।

১৯৪৬ সালে বন্ধু ও নেতৃবর্গ জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁদের সঙ্গে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন। নোয়াখালির দাঙ্গার পর, দাঙ্গাবিধ্বস্তদের মধ্যে গিয়ে তিনি লীল। রাযের নেতৃত্বে সেখানে কিছুদিন কাজ করেন।

বিনযেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

শশীবালা দাসী

১৯৪০ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রাম চলেছিল মেদিনীপুরে। বহু নারী সেই সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মাহুতি দিতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে খুব কম নারীরই নাম আমরা জানতে পাই। শশীবালা দাসী মেদিনীপুর সদর মহকুমার কেশপুৰ থানার তোরিয়া নামক গ্রামের এক অজ্ঞাত অখ্যাত নারী। আগস্ট আন্দোলনের সময় এক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে তিনি থানা দখল করতে ‘ছুটে গিয়েছিলেন কেশপুৰ থানার দিকে। শত্রুব গুলী এসে তাঁর অন্তিম শয্যা রচনা করেছিল রুধিবাক্ত ধারায়।

‘মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মৃতি।’

সিন্ধুবালা দেবী

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় তিলজলা রেলওয়ে কেবিনের দেবেন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা দেবী নিজেদের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন যুগান্তর-দলের পলাতক বিপ্লবী অমর চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চক্রবর্তী এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে ১৯১৭ সালে।

তাঁরা এই আশ্রয় ত্যাগ করে অগত্যা চলে যাবার পর, পুলিশ কোনো সূত্রে খবর পেয়ে দেবেন ঘোষকে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের সেই বাড়ীতে গ্রেপ্তার করে। তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা দেবী সেসময়ে নিজেদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।

পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেন্ট ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নিজে ইন্দাস চলে যান সিন্ধুবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে। সেখানে গিয়ে তিনি খবর পেলেন যে, ঐ গ্রামে দুইজন সিন্ধুবালা দেবী আছেন। কিন্তু একজনের নামে ওয়ারেন্ট। পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেন্ট তখন দুইজন সিন্ধুবালা দেবীকেই গ্রেপ্তার করে।

প্রভাবতী বসু

আসল সিদ্ধুবালা সেসময় সম্ভানসম্ভবা ছিলেন এবং সম্ভান ভূমিষ্ঠ হবার খুব বেশী দেৱী ছিল না । সেই অবস্থায় তাঁকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে স্টেশন পৰ্বন্ত নিয়ে যায় এবং তাঁকে বাঁকুড়া জেলে আটক রাখে ।

এই বৰ্বরতার জন্ত ১৯১৭ বা ১৯১৮ সালে হুগলিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে তাব সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন । পবে তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌সে বঙ্গীয় বিধান-পরিষদে এই ঘটনার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন ।

এইসব আন্দোলনেব ফলে এবং আসন্নপ্রসবা ছিলেন ব'লে সিদ্ধুবালা দেবীকে মাসখানেক বাঁকুড়া জেলে আটক রাখার পব মুক্তি দেওয়া হয় ১৯১৭ অথবা ১৯১৮ সালে ।

বগলাসুন্দরী সোম

ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেতা সূর্য সোমের স্ত্রী বগলাসুন্দরী সোম ১৯২১ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান কবেন । বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী যখন পিকেটিং ক'রে কারাবরণ কবেন তখন মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদাব প্রভৃতি নেত্রীগণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন । বগলাসুন্দরী সোম তাঁদের সঙ্গে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন । তাঁদের লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেদিনই পবে তাঁরা মুক্তি পান ।

প্রভাবতী বসু

ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেতা সূর্য সোমের কন্যা এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী সূধীর বসুর স্ত্রী প্রভাবতী বসু ১৯২১ সাল থেকে ময়মনসিংহের কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তিনি সেখানকার মহিলাদের কংগ্রেসে যোগদানের প্রেরণা দেন । কংগ্রেসের সব আন্দোলনেই তিনি অংশগ্রহণ করেন । পবে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নাবী

ময়মনসিংহেব বিপ্লবী যুগান্তব-দলেব সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে বিপ্লবীদের নিষিদ্ধ জিনিস ও কাগজপত্র তার হেপাজতে বাগা হ'ত।

কুমার-জননী লাহিড়ী

(পুটিয়া বাসমাংসা)

এক জমিদার গৃহিণী হ'বেও এবং তাঁব দুই ছেলেব গ্রেপ্তারেব পবেও তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্বস্ত প্রজাদের গৃহে তিনি বিপ্লবীদের গোপন ক'বে বাগবাব ব্যবস্থা কবতেন। তাঁব বাড়ীটি উত্তববন্দেব বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

বিপ্লবী সত্যবজ্ঞন লাহিড়ী এবং জ্ঞানাজ্ঞন লাহিড়ী তাঁব পুত্র।

সত্যবাণী দত্ত

(বাঁবাশাল)

১৯৩০ সালে স্বামী স্বেচ্ছনাথ দত্তেব সঙ্গে সত্যবাণী দত্ত কলিকাতায় ডালহাউসি স্কোবাব বোমাংব মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং হাজত বাস কবেন। তাঁব স্বামী ঐ মামলায় দীর্ঘমেবাদী দ্বীপান্তব দণ্ডে দণ্ডিত হন।

কমলা দাস

কমলা দাস তাঁব বাড়ীতে ১৯৩০ সালে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দান কবতেন এবং অগ্রভাবেও সাহায্য কবতেন। ডালহাউসি স্কোবাব বোমাংব ঘটনা সম্পর্কে তাকে গ্রেপ্তার কবা হয়, কিন্তু প্রমাণ অভাবে মুক্তি দেওয়া হয়।

কমলা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়)

কমলা চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হিজলী ও অগ্রাগ্র জেলে বাজবন্দী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহেব যুগান্তব বিপ্লবীদের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। (তাঁব বাজবন্দিতক কর্মজীবনেব তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় নাই।)

সুনীতি দেবী

সুনীতি দেবী ও তাঁর কন্ঠা মায়া দেবী উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের বিপ্লবীদলের কর্মী। সুনীতি দেবী অস্ব-আইনে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। পরে রাজবন্দীরূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪—৩৭ সাল পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি।

মায়া দেবী

সুনীতি দেবীর কন্ঠা মায়া দেবী। কলিকাতায় একটি বোর্ডিং-এ অবস্থান-কালে ডিনামাইট প্রভৃতি সহ তিনি গ্রেপ্তার হন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। অস্ব-আইন অনুযায়ী মায়া দেবীর ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে তাঁকে তৃতীয়-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। থানা ও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর জেদ ভাঙতে সচেষ্ট ছিল। তারা তাঁকে এত যাতনা ও কষ্ট দেয় যে, তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। অবশেষে তাঁকে প্রথমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালে রাখা হয়। তাঁর মুক্তির তারিখ জানা যায়নি।

ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস

৩মহিমচন্দ্র বিশ্বাসের বিধবা পত্নী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে পলাতক হয়ে অবস্থান করছিলেন চট্টগ্রাম অগ্নাগার লুণ্ঠনের নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন, কল্লনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণীন্দ্র দত্ত, স্থূল দাশগুপ্ত ও ব্রজেন সেনগুপ্ত। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে মিলিটারী সে-বাড়ী ঘেরাও করে। বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিটারী ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। (খণ্ডযুদ্ধের বিবরণী কল্লনা দত্তের জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।) বিপ্লবীবীর সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন গ্রেপ্তার হন। পরদিন প্রাতে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে। পলাতক বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা প্রভৃতিকে আশ্রয়দানের অপরাধে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বিপ্লবী বীরদের আশ্রয় দেওয়া যে সেদিন কী বিপুল গৌরব এবং কতবড় বিপদগ্রস্ত বহন করে এনেছিল তা জানেন সেদিনের এইসব দুঃসাহসী আশ্রয়দাত্রিগণ।

অমিতা সেন

অমিতা সেন রাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। তিনি ‘অচলীলন’ বিপ্লবীদলের কর্মী ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভ্রাতৃবধূ তিনি।

হাস্যবালা দেবী

(কদ্রকব, ফরিদপুর)

ও

মায়া নাগ

(বাবদী, ঢাকা)

হাস্যবালা দেবী এবং মায়া নাগ দুজনেই কাকুডগাছি বডযন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। রাজতবাসেব পর ১৯৩৩—৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা স্বর্গহে অন্তরীণ ছিলেন।

চারু চক্রবর্তী

চট্টগ্রামের ‘অচলীলন’ দলের কর্মী চারু চক্রবর্তী রাজবন্দী হয়ে হিজলী জেলে ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে।

নির্মলা চক্রবর্তী (ঘোষাল)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর নির্মলা চক্রবর্তী ১৩ বছর বয়সে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে। চট্টগ্রামের ঐপুরে তাঁর পিতার বাড়ী

অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত (সেন) ও বাসন্তী দাশগুপ্ত (রায়)

তন্মাসী ক'বে পুলিশ একটি রিভলভার এবং দলেব কিছু গোপন কাগজপত্র পায়। ফলে নির্মালা চক্রবর্তী'র প্রতি দেডবছর সশ্রম কাবাদগের আদেশ হয়। তখন তাঁব ১৪ বছর বয়স। পরে তিনি হিজলীতে দু'বছর রাজবন্দী ছিলেন। তাবপব একবছর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাব পব পুলিশ তাঁকে নিজের জেলা থেকে বহিষ্কার ক'বে দেয়।

নির্মলা দেবী ও নিরুপমা দেবী

(কদকব ফ'বদপব)

নির্মলা দেবী এবং নিরুপমা দেবী স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩৭ সালে।

অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত (সেন) ও বাসন্তী দাশগুপ্ত (রায়)

অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত ও বাসন্তী দাশগুপ্ত পুঙ্কলিবার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা নিবাবণ দাশগুপ্ত ও লাবণ্য দাশগুপ্তেব কন্যা। তাঁবা পিতাব অকুত্রিম দেশ-সেবাব আদর্শে অল্পবয়স থেকেই উদবুদ্ধ হন। অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত আবামবাবেব ১৯৩০—৩২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ কবেন। গ্রামেব কৃষকদেব মধ্যেও তিনি আন্দোলন পবিচালনা কবেন। ফলে দুইবাবে তিনি দেডবৎসব সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আবামবাবেব কৃষক মেয়েদেব মধ্যে তাঁব সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন বরদাময়ী দাসী।

অন্নপূর্ণা দেবী বর্তমানে গঠনমূলক কাজে এবং মাঝিহিডা জাতীয় বুনিযাদী বিঠালযেব কাজে নিযুক্ত আছেন।

বাসন্তী দাশগুপ্তকে তাঁব পিতা 'ঢাকা কল্যাণ কুটিব আশ্রমে' পাঠিয়ে দেন কংগ্রেস-কর্মীরূপে শিক্ষালাভ কবতে। তিনি ১৯৩০—৩২ সালেব এবং ১৯৪২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ক'বে ঢাকায় ও পুঙ্কলিযায় চাববার কাবাববণ কবেন। মুক্তির পর 'ওষাধী মহিলা মণ্ডলে' গিয়ে তিনি নানা গঠনমূলক কাজ শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি সিংভূমের নিমডিহতে একটি আশ্রমেব কাজ পরিচালনা ও গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন।

নীরব ও নিরলস কর্মী অন্নপূর্ণা দেবী ও বাসন্তী দেবী পিতার স্থযোগ্য কন্যা।

চামেলী দেবী গুপ্তা

উত্তরপ্রদেশের চামেলী দেবী গুপ্তা ছিলেন একটি বীরান্ননা। ১৯৩০ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় তিনি কলিকাতার ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’তে যোগদান ক’রে সভা ও শোভাযাত্রা করতেন, বডবাজারে গিয়ে পিকেটিং করতেন। তাঁকে দেখলে লোকে বিলিভী বস্ত্রের দোকানের কাছাকাছি যেতেও সাহস পেতো না। তিনি জেলে যাবার পর তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে যায়। সবক’ব প্রস্তাব কবে, বণ্ড লিখে দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তেজোদীপ্তা চামেলী দেবী বণ্ড লিখতে রাজী হলেন না। জেলেই তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ কবে। শরীর তাঁর ক্রমশঃ এত খাবাপ হয়ে যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে অবশেষে তাকে বিনাশর্তেই মুক্তি দেয়। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। কয়েকদিন পরেই মাতা ও পুত্র দুজনেরই জীবনলীলা সাক্ষ হয়। এমনি ক’রে ভাবতের নারী-সৈনিক সেদিন আপন ত্যাগ, বীরত্ব ও দৃঢ়তা দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিজয় ঘোষণা ক’রে গেছেন।

কুসুম বাগ্‌দী

মেদিনীপুরের কুসুম বাগ্‌দীর সাত মেথের পর এক ছেলে। দশমাসের সেই দুগ্ধপোষা শিশু বাডীতে রেখে তিনি ১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ক’রে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে গিয়ে তাঁর সম্ভানকে খাওয়ার জন্য অসহ্য কষ্টে তিনি ছটফট করছিলেন। প্রথম রাতটাই তাঁর কঁদে কঁদে কেটে যায়। জেলেব বন্দিদারী। অনেকেই এতে বিরক্ত হলেন—ছেলের জন্য এতই যদি কাঁদবে তবে জেলে এলে কেন? পরের দিন স্বামী ছেলে নিয়ে জেল-গেটে দিতে আসেন। কুসুম বাগ্‌দীকে জেল কর্তৃপক্ষ জেল-গেটে ডেকে এনে বলেন—“বণ্ড লিখে দিলে ছেলে পাবেন।” কুসুম বাগ্‌দী ছেলে না নিয়ে শূণ্যহাতে বন্দিদারদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন—“গান্ধীজীর কথায় জেলে এসেছি, আমি কি বণ্ড লিখে দিতে পারি?” বন্দিদারী তাঁর নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

অম্বু

মেদিনীপুরের মধ্যে কাঁথির ৪ মাইল দূরে পিছাবনী গ্রাম। ১৯৩০ সালে

এখানে প্রথম লবণ সত্যগ্রহ আন্তর্জাতিকভাবে আরম্ভ হয়। সে-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা মেদিনীপুরে। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে লবণ তৈরী ক'রে লবণ আইন ভাঙতে আরম্ভ করেন। পুলিশের নির্মম নির্ধাতন শুরু হয়। লবণ-সত্যগ্রহ দমন করবার জ্ঞাত পুলিশ মারপিট করতে থাকে। সত্যগ্রহী মেয়েদের অনেককে খালের জলে ফেলে দেয়। ক্রমে তাঁদের উপর অত্যাচার ব্যাপক হয়ে ওঠে। তারা ঘরবাড়ী তল্লাসী ক'রে ধান-চাল নষ্ট ক'রে দিতে থাকে। পিছাবনী গ্রামে এমনি ক'বে একটি বাড়ীতে তল্লাসী ও অত্যাচার করবার সময় অম্বু নামে একটি গর্ভবতী নারীকে পুলিশ লাঠি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিল।

নিরুপমা দেবী

নিরুপমা দেবী ১৯৭০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান গান্ধীজীর আদর্শে গঠনমূলক কাজ করবার প্রেরণায়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি নদীয়ার সাহেবনগর গ্রামে 'কম্বববা গ্রাম সেবিকা শিক্ষণ শিবির'-এর সঞ্চালিকা ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাহেবনগরে 'কম্বববা গ্রামসেবা কেন্দ্র' পরিচালনা করছেন এবং সর্বোদয়ের আদর্শে গ্রাম-সংগঠন ও ভূদান-যন্ত্রের কাজ ক'রে চলেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মপ্রেরণা অমূল্যযোগ্য।

আশা দাশগুপ্ত ও মাখন দাশগুপ্ত

আশা দাশগুপ্ত ও মাখন দাশগুপ্তের বাড়ী কুমিল্লায়। তাঁদের পিতা সাব-জজ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ঢাকার এক বিপ্লবী দলের সভ্য। তাঁদের একজন আত্মীয় ছিলেন পুলিশ-ইন্সপেক্টার। পুলিশ-ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে পিণ্ডল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পিণ্ডল সরাবার ইচ্ছায় একদিন এঁরা দুই ভগ্নী একগোছা চাবি নিয়ে ঐ বাড়ীতে যান। ইন্সপেক্টার আফিসে গেছেন। মাখন তাঁর জীকে নিয়ে এক ছুতো ক'রে বেড়াতে চলে গেলেন। আশা অত্যন্ত জরুরী সেলাই করবেন ব'লে ঐ বাড়ীতে রইলেন। তারপর আশা চাবি দিয়ে বাস্তু খুলে পিণ্ডল বার ক'রে নেন। অতি সাবধানে দুই বোনে গিরে পিণ্ডলটি দিয়ে এলেন দলের নেতার হাতে। কিন্তু তাঁরা গ্রেপ্তার হন নাই।

ফুলবাহার বিবি

১৯১৬ সালে ফুলবাহার বিবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুরের স্বাসপুৰ গ্রামে। তিনি অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তমিজুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। তমিজুদ্দীন ছিলেন কংগ্রেস-কর্মী। আইন অমাত্র আন্দোলনে তিনি ১৯৩১ সালে কারাবদ্ধ হন।

ফুলবাহার বিবি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকট থেকে দেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেন। তিনি পাইকপাড়ার কিরণ রুদ্রের সঙ্গে আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালের আইন অমাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় তাঁর ছয়মাস সশ্রম কাবাবও হয়। তাঁকে ঢাকা ও বহরমপুরের জেলে কারাবদ্ধ রাখা হয়। মুক্তির পূর্বে তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আভা মজুমদার

আভা মজুমদার ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগদান করতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন।

করুণা ঘোষ (সাহা)

করুণা ঘোষ ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন।

রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন

ময়মনসিংহের দুটি মুসলমান মেয়ে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন অল্পবয়সেই ১৯৩০—৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। শুধু তাই নয়, ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও নির্ধাতন বরণ করেন।

সামছুন্ নেছা বেগম [ঢাকার গোলাম জিলানীর মা],
 রওসন্ আরা বেগম [ঢাকার গোলাম জিলানীর স্ত্রী],
 রইসা বানু বেগম [ঢাকার আসফ আলি বেগের স্ত্রী],
 বদরন্ নেছা বেগম [ঢাকার আকতার উদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী]

এঁরা ১৯৩০—৩২ সালের আইম অমান্ত আন্দোলনের সময় সত্যগ্রহীদের সাধ্যমতো সাহায্য করেন। গোঁড়া ও সম্মানিত মুসলমান পরিবারের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে সহায়তা ও অর্থসাহায্য করেন। গোলাম জিলানী ১৯৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার ফলে ঢাকা জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সময় কারাবন্দী অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রোকেয়া বেগম

সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক রোকেয়া বেগম ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়বান্দ গ্রামের বিখ্যাত সাবের পবিত্রাবরে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য না ক'রে মুসলিম নারী-সমাজের উন্নতির জন্ত তিনি সারাজীবন সমাজসেবা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আলোকবর্তিক বহন ক'রে, অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলিম নারীকে পথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন উদারমনোভাবাপন্ন ও স্ত্রীশিক্ষা-অমুরাগী ছিলেন। স্বামীর নিকট থেকে তিনি সর্বকর্মের প্রেরণা পান।

রোকেয়া বেগমের রচিত পুস্তকের নাম 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'মুক্তিফল' প্রভৃতি।

'মুক্তিফল' পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, নারীর সহায়তা না পেলে একা পুরুষের চেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। 'অবরোধবাসিনী' পুস্তকে তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে বেদনাশ্রর চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারঘাত হানবার জন্ত প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী। প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসর সমাজের নারীদের মধ্যে দেশাহুরাগ জাগাবার যে প্রচেষ্টা তিনি সারাজীবন ধ'রে ক'রে গেছেন তার

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

মূল্য কম নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেক শিক্ষিতা ও অগ্রণী নারী তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘সাখা ওয়াং মেমোরিয়াল স্কুল’-এর ছাত্রী ও তাঁর হাতের তৈরী।

১৯৩২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।



ঢাকা ও ঢাকার গ্রামাঞ্চলে যেসব মহিলা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সভা-সমিতি ক’বে মহিলাদের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

- ১। মুক্তকেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীৰ স্বশ্রমাতা)
- ২। স্নশীলাসুন্দরী সেন (ঢাকার দীননাথ সেনের কন্যা)
- ৩। চিন্ময়ী দাস —সোনারবাং গ্রাম
- ৪। নবশশী দেবী ” ”
- ৫। স্নশীলা সেন ” ”
- ৬। কমলেকামিনী গুপ্তা —আউটসাই গ্রাম
(৭৬ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে
কংগ্রেস আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন।)
- ৭। প্রিয়বালা গুপ্তা ” ”
- ৮। গিবিজা গুপ্তা ” ”
- ৯। স্নবমা সেন ” ”

যে-সমস্ত মহিলা ১৯১০ সাল থেকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, তাঁদের পলায়নের ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখা, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

- ১। সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর) —১৯১০ সাল থেকে
- ২। ব্রজময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) —১৯১০ ” ”
- ৩। চিন্ময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) —১৯১০ ” ”
- ৪। জগৎতারার সেন (ঢাকা, সোনারগাঁ) —১৯১০ ” ”
- ৫। সরোজিনী দেবী (বরিশাল) —১৯১০ ” ”

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

৬। প্রিববালা দাশগুপ্ত (ববিশাল)	—১৯১০ সাল থেকে
৭। মৃণালিনী দাশগুপ্ত (ববিশাল)	—১৯১০ " "
৮। বগলাসুন্দরী দেবী (ঢাকা, চুড়াইল)	—১৯১৪ " "
৯। বিন্দুবাসিনী সোম (ঢাকা, বজ্রযোগিনী)	—১৯১৪ " "
১০। দুর্গামণি পাইন (ফবিদপুর, হাটুবিষাণ নিশি পাইনেব মা, তিনি ঢাকায় স্বগৃহে আটক ছিলেন।)	—১৯১৬ " "
১১। অম্বিকা দেবী (ফবিদপুর, পালং)	—১৯২২ " "
১২। স্নেহলতা বসু (ঢাকা বাউন্ডোং)	—সম্ভবতঃ ১৯২৩ " "
১৩। হুমবালা ঘোষাল (ছবর্গা)	—১৯৩০ " "
১৪। সুবমা দাশগুপ্ত (ববিশাল) (তিনি দুইবার গৃহবন্দী ছিলেন।)	—১৯৩০ " "
১৫। সুবমা মজুমদার (মবমননিংহ, বাবপব) (তিনি একবার স্বগৃহে সম্ভবতঃ ছিলেন।)	—১৯৩৩ " "

বিভিন্ন স্থানেব নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩০ সালেব লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'বে কাবাববণ কবেন :

কলিকাতা (১৯৩০)	১০। দেশকালী ছেত্রিনী
১। নিবাবিণী সরকার (১৯৩০, ১৯৩২)	১১। নাবাবণী কাউব
২। সবোজবাসিনী সাহা	১২। মলিনা গুপ্ত
৩। ছাবাবণী দেবী	১৩। সবযুবালা সেন
৪। সুরুচি গুহ রায	১৪। শোভনা বায
৫। পুষ্প নন্দী	১৫। সুবর্ণ সেন
৬। লাবণ্য মিত্র	১৬। গিরিবালা বায
৭। সুন্দর দেবী	১৭। কনকলতা দাস
৮। গঙ্গা দেবী	১৮। শতদলবাসিনী দত্ত
৯। কিবর্ণ দেবী	১৯। নন্দরাণী ধব
	২০। উজ্জয়িনী দেবী

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ২১। ইন্দুবালা দেবী | ৪৯। শান্তবালা দাসী |
| ২২। দয়াকুল দেবী | ৫০। ক্ষীরোদহৃন্দবী দাসী |
| ২৩। আবতি মুখোপাধ্যায় | ৫১। মনোরমা দাসী |
| ২৪। সুনীতি দাস | ৫২। অম্বালিকা বায় |
| ২৫। হিবলুবা ঘোষ | ৫৩। মানদা সেন |
| ২৬। শেখবাসিনী সাহা | ৫৪। সবলা চক্রবর্তী |
| ২৭। মায়া নন্দী | ৫৫। শিউবাসিনী গুহ বায় |
| ২৮। গোদাবরী বেন | ৫৬। শান্তা দেবী |
| ২৯। ওষাভিষা বাই | ৫৭। লাবণ্যপ্রভা দেবী |
| ৩০। সূপ্রভা দেবী | ৫৮। চপলা সেন |
| ৩১। সবয়ু দেবী | ৫৯। অম্মা জ্ঞান |
| ৩২। তাবা দেবী | ৬০। দুর্গাবতী দাশগুপ্ত |
| ৩৩। ভগবান দেবী | (১৯৩০, ১৯৩২) |
| ৩৪। যশোদা দেবী | ৬১। কুন্দ মিত্র |
| ৩৫। লীলাবতী দেবী | ৬২। প্রীতিলতা দাস |
| ৩৬। যমুনা বাই | ৬৩। সবলা সরকার |
| ৩৭। পুষ্প বাই | ৬৪। সবস্বতী দাশগুপ্ত (মিত্র) |
| ৩৮। প্রমীলা বাই | ৬৫। অরুণা দাশগুপ্ত |
| ৩৯। প্রিয়স্বদা দেবী | ৬৬। অমিতা দত্ত |
| ৪০। শৈলবালা দেবী | ৬৭। সবয়ুবালা দত্ত |
| ৪১। কুন্দরাণী স্মৃতি | ৬৮। আভা দে |
| ৪২। স্মরমা মুখোপাধ্যায় | ৬৯। ছায়া চট্টোপাধ্যায় |
| (১৯৩০, ১৯৩২) | ৭০। পুষ্পবাণী নন্দী |
| ৪৩। স্মরমা মুখোপাধ্যায় | ৭১। স্মরুচি সিংহ বায় |
| (১৯৩০, ১৯৩২) | ৭২। সবয়ু সেন |
| ৪৪। কমলা বিশ্বাস | ৭৩। সীতা ঘোষ |
| ৪৫। মথুবা বাই | ৭৪। লক্ষ্মীমণি দেবী |
| ৪৬। সন্তোষবাসিনী গুহ | ৭৫। বসন্ত বেন |
| ৪৭। সোহম দেবী | ৭৬। যমুনা বেন |
| ৪৮। বিন্দুবালা দাসী | ৭৭। রতনদেবী জেঠী |

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ১৮। লক্ষ্মীদেবী কাপুর | ১৫। বিভাবতী দাশগুপ্তা |
| ১৯। লক্ষ্মীদেবী শর্মা | ১৬। কোশল্যা দেবী |
| ২০। গঙ্গাদেবী মেহতা | ১৭। সজ্জন দেবী |
| ২১। কোশল্যা বেন | ১৮। লক্ষ্মী দেবী |
| ২২। যজ্ঞেশ্বরী দেবী | ১৯। বাসন্তী দেবী |
| ২৩। কৃষ্ণা দেবী | ২০। বীণাপাণি পাল |
| ২৭। দেওকালী দেবী | ২১। শীতলকুমারী দেবী |
| ২৫। হৃন্দব বাই | ২২। গোদাবরী দেবী |
| ২৬। শ্যাম্ভা বেন | ২৩। পদ্মাবতী দেবী |
| ২৭। প্রমীলা বেন. | ২৪। হুভদ্রা দেবী |
| ২৮। পুষ্পবতী বেন | ২৫। প্রভাবতী দেবী |
| ২৯। সবস্বতী গুপ্তা | ২৬। হীৰামন বিবি |
| ৩০। সজ্জন দেবী মহনোত | ২৭। হাজিমেন্সো খাতুন |
| ৩১। শ্রীমতী মহনোত | ২৮। স্তলতা রায় |
| | ২৯। সাস্তনা বায় |
| কলিকাতা (১৯৩২) | ৩০। আভাবঙ্গী দেবী |
| ১। জ্যোৎস্না মিত্র | ৩১। অনা দেবী |
| ২। গিবিজাবালা দত্ত | ৩২। বিনোদিনী ঘোষ |
| ৩। বমা দেবী | ৩৩। উজ্জম বেন |
| ৪। কুমুদিনী দাসী | ৩৪। শৈলবালা ঘোষ |
| ৫। ত্রিভবাণী দেবী | ৩৫। গৌরী দেবী |
| ৬। কৃষ্ণা মিত্র | ৩৬। বাজেশ্বরী দেবী |
| ৭। রুক্মিণী বেন | ৩৭। প্রভাবতী সবকার |
| ৮। হরি বেন | ৩৮। কুঞ্জবাণী দাসী |
| ৯। বাচ্চু বেন | ৩৯। হোসেন্সো বেগম |
| ১০। সরলাবালা দেবী | ৪০। চন্দ্রাবতী দেবী |
| ১১। রামকুমারী বেন | ৪১। নলিনীবালা মাইতি |
| ১২। লক্ষ্মী আচার্য | ৪২। প্রীতিলতা ঘোষ |
| ১৩। বিভা দত্ত | ৪৩। যুগ্মী দেবী |
| ১৪। অনিতা দত্ত | ৪৪। কল্যাণী ঘোষ |

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- ৭৫। নলিনীপ্রকাশ ঘোষ
- ৮৬। সবযু দেবী
- ৮৭। গঙ্গাদেবী ক্ষেত্রী
- ৮৮। কমলা বাব
- ৭৯। বীণাপাণি সবকাব
- ৯০। চপলাবালা সেন
- ৯১। স্বনীতাবালা দাশগুপ্ত।
- ৯২। সর্বোজিনী মিত্র
- ৯৩। বাবাবাণী দে
- ৯৪। সর্বাবাণী দে
- ৯৫। অনিমা ভট্টাচার্য
- ৯৬। বীণা দাশগুপ্ত
- ৯৭। শান্তি নিয়োগী
- ৯৮। যামিনীস্বন্দরী দাসী
- ৯৯। তাবাদেবী থান্না
- ১০০। সর্বোজিনী সেন
- ১০১। সত্যবালা দাসী
- ১০২। যশোদাবালা মল্লিক
- ১০৩। কুমুদিনী মিত্র
- ১০৭। বাধাবাণী দেবী
- ১০৫। ইন্দুবালা দত্ত
- ১০৬। কমলিনী দেবী
- ১০৭। এলোকেশী দাস
- ১০৮। বীণাপাণি গোস্বামী
- ১০৯। দয়াজদলনী গোস্বামী
- ১১০। পবিতোষবালা দেবী
- ১১১। কুশাঙ্গিনী দবাই
- ১১২। স্বশীলাবালা দেবী
- ১১৩। ননীবালা দেবী
- ১১৪। লীলাবতী কাপুর

- ১১৫। দক্ষবালা দেবী
- ১১৬। মতিবালা দেবী
- ১১৭। মলিনা দেবী
- ১১৮। পদ্মা দেবী
- ১১৯। শহীদা থান
- ১২০। কমলিনী সবকাব
- ১২১। বীণাপাণি দেহু
- ১২২। তাবাদেবী বিদ্যুতী
- ১২৩। কমলবাণী সবকাব
- ১২৭। প্রভাবতী দেবসবকাব
- ১২৫। শৈবলিনী দেবী
- ১২৬। হোসেনাবা বেগম

২৪ পরগনা (১৯৩২)

- ১। শিবকালী দেবী
- ২। অমলা দেবী
- ৩। মাতঙ্গিনী কবণ

হাওড়া (১৯৩২)

- ১। স্বশীলা দেবী
- ২। হীবালক্ষ্মী দেবী
- ৩। লক্ষ্মী বাই
- ৪। নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৫। হবিদাসী চট্টোপাধ্যায়
- ৬। লীলাবতী দেবী
- ৭। বীণাপাণি দে
- ৮। কমলিনী সবকাব
- ৯। স্বসমা মুখোপাধ্যায়
- ১০। স্বরমা মুখোপাধ্যায়
- ১১। কুমুদিনী দাসী

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১২। স্বকুমারী মুখোপাধ্যায়

১৩। করুণাময়ী দেবী

(১৯৩০, ১৯৩২)

ছগলি (১৯৩২)

১। চাক দাসী

২। বিনয়বালা দেবী

৩। ববদা দাসী

৪। বতনবালা দানী

৫। আতববাল্ল দাসী

৬। এককড়িবালা ঘোষ

৭। ববদাময়ী দাসী

বীবভূম (১৯৩২)

১। সত্যবালা দেবী

বর্ধমান (১৯৩২)

১। বীণাপাণি দেবী

২। সরসীবালা দাসী

৩। নির্মলাবালা সামন্ত্যাল

৪। শিবানীবালা দেবী

৫। দুর্গাবাগী দেবী

৬। সুবাসিনী চন্দ

৭। জ্ঞানপ্রভা দেবী

৮। কমলেকামিনী দেবী

৯। স্বষমা দেবী

১০। মঞ্জুরাগী ঘোষ

বাকুড়া (১৯৩২)

১। বসন্তকুমারী দেবী

২। তিনকড়িবালা দাসী

৩। স্বহাসিনী দাসী

৪। বিন্দুবাসিনী দাসী

৫। সবোজিনী বাগচী

৬। চাকবালা দাসী

৭। ইন্দুমতী ঘোষ

৮। উষাবাগী দেবী

৯। বামছলানী দেবী

১০। হেমনলিনী দেবী

১১। ত্রিবন্ধনী বাঘ

১২। লক্ষ্মীপ্রিয়া বাঘ

১৩। চাকবালা দেবী

১৪। সবসী দেবী

১৫। ফিবণশাল কর্মকাব

১৬। সবযুবালা বাগলী

১৭। দক্ষবালা দেবী

১৮। বাধাবাগী দেবী

নদীয়া (১৯৩২)

১। নির্মলনলিনী ঘোষ

২। অপর্ণা অধিকারী

৩। বিভাবাগী দাসী

৪। স্বপ্নীতি মজুমদার

৫। সাবিত্রী দেবী

৬। হরিদাসী বৈষ্ণবী

৭। লীলাবতী দেবী

৮। মুণালিনী দে

৯। উষালতা দেবী

১০। প্রমোদা দাসী

১১। নন্দরাণী বিশ্বাস

১২। সাবিত্রী দাস

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

১৩। দুর্গারাগী দেবী

গুলনা (১৯৩২)

১৪। মুণালিনী সাম্র্যাল

১। চাকবালা বসু

মুর্শিদাবাদ (১৯৩২)

ববিশাল (১৯৩২)

১। জ্যোতির্ময়ী বাগচী

১। সবযুবালা সেন

২। বেলাবাণী দানী

২। লাণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত

৩। প্রমীলা দেবী

৩। লাণ্যপ্রভা দত্ত

৭। কমল বসু

৪। গোলাপবাসিনী দাস

৫। সবসীবালা দেবী

৫। মনোবমা বসু

৬। মুণালিনী দেবী

৬। শৈলবালা দাস

৭। কালিদাসী দেবী

৭। যোগমায়া দত্ত (১৯৩২, ১৯৪২)

৮। কিরণশরী দেবী

ববিণাল (১৯৪২)

৯। কমলা দেবী

১। সুনীতিবালা দাস

১০। হেমললিনী চৌধুরী

২। পূর্ণলক্ষ্মী চক্রবর্তী

১১। আশালতা দেবী

৩। নির্মলা ঘোষ

১২। বীণাপাণি দেবী

৪। মানদাসুন্দরী আইচ

৫। কিরণবালা মুখোপাধ্যায়

যশোহর (১৯৩২)

৬। মায়া গুপ্তা

১। উষাবাগী ঘোষ

৭। সুষমা মুখোপাধ্যায়

২। মনোবমা বসু

৮। হাসি সেন

৩। সর্বোজিনী ঘোষ

৯। সবলাবালা বায়

৪। বাজপ্রিয়া ঘোষ

নোয়াখালি (১৯৩২)

৫। শৈলবালা ঘোষ

১। কমলকামিনী ঘোষ

৬। শৈলবালা আশ

২। কিরণপ্রভা চৌধুরী

৭। বনলতা বসু

৩। বনলতা সরকার

৮। অমিষাবাগী ধব

চাঁদপুর (১৯৩২)

৯। হেমললিনী ঘোষ

১। বিভাবতী ঘোষ

১০। সর্বোজিনী দে

ঢাকা (১৯৩২)

১১। তরুলতা মারিক

১। কিরণবালা কুশারী

১২। কালিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ২। বিরজাসুন্দরী বসু | ৩২। উত্তমা মজুমদার |
| ৩। সরোজিনী ঘোষ | ৩৩। সর্বসুন্দরী পাল |
| ৪। অন্নপমা ঘোষ | ৩৪। সরোজিনী দে |
| ৫। উষাবালা দেবী | ৩৫। তরুবালা পাল |
| ৬। সরোজিনী দত্ত | ৩৬। শান্তিবালা কর |
| ৭। কুসুমকুমারী ঘোষ | ৩৭। হেমলতা আচাৰ্য |
| ৮। সরোজিনী সরকার | ৩৮। চপলা দেবী |
| ৯। স্বর্ণমঙ্গলা দেবী | ৩৯। মাখনবালা সরকার |
| ১০। স্বর্নলতা দাশগুপ্ত | ৪০। সুরুচি দেবী |
| ১১। সুরবালা দে' | ৭১। সরমা মুখোপাধ্যায় |
| ১২। রাধারাণী সাহা | ৬২। হেমাঙ্গিনী দেবী (১ জন) |
| ১৩। কিরণবালা সাহা | ৭৩। সুরাসিনী দেবী |
| ১৪। প্রতিভা সেন | ৪৪। হিবণবালা দেবী |
| ১৫। ব্রজবালা দেবী | ৪৫। প্রভা সেন |
| ১৬। ছায়া রায় | ৪৬। সুরবালা সেন |
| ১৭। লাবণ্যপ্রভা গুহ | ৪৭। সুরবালা দাশগুপ্ত |
| ১৮। কুসুমকামিনী ঘোষ | ৪৮। প্রভাবতী দেবী |
| ১৯। হেমনলিনী গঙ্গোপাধ্যায় | ৪৯। নগেন্দ্রবালা সেন |
| ২০। কমলা দেবী | ৫০। বিধুমুখী সোম |
| ২১। গিরিবালা ঘোষ | ৫১। মানদা দেবী |
| ২২। শোভনাময়ী সরকার | ৫২। লাবণ্য দাশগুপ্তা |
| ২৩। প্রভাবতী রায় | ৫৩। সরযুবালা সরকার |
| ২৪। সরযুবালা দেবী | ৫৪। প্রভাবতী চন্দ |
| ২৫। হেমনলিনী সেন | ৫৫। জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী |
| ২৬। নীহারকণা ঘোষ | ৫৬। সুরবালা দেবী |
| ২৭। চারুবালা দে সরকার | ৫৭। কাদম্বিনী দেবী |
| ২৮। নৈশপ্রভা দেবী | ৫৮। প্রভাবতী সরকার |
| ২৯। মৃণালিনী দেবী | ৫৯। পারুলবালা সরকার |
| ৩০। সরলা দেবী | ৬০। অমিয়বালা সরকার |
| ৩১। হিরণ্যায়ী ঘোষ | ৬১। সর্বমঙ্গলা দেবী |

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাব নারী

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ৬২। সুনীতি সেনগুপ্তা | ৯১। শান্তিবালা গুপ্তা |
| ৬৩। সৌদামিনী শীল | ৯২। সোভনীবালা দে |
| ৬৭। ইন্দুমতী দেবী | ৯৩। মানদা মল্লিক |
| ৬৫। সত্যজিৎ বসু | ৯৪। উত্তমা ধুপী |
| ৬৬। চিত্তবালা বসু | ৯৫। বিজনবালা দে |
| ৬৭। মনোবমা বর্দন | ৯৬। স্ত্রীসিনী দত্ত |
| ৬৮। স্ত্রীসিনী সোম | ৯৭। চপলা দত্ত |
| ৬৯। জ্যোৎস্নামণী মিত্র | ৯৮। সবযুবালা দত্ত |
| ৭০। মমতাবালা দে | ৯৯। কামিনীবালা দত্ত |
| ৭১। টগববালা সবকাব | ১০০। পূর্ণিমা দে |
| ৭২। স্নেহলতা দেবী | ১০১। কামিনী দে |
| ৭৩। হেমন্তলিনী দেবী | ১০২। জ্ঞানদা দে |
| ৭৭। স্ত্রীসিনী দাস | ১০৩। প্রমদা দাস |
| ৭৫। জগৎতাবা দেবী | ১০৭। নির্মলা দাস |
| ৭৬। কামিনীবালা দেবী | ১০৫। মহামায়া দত্ত |
| ৭৭। সাবিত্রীবালা দাস | ১০৬। স্ত্রীবালা দত্ত |
| ৭৮। প্রিয়বালা দেবী | ১০৭। স্ত্রীবালা গুপ্তা |
| ৭৯। শবৎকামিনী সবকাব | ১০৮। শৈবলিনী দাস |
| ৮০। হেনাবাণী মজুমদার | ১০৯। সুষমা দাস |
| ৮১। জ্ঞানদাসুন্দরী কত্র | ১১০। শোভাবাণী দত্ত |
| ৮২। হেমন্তিনী কত্র | ১১১। বীণাপাণি দেবী |
| ৮৩। পুটু দে সবকাব | ১১২। সুনীতি দে |
| ৮৪। কবিতাবালা দেবী | ১১৩। বিনোদা দে |
| ৮৫। সুবমা মুখোপাধ্যায় | ১১৪। বাসন্তী দেবী |
| ৮৬। নীহাবমালা গঙ্গোপাধ্যায় | ১১৫। স্কুমারী শীল |
| ৮৭। মোক্ষদাসুন্দরী দে | ১১৬। হিবণপ্রভা সরকার |
| ৮৮। যশোদাসুন্দরী দে | ১১৭। বাসন্তী ঘোষ |
| ৮৯। অবলাবালা দে | ১১৮। মুগালিনী দে |
| ৯০। প্রমদাসুন্দরী দেবী | ১১৯। শান্তিবালা সেন |
| (ওবফে নির্মলা দে) | ১২০। নয়নবালা গুহ |

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- ১২১। আশালতা দে
- ১২২। বিন্দুবাসিনী দেবী
- ১২৩। সবয়ু মুখুটি
- ১২৪। মনোবমা দাশগুপ্তা
- ১২৫। প্রমদাসুন্দরী সেন
- ১২৬। সুবর্ণময়ী সবকাব
- ১২৭। শান্তমণি ভাণ্ড্যাল
- ১২৮। বাইসুন্দরী দেবী
- ১২৯। ক্ষ্যান্তকালী দেবী
- ১৩০। সুকুমারী দত্ত
- ১৩১। আশালতা দেবী
- ১৩২। বর্ণদাক্ষিণী দাস
- ১৩৩। ক্ষীবোদাসুন্দরী দাস
- ১৩৪। কুসুমকুমারী দেবী
- ১৩৫। স্নেহলতা নাগ
- ১৩৬। হরিদাসী দে
- ১৩৭। হরিদাসী দত্ত
- ১৩৮। প্রভাসলক্ষ্মী দেবী
- ১৩৯। শবৎকামিনী দে
- ১৪০। স্মৃতিবালা দে
- ১৪১। ইচ্ছাময়ী দেবী
- ১৪২। স্নেহলতা বায়
- ১৪৩। ক্ষীবোদাসুন্দরী রায়
- ১৪৪। প্রফুল্লবালা কুণ্ডু
- ১৪৫। মনোবাসিনী দেবী
- ১৪৬। স্মৃতিবালা কর
- ১৪৭। কনকপ্রভা রায়
- ১৪৮। হেমলতা আচার্য
- ১৪৯। হরিদাসী দেবী
- ১৫০। স্বরধুনী দেবী

- ১৫১। স্নেহলতা বসু
- ১৫২। হিবথায়ী গুহ
- ১৫৩। সবোজবালা মজুমদার
- ১৫৪। শচীবাণী দেবী
- ১৫৫। কিরণবালা দেবী

কুমিনা (১৯৩২)

- ১। গীতাবাণী ভৌমিক
- ২। হিবথায়ী দেবী
- ৩। অমিষা বায়
- ৪। উষাবাণী পালিত
- ৫। সাধনা সবকাব
- ৬। শান্তশীলা পালিত
- ৭। স্নহাসিনী মুখোপাধ্যায়
- ৮। নির্মলা সবকাব
- ৯। চাকরীলা দেবী
- ১০। অকণা মজুমদার
- ১১। সরয়ু বসু
- ১২। স্নেহলতা পাল
- ১৩। নবনীতকামলা সিংহ
- ১৪। বিভাবতী চৌধুরী

পাবনা (১৯৩২)

- ১। কুসুমবালা ঘোষ
- ২। রেবারাণী চন্দ
- ৩। সরোজনলিনী দত্ত
- ৪। কুমুদিনী ঘোষ
- ৫। হেমপ্রভা দেবী
- ৬। প্রভারাণী দেবী
- ৭। বিভারাণী দাস

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

বংপু (১৯৩২)

১। স্মৃতিবালা সমাদ্দার

২। দক্ষবালা দাসী

৩। অর্চনা প্রামাণিক

(তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাবিক্ষম্ভ

অঞ্চলেও ১৯৪৭ সালে কাজ করেন।)

৪। শান্তিবালা দেবী

৫। অমিয়ারাণী দেবী

৬। মহামায়া দেবী

৭। জ্যোতির্ময়ী দেবী

৮। স্বধারাগী সরকার

৯। বীণা সরকার

১০। চারুবালা ভট্টাচার্য

১১। বেলারাগী রায়

১২। আশালতা দেব

১৩। প্রিয়বালা দেব

বংপু (১৯৪২) : অন্তর্বীণ

১। অমিতারাগী চৌধুরী

২। শেলী দেব

৩। বেলা ভট্টাচার্য

৪। মৌলতী ভট্টাচার্য

৫। শতদল বসু সরকার

মেদিনীপুর (১৯৩০)

১। ননীবালা দাস

২। অরুণা দাস

৩। শতদল অধিকারী

৪। স্বরূপা দাস

৫। সবিতা বসু

৬। চারুশীলা সেন

৭। সুযমা সেন

৮। কমলা বাগ্‌দী

৯। ননীবালা মাইতি

১০। মাখন দাসী

১১। বসন্ত মণ্ডল

১২। নিবারণ দাসী

মেদিনীপুর (১৯৩০)

১। সত্যবালা দাসী (অত্যাচারিত)

২। ইন্দুমতী দেবী

৩। স্বহাসিনী দেবী

৪। সুখদা রায়চৌধুরী

৫। লক্ষ্মীরাগী দেবী

৬। কুসুমকুমারী মণ্ডল

৭। বাসনবালা মাইতি

৮। হেমন্তবালা টোং

৯। পঞ্চমী ডালনী

১০। ভূতিবালা ডালনী

১১। মগনবালা মাল

১২। কিরণবালা মাইতি

১৩। বসন্তবালা করক

১৪। নীরবালা রায়

১৫। সুবোধবালা কুইতি

১৬। শুভঙ্করী দেবী

১৭। ধীরেনবালা ভুঁইয়া

১৮। চারুশীলা জানা

১৯। চিকণবালা দাসী

২০। কিরণবালা বেরা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- ২১। চাকুবালা পালিত
- ২২। সৌদামিনী পাহাড়ী
- ২৩। মাযালতা দাস
- ২৪। যমুনাবালা দেবী
- ২৫। চাকু মাঝিনী
- ২৬। অবনীবালা মাঝিনী
- ২৭। সরযুবালা দাসী
- ২৮। মনোবমা দাসী
- ২৯। সরযুশোভনা বসু
- ৩০। শতদল দেবী
- ৩১। বিবাজমোহিনী মাইতি
- ৩২। মাতঙ্গিনী দাসী
- ৩৩। ননীবালা দাস
- ৩৪। হরিপ্রিয়া দেবী
- ৩৫। সর্বোজিনী গিবি
- ৩৬। দময়ন্তী গিরি
- ৩৭। সুষমা পালিত
- ৩৮। নীরদা দাসী
- ৩৯। বিজ্ঞনবালা দাসী
- ৪০। রাসমণি মাঝিনী
- ৪১। গঙ্গামণি জানা
- ৪২। বসন্তকুমারী বেব্রা
- ৪৩। লক্ষ্মীবাণী দেবী
- ৪৪। গিরিবালা হাজরা
- ৪৫। জ্ঞানদাবালা বার
- ৪৬। বিন্দুবালা দে
- ৪৭। সত্যভামা জানা
- ৪৮। সঙ্কাময়ী পাহাড়ী
- ৪৯। স্বপ্না বেওয়া
- ৫০। কিরণশশী দত্ত

- ৫১। সুনীলাবালা দে
- ৫২। কুসুমকুমারী মণ্ডল
- ৫৩। যামিনীবালা সেন
- ৫৪। জ্ঞানকী দাসী
- ৫৫। বন বিবি
- ৫৬। সার দাসী
- ৫৭। সজ্জনী দাসী
- ৫৮। রোহিণী দাসী
- ৫৯। বসন্ত দাসী
- ৬০। কুসুম বাগ্‌দী
- ৬১। পদ্মা দাসী
- ৬২। বিদ্যাং দাস

মেদিনীপুর (১৯৪০)

- ১। ললিতা দেবী
- ২। শৈল দাসী
- ৩। ননীবালা মাইতি
- ৪। গিবিবালা ভুঁইয়া

ত্রিহট্ট (১৯৩২)

- ১। হীরাপ্রভা চৌধুরী
- ২। সুরপ্রভা দেব
- ৩। প্রভাবতী ধর
- ৪। সুরপ্রবাসিনী দেব
- ৫। স্বকেশিনী দেব
- ৬। সরোজবালা সেন
- ৭। সুষমা দাস
- ৮। মহামায়া দাস (৭০ বৎসর)
- ৯। ইন্দ্রমণি দেবী (৮০ বৎসর)
- ১০। নলিনীবালা মিশ্র

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ১১। স্মৃতিত্ৰায়ণী দাস | ৩৩। শশীপ্রভা দেব |
| ১২। চারুবালা সেন | (ভানুবিলা সত্যাগ্ৰহ) |
| ১৩। নিত্যময়ী দেবী | ৩৪। চারুশীলা দেব |
| ১৪। কাক্ষ্যময়ী দেবী | (ভানুবিলা সত্যাগ্ৰহ) |
| ১৫। বিন্দুবাসিনী দাস | ৩৫। গিৰিবালা দত্ত |
| ১৬। স্নেহবালা দেব | ৩৬। সবযুবালা দত্ত |
| ১৭। গিৰিবালা দেব | ৩৭। শৈলবালা দেব |
| ১৮। কনকলতা নাগ | ৩৮। হেমন্তকুমারী দেব |
| ১৯। স্নেহবালা দেবী | ৩৯। বসন্তকুমারী দেব |
| ২০। সবেজবালা দাস | ৪০। তারকসুন্দরী পাল। |
| ২১। চারুবালা দেবী | শিষ্ট (১৯৪২) |
| ২২। শিশিৰকণা বিশ্বাস | ১। স্মৃতিবাসিনী দাস |
| ২৩। স্মৃতিতিবালা দাস | ২। স্মৃতিতিবালা দেব |
| ২৪। সরোজিনা পাল | ৩। প্রফুল্লকুমারী দত্ত |
| ২৫। গিৰিবালা গুপ্তা | ৪। যামিনীবালা দাস |
| ২৬। মোহিনীবালা সবকায় | ৫। হিৰণবালা দেবী |
| ২৭। কিবনবালা দেবী | ৬। উষারাগী দাস |
| ২৮। বিনোদিনী পাল | ৭। উমা চক্রবর্তী |
| ২৯। সৌদামিনী পাল | ৮। লীলাবতী দত্ত |
| ৩০। চবিত্তবালা নমঃশূদ্র | ৯। সুখদা পাল |
| ৩১। বিলাসময়ী কর। | ১০। স্নেহলতা দেব |
| ৩২। মাতঙ্গিনী দাস | ১১। শোভনা দেব |

নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্ত আন্দোলনে
কারাদণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী ছিলেন
(আশালতা সেন প্রদত্ত) :

১। উষাবালা দত্ত	২২। কাননবালা পট্টনায়ক
২। বোডশীবালা দত্ত	২৩। চাক পালিত
৩। কুমুদিনী ঘোষ	২৪। মেনকা দেবী
৪। চাকগীলা পাল	২৫। নীবজনলিনী দে
৫। বতনবালা দাসী	২৬। সাবিত্রী দেবী
৬। ননীবালা রায়	২৭। সত্যরাণী হালদার
৭। কিশোবীবালা দাসী	২৮। সুনীতি সেন
৮। বাধারাণী দাসী	২৯। মহামায়া ঘটক
৯। নির্মলা দাসী	৩০। সন্তোষ পাল
১০। মাখনবালা	৩১। যোগিনী পাল
১১। উষারাণী ঘোষ	৩২। শৈলশ্রুতা সরকার
১২। হেমনলিনী ঘোষ	৩৩। সিন্ধুবালা কোলে
১৩। কিরণশশী দেবী	৩৪। সুনীতি দাশগুপ্ত
১৪। অল্পপমা দেবী	৩৫। বিভাবতী দাস
১৫। পারুল দত্ত	৩৬। স্মিত্রা দেবী
১৬। কুসুম দাসী	৩৭। বতনমণি দেবী
১৭। ক্যাস্তমণি দেবী	৩৮। বাধাবাণী মণ্ডল
১৮। কুমারীবালা	৩৯। চপলা দেবী
১৯। রাণীবালা	৪০। ভানুমতী বিশ্বাস
২০। লিচুবালা	৪১। রোহিতকুমারী বিশ্বাস
২১। সুনীলা দে	৪২। বৈষ্ণবালা মজুমদার

৪৩। শ্রীমতী ঘোষ

যা-কি-ছু-পড়ে-নিহে-ছি

পুস্তক, গ্রন্থ, নিক্ক অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
১। বেথুন কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল সেটি- নারী ভলিউম	সম্পাদক—ডঃ কালিদাস নাগ	১৯৫০ খ্রীঃ	বেথুন কলেজ ও স্কুল সেটিনারী কমিটি
২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী	গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	১৯২৭ খ্রীঃ	কলিকাতা ইউনিভার্সিটি
৩। নিবেদিতা	মনি বাগচি	১৯৫৫ খ্রীঃ	প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
৪। নিবেদিতা (নিজেস রেজ' কর্তৃক স্বনাসী ভাষায় লিখিত পুস্তক থেকে অনুবাদ)	অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী	অনুবাদ—১৯৬২ বঙ্গবন্ধু	প্রধান বিক্রয়-প্রতিনিধি— মহেশ লাইব্রেরী, ২১১ জামাচরণ দে ক্লীট, কলিকাতা ১২
৫। মাহুস চিত্তরঞ্জন	অপর্ণা দেবী	১৯৬১ বঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং
৬। হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান গ্রাশনাল কংগ্রেস (১৮৮৫—১৯৩৫)	ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া	১৯৩৫ খ্রীঃ	পদ্মা পাব্লিকেশনস লিমিটেড, বোম্বাই

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্গবিরগীব-নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
৭। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অথবা রাউলাট রিপোর্ট ১৯১৮	কমিটির প্রেসিডেন্ট— মিঃ রাউলাট, এবং সেক্রেটারী— মিঃ জে. ডি. হজ	১৯১৮ খ্রীঃ	সুপারিনটেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং কার্খ মুদ্রিত, ৮ হেক্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা
৮। রক্তবিল্লবের এক অধ্যায়	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬১ বঃ	বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত কুটির, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর
৯। দি লিবারেটোর শ্রীঅরবিন্দ—ইন্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ল্ড	শিবিরকুমার মিত্র	১৯৫৫ খ্রীঃ	জেইকো পার্লিং হাউস
১০। ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ	উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৯৫০ খ্রীঃ	জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানমন্দির, আডবালিয়া, ২৪ পরগনা মহালয়
১১। বিপ্লবী বাংলা (১৭৫৭—১৯১২)	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী	১৩৫৪ বঃ, ভাদ্র	বেঙ্গল পার্লিনার্স
১২। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩৫৫ বঃ, ১লা আশ্বিন	বি. সিংহ ব্রাদার্স
১৩। শহীদ যুগল (শ্রেফুল চাকী ও ক্ষুদ্রিয়ারাম বসুর জীবনচরিত)	নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়		
১৪। যুক্তির সম্মানে ভারত	যোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৫২ বঃ	সলিলকুমার মিত্র

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কাব্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
১৫। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী	যোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৬১ বঃ, ভাদ্র	পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৩৩ ছাব্বানানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
১৬। ফাঁসীর মধ্যে গেয়ে গেল যারা	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৩৫৯ বঃ	ভারত বুক এজেন্সি
১৭। ভারতের বিপ্লব-কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৯৪৮ খ্রীঃ	নিউ মাদন প্রেস
১৮। গান্ধীজীসু কয়েমপন্ডেস উইথ দি গভর্নমেন্ট ১৯৪৪—৪৭	তমলুক সাব-ডিভিশন ওয়াব কাউন্সিল	১৯৫২ খ্রীঃ	নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, আমেদাবাদ
১৯। সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মূভমেন্ট ইন তমলুক (মিদনাপুর) ১৯৩২-৩৩	(ক) সতীশচন্দ্র সামন্ত (খ) শ্রামাদাস ভট্টাচার্য (গ) অনঙ্গমোহন দাস (ঘ) প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৯৪৬ খ্রীঃ	ওবিয়েন্ট বুক কোং
২০। অগাস্ট রেভলিউশান অ্যাণ্ড টু ইয়ার্স ক্রাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মিদনাপুর, পার্ট ওয়ান (তমলুক)			

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পুস্তক, গ্রন্থ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
২১। রেবেল ইন্ডিয়া	(ক) বিজয় মিত্র (খ) ফণী চক্রবর্তী	১৯৪৬ খ্রীঃ	ওরিয়েন্ট বুক কোং
২২। জীবনের ঝরাপাতা (আয়ুজীবনী)	সরলা দেবী চৌধুরাণী	১৯৫৮ খ্রীঃ	শ্রী সরস্বতী প্রেস
২৩। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	ডাঃ বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৩৬৩ বঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং, আইভেট নিমিটেড
২৪। বিপ্লবের পদচিহ্ন	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	১৯৫৩ খ্রীঃ	সরস্বতী লাইব্রেরী
২৫। নয়ামি	জিতেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	১৩৯৬ বঃ	শ্রী বিমলারঞ্জন প্রকাশন
২৬। বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ	১৩৬১ বঃ, বৈশাখ	এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং লিঃ, কলিকাতা
২৭। বিপ্লবের পথে	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত	১৯৫৮ খ্রীঃ	উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস
২৮। শহীদ স্মৃতিকথা	টাকা জিলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি কর্তৃক প্রণীত	১৯৫৭ খ্রীঃ, মার্চ	সমিতির পক্ষ হ'তে ডাঃ ইন্ডনারায়ণ সেন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কাণ্ডবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
২২। শৃঙ্খল বন্ধার	বীণা দাস	১৩৫৫ বঃ, বৈশাখ	সিগনেট প্রেস
৩০। অক্ষয় বহি	শান্তি দাস	১৩৫৮ বঃ, জ্যৈষ্ঠ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
৩১। জীবন অধ্যয়ন	কল্যাণী ভট্টাচার্য	১৯৫৪ খ্রীঃ	অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
৩২। বক্তৃতা অঙ্কুর	কমলা দাশগুপ্ত	১৩৬১ বঃ	নাতানা পাব্লিশার্স
৩৩। অস্তঃপুৰ (মাসিক পত্রিকা, প্রথম প্রকাশিত ১৮২৭ সালে। তখনকার দিনের মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র। অনেক বৎসর পর্যন্ত কেবল মহিলাগণই এতে লিখতেন।)	প্রথম সম্পাদিকা—বনজতা দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদিকা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী	১৮২৭ খ্রীঃ এপ্রিল প্রথম প্রকাশ। তারপর অনেক বৎসর পর্যন্ত প্রকাশ- শিত হয়েছিল।	অস্তঃপুৰ অফিস—৩২নং স্কটিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা
৩৪। তথ্যাবলী সংগ্রহ (১৯০৫ খ্রীঃ হতে ১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত)	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত তথ্য লেখিকাকে প্রদত্ত		

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশন ২ বিঃ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষর নাম
৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকা হ'তে সংগৃহীত বিভিন্ন কাটিং	আশাশুভা সেন কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকারক প্রদত্ত	১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ	
৩৬। অবলোম্বাণিনী	বেগম রোকেয়া হোসেন		
৩৭। বেগম (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ঢাকা—‘সাহিত্যিক রোকেয়া’	বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ রচিত ‘রোকেয়া জীবনী’ থেকে সংকলিত	৮. ১২. ৫৭ খ্রিঃ	তাক থেকে
৩৮। লোকসেবক (পূজা-সংখ্যা) —‘সরলা দেবী চৌধুরানী’	সম্পাদক পঞ্চানন ভট্টাচার্য	পূজা-সংখ্যা, ১৯৬৩	
৩৯। দেশ—‘প্রবাসীর পত্র ১৮৬৩-৬৪ : দুইখানা পত্র’	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লঙন হ'তে লিখিত	চিঠি লিখার তারিখ ১৬.১১.১৮৬৩ এবং ১৮.১১.১৮৬৪ খ্রিঃ	
৪০। কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি (মুদ্রিত কার্যবিবরণী)	সম্পাদিকা—বিমলপ্রতিভা দেবী	১৯৩০-৩১ এর ১৫ই মার্চ হ'তে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত	

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
৪১। ঢাকা সত্যাগ্রহী সেবিকা দল (মুদ্রিত কার্যবিবরণী ১৯৩০—৩৪)	‘সত্যাগ্রহী সেবিকা দল’-এর সম্পাদিকা—আশালাতা সেন	১৯৩০—৩৪ সালের কার্যবিবরণী	ঢাকা সত্যাগ্রহী সেবিকা দল কর্তৃক প্রকাশিত
৪২। ব্রিটিশ মহিলা সংঘ—দ্বিতীয় বর্ষের মুদ্রিত কার্যবিবরণী (১৯৩০—৩৪)	সরলাবাল, দেব—সম্পাদিকা; সমিতির সম্পাদিকাও তিনি।		
৪৩। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপন্থা (মুদ্রিত)		১৯৪১ সালের আন্দোলনের পান্থ	ব্রিটিশ জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষে মহম্মদ মোবারক কর্তৃক প্রকাশিত। স্বরমা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত
৪৪। কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি—মুদ্রিত কার্যবিবরণী, ১৯৩৭-৩৮	সমিতির সম্পাদিকা—স্বরমা দেবী		
৪৫। দেশ—‘সত্যোজ্ঞা’ ঠাকুর— বাংলায় স্ত্রী-স্বাধীনতার অজ্ঞাতম পথিক্ত	পুলিনবিহারী সেন		
৪৬। মন্দিরা—‘বাংলার একমাত্র মহিলা কেট-প্রিজনার’	কমলা দাশগুপ্ত	১৯৫৮ বং, কার্তিক	

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পুস্তক, গ্রন্থক, নিবন্ধ অথবা কালবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাক্ষরের নাম
৪৭। শারদীয়া দৈনিক ক্লবক, ১৩৫৪— 'বাংলার রাজনীতিতে নারী'	বীণা দাস	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৪ বঃ	
৪৮। জয়ন্তী—'রেণু সেন'	লীলা রায়	১৩৫৮ বঃ, শ্রাবণ	
৪৯। মহিলা মহল—“ '৪২ সালের মুক্তিসংগ্রামে বাংলার নারী”	সাবিত্রী ঘোষাল	১৩৫৪, ১লা ভাদ্র	
৫০। 'বাংলার বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা'	প্রবন্ধটি নাট্যকার মন্মথ রায় কর্তৃক প্রবন্ধাদ প্রামাণিকের নিকট থেকে সংগৃহীত এবং তার নকল লেখিকাকে প্রদত্ত।	২২. ১২. ৫৭ তারিখ লেখিকাকে প্রদত্ত	
৫১। 'শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা'	প্রবন্ধটি গুণধর ভৌমিক কর্তৃক লেখিকাকে প্রেরিত।	৬. ৩. ৫৮ তারিখে প্রেরিত।	
৫২। আনন্দবাজার পত্রিকা হ'তে সংগৃহীত বিভিন্ন কাটিং	নয়নাঙ্কন দাশগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত	১৯৩৩-৩৪ খ্রিঃ	

পুস্তক, গ্রন্থ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৩৩। নিম্নলিখিত স্থানের জেল বেকর্ড হ'তে প্রাপ্ত মহিলা-বন্দীদের নামের তালিকা:	জেল-বিভাগীয় মন্ত্রী পূর্ববী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিভিন্ন জেল বেকর্ড হ'তে বন্দীদের নামের তালিকা সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত।		
(ক) মেদিনীপুর সেনুট্রাল জেল	এই সমস্ত বন্দীগণের যিনি যে জেলার অববাসী, লেখিক। সেইভাবে তাঁদের নাম সংজ্ঞায়ে লিখেছেন। তাই পূর্ববন্দীর মহিলাগণেরও অনেক নম্ব এখানে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পূর্ববন্দীর অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জেল বেকর্ড পাওয়া সম্ভব নয় বলে ঐদিককার জেলের বন্দীদের নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই।		
(খ) বহরমপুর সেনুট্রাল জেল			
(গ) প্রেসিডেন্সি জেল			
(ঘ) হুগলি জেল			
(ঙ) কৃষ্ণনগর জেল			
(চ) বর্ধমান জেল			
(ছ) দার্জিলিং জেল			
(জ) হাওড়া জেল			
(ঝ) কাটোয়া সাব-জেল			
(ঞ) বিষ্ণুপুর সাব-জেল			
(ট) ক্রীতদাসপুর সাব-জেল			
(১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালের মুক্তি-সংগ্রামে এঁরা বন্দী হন।)			

কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত

পর্যালোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত
১। সরলা দেবী চৌধুরানী	সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরা-পাতা’, ‘দেশ’, ‘লোকসেবক’ (পূজা-সংখ্যা) ও অগ্নাত পুস্তক থেকে তথ্য সংগৃহীত।
২। উর্মিলা দেবী	অপর্ণা দেবী লিখিত ‘মাহুষ চিত্তরঞ্জন’ নামক পুস্তক ও অগ্নাত স্থান হ’তে তথ্য সংগৃহীত।
৩। মোহিনী দেবী	মোহিনী দেবীর পুত্র জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
৪। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রধানতঃ সংগৃহীত। বীণা দাস লিখিত ‘বাংলার রাজনীতিতে নারী’ (শারদীয় ‘দৈনিক কৃষক’, ১৩৫৭) নামক প্রবন্ধ থেকে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ দুই দিনের ঘটনার কিছু অংশ সংগৃহীত।
৫। দীনেশ মজুমদার (কল্যাণী দাসের জীবনীতে)	দীনেশ মজুমদারের পলাতক জীবনের তথ্য বিবৃত করেন—তঁার পলাতক জীবনের সঙ্গী, পলাতক বন্ধু নলিনী দাস। নথ্যনাঙ্ক দাশগুপ্ত প্রদত্ত ‘আনন্দবাজার’-এর কাটিং হ’তে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, রসিকলাল দাস, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী দাস কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করেন। দীনেশ মজুমদার লেখিকার রাজনৈতিক সত্যার্থ।
৬। প্রীতিলতা ওয়াদাদার	প্রীতিলতা ওয়াদাদারের ভগ্নী কনকলতা চৌধুরী কর্তৃক বিবৃত ও লিখিত জীবনী থেকে অংশতঃ, এবং ধলঘাটের কাহিনী ব্রজেন সেন কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী থেকে গৃহীত হয়েছে। পাহাড়তলী ক্লাবের ঘটনার পূর্বদিনে প্রীতিলতা কর্তৃক তাঁর মাতাকে লিখিত শেষ পত্রখানি ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত।

কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত

পাল্লোবগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত
৭। সুয সেন (কল্পনা দত্তের জীবনীতে)	প্রধানতঃ ব্রজেন সেনের নিকট থেকে ভূপেন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এবং অংশতঃ কল্পনা দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে লিখিত।
৮। সাবিদী দেবী	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত লিখিত 'স্প্লিন্দের পথে' নামক পুস্তক থেকে এবং ব্রজেন সেন কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী ও অন্যান্য কবেকজনের বিবৃতি তথ্য থেকে সংগৃহীত।
৯। প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম	প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের ভাই ননোগোপাল ব্রহ্ম কর্তৃক পারিবারিক ও শাস্তি ঘোষ (দাস) বর্জক বাজনৈতিক জীবনের তথ্য বিবৃতি।
১০। শোভাবাগী দত্ত	শোভাবাগী দত্তের জীবনী তার মাতা লাভণ্যপ্রভা দত্ত, মনোবঞ্জন গুপ্ত, মনোবঞ্জন বায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার (বক্ষিত বাব) প্রভৃতি কর্তৃক বিবৃত। শোভাবাগী লেখিকার বন্ধু। 'শোভাবাগী দত্ত মহাপ্রয়াণ' নামক পুস্তিকা থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।
১১। বনলতা দাশগুপ্ত	বনলতা দাশগুপ্তের ভাই জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত। লেখার পূর্বে বীণা দাস (ভৌমিক) লেখাটি প'ড়ে ঠিক ক'বে দিয়েছেন।
১২। রেণু সেন (বহু)	রেণু সেন-এব (বহু-ব) মাতা কুম্ভমকণা সেন কর্তৃক পারিবারিক এবং 'জয়শ্রী'তে লীলা রায় লিখিত প্রবন্ধ থেকে বাজনৈতিক জীবনের তথ্য সংগৃহীত।
১৩। আভা দে	কল্যাণী ভট্টাচার্য লিখিত 'জীবন অধ্যয়ন' নামক পুস্তক থেকে কিছু কাহিনী সংগৃহীত। আভা দে লেখিকার বন্ধু ও জেলের সতীর্থ ছিলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

পরলোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনের তথ্য সংগৃহীত
১৪। সরোজ আভা চৌধুরী (নাগ)	সরোজ আভা চৌধুরীর (নাগের) স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ নাগ কর্তৃক বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৫। সুরমা দেবী	সুরমা দেবীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৬। সরমা গুপ্তা	আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৭। সরযু গুপ্তা	আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৮। মাতঙ্গিনী হাজরা	<p>মাতঙ্গিনী হাজরার প্রারম্ভিক জীবন এবং ১৯৩০—৩১ সালে আন্দোলনে যোগদানের কাহিনীর তথ্য অনেকাংশে পাওয়া গিয়েছে—(ক) ‘বাংলার বীব রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা’ প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি নাট্যকাব মন্থাথ রাব কর্তৃক প্রহ্লাদ প্রামাণিকের নিকট থেকে সংগৃহীত এবং তার নকল লেখিকাকে প্রদত্ত) এবং—(খ) ‘শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা’ নামক প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি গুণধর ভৌমিক কর্তৃক লেখিকাকে প্রদত্ত)।</p> <p>কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরার জীবনে ১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী এবং ১৯৩৯ সাল থেকে মেদিনীপুরে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনের বিবরণ ইত্যাদি <i>August Revolution and Two Years National Govt. in Midnapore</i> নামক পুস্তক থেকে বহুলাংশে সংগৃহীত হয়েছে।</p>
১৯। বেলা মিত্র	বেলা মিত্রের স্বামী হরিদাস মিত্র কর্তৃক বিবৃত ও প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত। তাঁর জীবনীতে গান্ধীজীর চিঠিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে— <i>Gandhiji's Correspondence with the Government 1944—47</i> নামক পুস্তক থেকে।

কোথা থেকে জীবনীয় তথ্য সংগৃহীত

পরলোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীয় তথ্য সংগৃহীত
২০। শশীবালা দাসী	‘রেবেল ইণ্ডিয়া’ পুস্তকেব শেষ অধ্যায়ে যে নিহত ও আহত বীরদেব নামের তালিকা আছে সেখান থেকে তথ্য সংগৃহীত।
২১। চামেলী দেবী	সীতাবামজী সাক্সেনরিয়া কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
২২। সিন্ধুবালা দেবী	ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃহীত। সিন্ধুবালা দেবী জীবিত আছেন কিনা জানা যায়নি।